ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ



পশুপতি প্রসাদ মাহাতো

ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ

পশুপতি প্রসাদ মাহাতো

পূর্বালোক পাব্‌লিকেশন
কলকাতা

মুখবন্ধ

ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো মহাশয়ের 'ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ' বইটি তাঁরই পূর্ব প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। পশুপতিবাবু নৃতত্ত্বের কৃতী ছাত্র। পুরুলিয়া জেলার ডাবর গ্রামে জন্ম এবং বিদ্যালয়ের পাঠ তাঁর গ্রামে এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর জন্মসূত্রেই সীমিত থাকেনি। নৃতাত্ত্বিক হিসেবে ভারতের নানা প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রামে-গঞ্জে তাঁর আনাগোনা যেমন রয়েছে, তেমনই তিনি আজও তাঁর ডাবর গ্রাম এবং পুরুলিয়ার জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছেন। পশুপতিবাবু চিন্তাশীল ব্যক্তি। বাগ্মিতা তাঁর সহজাত। পশুপতিবাবুর শ্লেষাত্মক রচনাশৈলী তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিশ্লেষণাত্মক মন তাঁকে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে সুবিদিত করেছেন।

উপরোক্ত পুস্তকটিতে যাঁদের (আদিবাসী, তথাকথিত অনগ্রসর ও দলিত মানুষ) সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তাঁরা মুখ্যত গ্রামীণ ভারতীয় সমাজের মানুষ। তাঁদের বিষয়ে তাঁদেরই মুখপাত্র হিসেবে পশুপতিবাবু নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন। পুস্তকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল— (১) 'সভ্যতা' ও 'সভ্য মানুষের' দ্বারা যাঁরা নিপীড়িত তাঁদের কাহিনি ; (২) নিপীড়নের কলাকৌশলের বিশদ আলোচনা ; এবং (৩) প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই নিপীড়িত শ্রেণির (দলিত সমাজ ও আদিবাসী) মানুষের প্রতিবাদের প্রচেষ্টার বিবরণ।

সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বর্তমান সঞ্চয়ন এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। পুস্তকের নিবন্ধগুলি দলিত সমাজের প্রতি যাঁরা সংবেদনশীল এবং যাঁরা এঁদের বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত, আশা রাখি তাঁদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

কলকাতা
নভেম্বর ২০, ১৯৯৫

রঞ্জিতকুমার ভট্টাচার্য
নির্দেশক
ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সংরক্ষণ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করলেন কলকাতার অগ্রণী প্রকাশক পূর্বালোক পাবলিকেশন। আমি বন্ধুবর ও পূর্বালোক পাবলিকেশনের পার্থসারথি ও সমীক বসুকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। পুরুলিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপিকা ড. শমিতা মান্না আমার বইগুলো সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজের মধ্যে জঙ্গলমহলের মানুষেরা যেভাবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উপেক্ষিত হয়েছেন, তার পুনর্মূল্যায়ন করেছি এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। মাননীয় আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণির মন্ত্রী শ্রী উপেন বিশ্বাসের লেখা এই বই-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটিকে যথাযথ রেখে ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজের যে মূল পরিচিতি এবং বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের জাগরণ তথা শিকার উৎসব ও জঙ্গলকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

এই বই-এর প্রথম প্রকাশের সময় ড. উপেন বিশ্বাস যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তার জন্য তাকে প্রণাম জানাই। আজ এই বই পুনর্মুদ্রণে যারা সবচেয়ে খুশি হতেন, তারা হলেন আমার প্রয়াত মাতা অঞ্জনা মাহাতো এবং পিতা প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ মাহাতোকে প্রণাম জানালাম।

গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, 'আত্মদীপ ভবঃ'। অর্থাৎ নিজের প্রদীপে নিজেকে আলোকিত কর। এই আলোকিত করার প্রেরণা যুগিয়েছেন যাঁরা তাঁদের সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ।

পশুপতি প্রসাদ মাহাতো

তারিখ : ২৮।০৬।১২

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশের দেশজ (ইন্ডিজেনাস) মানুষের তেজ ও বিক্রমকে আজ নতুন করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। আজ তাঁদের ইতিহাস ও জ্ঞানকে নব নিরিখে দেখার ও বোঝার সময় এসেছে। সুদীর্ঘ কয়েক শত বছর ধরে দেশজ মানুষদের জীবন সংগ্রাম, ঐতিহ্য তথা মৌখিক-শ্রুতির মধ্যে প্রবহমান যে জীবনবোধ, রসবোধ, তথা মানবতাবোধ ফল্গুধারায় মতো বয়ে চলেছে তাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার জন্যে দেশজ মানুষদের আজকের বংশধরদেরই কলম ধরতে হবে। নৃ-বিজ্ঞানের এক অতি সাধারণ ছাত্র হিসেবে অনুভব তথা জ্ঞানান্বেষণের তাগিদে বুঝতে পেরেছি যে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় সভ্যতা ও নর প্রবাহের ধারা আজও বিদ্যমান তাকে যথাযথ ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন কর্মসূচিতে প্রতিফলিত করা হয়নি। 'আর্যায়ন', 'ব্রাহ্মণায়ন' বা 'সংস্কৃতায়ন'-এর নামে আজ পর্যন্ত যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে মানব সংস্কৃতির ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক চিত্রণ একেবারে একমুখী। অন্যদিকে, দেশজ মানুষজনদের সার্বিক জ্ঞান ও চেতনাকে রাজশক্তি, প্রশাসন, প্রচার মাধ্যম, মনু সংহিতাসহ নানা বেদ-পুরাণ ও মহাকাব্যের মাধ্যমে অতি কৌশলে এক নির্বাকায়নের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবাদের যে কৌশলগত জ্ঞান তাকেও দুমড়ে মুচড়ে কণ্ঠরোধ করার প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত। আর এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে 'স্মৃতিহরণ' (মেমোসাইড) প্রক্রিয়াটি জোরদার করার অপকৌশল।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা লক্ষ করেছি যে দেশজ সামাজিক সভ্যতাগুলি আপন আপন স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল। মানবতাবাদী, ভাইচারা, অপ্নাপণে ভরপুর সুমহান 'চণ্ডাল, 'বরখ', 'হড়-মিতান', 'পৌন্ড্র' সামাজিক সভ্যতাগুলি (সোশ্যাল সিভিলাইজেশন) গুলি ছিল জীবন রসের স্বর্গ। প্রত্যেকটি জনপদের মানুষ ছিলেন স্বয়ং শাসিত ও আত্মনির্ভরশীল। ঝাড়খণ্ডের 'হড়' (যার অর্থ 'মানুষ'), ত্রিপুরার 'বরখ' (যার অর্থ মানুষ) মানুষরা নিজেদের ওই শব্দগুলি দিয়ে নিজেদের বোঝালেন সমতাকেন্দ্রিক মন নিয়ে। আর্য সভ্যতার 'দাস', 'দস্যু', 'রাক্ষস', 'বানর', 'কোল্ল', 'ভীল' নামগুলি ছিল অবজ্ঞাসূচক, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ পুষ্ট। তাই তাঁরা আগ্রাসী অব্রাহ্মণ্যবাদীদের বলতেন 'দিকু' বা 'ওয়ানশা'

(পরদেশি বা বহিরাগত) যার অর্থ মানবতাবিহীন বা মানবিক গুণসম্পন্নহীন মনুষ্যেতর কোনো জীব। এই সংঘাত কবে শুরু হয়েছে আমরা জানিনা।

ইংরেজ রাজত্বের শেষের পাঁচ দশকে এক অতি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নাম ড. বি. আর. আম্বেদকর যিনি আমাদের চেতনাকে সমূলে নাড়া দিলেন। বন্ধু ও দার্শনিক স্বপনকুমার বিশ্বাসের মননের ও যুক্তির সঙ্গে আমিও একমত— 'ভারতবর্ষের ভগবান, সেই যে মানুষের পরিবর্তে মনুষ্যরূপী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি করে জ্ঞানের অপার প্রশংসায় রত হলেন ; শ্রম ও শ্রমিকের নিন্দায়, শ্রমের মূল্যহীনতা ঘোষণায় এবং শ্রমজীবী শূদ্র-বৈশ্য-দলিতদের অপমানের চূড়ান্ত অধঃপাতে স্থাপিত করে, জ্ঞানকে ব্রাহ্মণের সেবাধীনে মন্দিরের পেটিকায় গচ্ছিত রাখলেন।... জ্ঞান আর কর্ম হাত ধরাধরি করে জাত-বিভক্ত সমাজ অর্থনীতিতে চলতে সুযোগ পেলনা কোনোদিন। জ্ঞানহীন তৎপরতা মাথা কুটে মরেছে প্রতিকূলতার কালো পাহাড়ে এগুতে পারেনি একটুও। দলিতরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে— শরীর-শোণিত জল করে কেবল বেঁচে থেকেছে মাত্র। জ্ঞানের দরজা তবু রুদ্ধ তাদের জন্যে। শুধু জমি, শ্রম, আর প্রকৃতির আদিম ক্রীড়ার শিশুর মতো মত্ত। অপর দিকে কর্ম তৎপরতাহীন জ্ঞান চর্চা, নিছক বুদ্ধিচর্চা, জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানচর্চা, তা সমাজকে দিতে পারে কীই বা ? আর যাই পারুক, অর্থনৈতিক কাঠামোয়, উৎপাদনের উপকরণে আনতে পারেনা কোনো পরিবর্তন।'

দেশজ মানুষরা আজ ভারতীয় সাংবিধানিক বিভিন্ন ধারা উপধারাতে তপশিলি উপজাতি (সিডিউলড্ ট্রাইব) তপশিলি জাতি (সিডিউলড্ কাস্ট) তথা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু নামে চিহ্নিত। এই সামগ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বোঝা দরকার যে তাঁরাই ভারতের আজকের আদিবাসী ও দলিত মানুষ। আদিবাসী-দলিত মাতা ও কন্যারা আজ শুধু নয়, সেই আর্য আগ্রাসনের সময় থেকেই মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। শূর্পনখা, মন্দোদরী, সীতা, কিংবা হিড়িম্বা, চিত্রাঙ্গদা, উলুপী— প্রমুখ চরিত্র তো আমাদেরই নিজের লোক। মহিষাসুর তো হুদুড়-দুর্গা। সবকিছুর আজ পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

এই গ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। 'অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানেরা', 'ভারতের পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়' 'আদিবাসী বিবাহ : বৈচিত্র্য ও জীবন দর্শন' এই তিনটি প্রবন্ধ দেশ পত্রিকাতে ; 'ঝাড়খণ্ড গোষ্ঠী-সত্তার বিকাশ' ; দিগ্‌দর্শন পত্রিকাতে, 'মূলশিকড়ের খোঁজে' বালুরঘাট বার্তা পত্রিকাতে, 'ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীত' মধ্যাহ্ন পত্রিকাতে, 'ঝাড়খণ্ডের সভ্যতা : হড়-মিতান' 'খন্দরন্দ' এবং 'ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সম্পর্ক' সমতট পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। আমি উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদক, প্রকাশকদের কাছে ঋণী।

'অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানেরা' প্রবন্ধে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে দেশজ নর গোষ্ঠীগুলির বাঁচার লড়াই এবং কীভাবে সমগ্র অরণ্য-নির্ভর সভ্যতাগুলি বিপন্ন, তারই পাশাপাশি জাতিগর্ববাদ এবং নৃতত্ত্বের গবেষণার নামে অ্যাকাডেমিক ছলচাতুরির সঙ্গে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির গভীর আত্মিক লেনদেনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ভারতের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে।

'ভারতের পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়' প্রবন্ধে বলা হয়েছে সুবিশাল শূদ্র-বৈশ্য গোষ্ঠীর অনগ্রসর সমাজের কথা, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকলেও অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার কথা কার্যত অস্বীকার করেছিলেন। স্বর্গীয় বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন গঠন ও তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে উচ্চবর্ণের শোষক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া, অনগ্রসর শ্রেণির আন্দোলন আলোচিত হয়েছে ওই প্রবন্ধে।

'আদিবাসী বিবাহ : বৈচিত্র্য ও জীবন দর্শন' প্রবন্ধে বলা হয়েছে বিবাহের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং তার তাত্ত্বিক দিকটি। আদিবাসী বিবাহের বিভিন্ন উদাহরণ ও প্রকারভেদ, আচার-অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সময়ের গানের কথা।

'ঝাড়খণ্ড গোষ্ঠী-সত্তার বিকাশ' প্রবন্ধটি জাতি-বর্ণের উদ্‌ভবসহ তার অবক্ষয়ী অন্ধকার যুগ এবং আর্য আগ্রাসনবাদের প্রেক্ষাপটে দেশান্তর ও জাতি বর্ণবাদের ভেদাভেদ চর্যাগানের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহের মাধ্যমে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ কীভাবে কৃষক হিসেবে বার বার উচ্ছেদ হয়েছেন, তার বিবরণসহ ঝাড়খণ্ডের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী 'কুড়মি' মাহাতোদের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে যোগদান এবং ঝাড়খণ্ডী হিসেবে তাদের স্বীকৃতি লাভের কথা বলা হয়েছে।

'মূল শিকড়ের খোঁজে' প্রবন্ধটিতে অসম, উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দেশান্তরী হয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের অস্তিত্বের তীব্র সংকট, 'কুলি' 'বুনো' হিসেবে তাঁদের অমানুষিক জীবন সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনে এই 'বুনো' শ্রমিকদের যোগদান এবং আন্দোলনের কথাসহ, পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভূমিব্যবস্থা, বহিরাগমন ও প্রতিরোধ, জনবিন্যাস, খরা ও দুর্ভিক্ষ, বৈষ্ণব প্রভাব, হিন্দু আগ্রাসন, সত্যাগ্রহ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম— প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

'ঝাড়খণ্ডী লোকসঙ্গীত' প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে সংস্কৃতির নামে কিউরিয়ো হান্টিং-এর ব্যবসা এবং এর ফলেই প্রতিবাদের সুর দেশজ মানুষ জনের মধ্যে দানা বাঁধার সূত্রপাত। বাবু পণ্ডিতদের বিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে শাণিত প্রতিরোধ, গোষ্ঠী চেতনা, আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গি এবং পুরুলিয়ার দেশজ কবি সাহিত্যিক গায়ক শিল্পীদের সম্মিলিত বিপ্লবী প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। 'ঝাড়খণ্ডের সভ্যতা : হড়-মিতান' প্রবন্ধে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি সামাজিক সভ্যতার বিকাশ ও ব্যাপ্তি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তুলে আনা হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'খেরোয়াল' বা 'হড়-মিতান' মানুষের অস্তিত্বের লড়াই কীভাবে আজ অব্যাহত।

'ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি সম্পর্ক' প্রবন্ধটিতে ত্রিপুরার মানুষের ঐতিহাসিক পটভূমি, সেখানকার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ, জাতিভেদ ও বিভাজন নীতি, বাঙালি-পাহাড়ি সংঘাত, কুকিচিন ভাষা, গোষ্ঠী রূপান্তর, উপগোষ্ঠীর বিভাজন, কৃষি ব্যবস্থা, রাজনীতি— ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার বন্ধু তথা সমাজ বিজ্ঞানী ড. সজল বসু এবং প্রকাশনার জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে এসেছেন সুজন পাব্‌লিকেশন-এর শ্রীতপন মুখোপাধ্যায়। তপনবাবু আমার 'ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ জীবন' গ্রন্থের প্রকাশকও বটে। তাঁর সহযোগী প্রেসের কর্মীদের ধন্যবাদ। আমি ব্যক্তিগত ভাবে ড. সজল বসু ও তপন মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী রইলাম। বইটিতে কয়েকবার 'হরিজন' শব্দটি ব্যবহার করার জন্যে দুঃখিত।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে শ্রী সাগরময় ঘোষ, শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় কিশলয় ঠাকুর মহাশয়কে। এ ছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্কর বসু মল্লিক, শ্রী রঞ্জিতকুমার রায়চৌধুরী, উইলিয়ম কেরি রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডি সেন্টার, সৌমেন রায়, শ্রী মলয় দেওয়ানজি মহাশয়কে।

বইটি প্রকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে অমরকুমার বিশ্বাস, বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা, অধ্যাপক চণ্ডীচরণ মাহাতো, ড. পরমানন্দ মাহাতো, ড. মঙ্গল মাহাতো, ড. বিদ্যাভূষণ মাহাতো এবং তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা বীণাপাণি মাহাতো, অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার মাহাতো, শ্রীমতী সংঘমিত্রা সাহা (ত্রিবান্দ্রম), শ্রীমতী সোমা মুখার্জী ও স্বর্গীয় শিখা কুণ্ডু, গুরুচরণ মুর্মু, মনোহর বিশ্বাস, মণ্ডল হেম্ব্রম, পূর্ণচন্দ্র সরেন প্রমুখ।

বইটির মুখবন্ধ লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছেন শ্রদ্ধেয় ড. রঞ্জিতকুমার ভট্টাচার্য, নির্দেশক মানব বিজ্ঞান সর্বেক্ষণ, ভারত সরকার এবং ড. উপেন বিশ্বাস, পিপ্‌লস এডুকেশন সোসাইটি কলকাতা, অভিমত জানিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানালাম আমার সমস্ত কাজের প্রেরণাদাত্রী বাসন্তী মাহাতোকে। কন্যাত্রয় সুবর্ণরেখা, অনুশ্রী ও বিপাশার সাহায্য ও হাসিমুখগুলিই আমার প্রেরণা।

পশুপতি প্রসাদ মাহাতো

বিরসা মুণ্ডার উলগুলানের
শতবর্ষ উপলক্ষে
১৫।১১।৯৫

অভিমত

'সর্দার বলে কাম কাম, বাবু বলে ধরি আন,
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম, রে যদুরাম
ফাঁকি দিঁয়ে পাঠালি আসাম।'

ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ডি. লিট. তাঁর 'ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ' পুস্তকে বাঙালি 'ভদ্রলোক'-এর আদিবাসী ও দলিতদের উপর অত্যাচার, ভণ্ডামি, প্রতারণা ও ধর্ষণের কৌশল ও প্রকৃতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ড. মাহাতো একজন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী। তাঁর মধ্যে আছে সরলতা ও বিজ্ঞানের কঠোর অনুশাসন। সেখানে কেউ ছাড় পাবেননা। আমি জানি যাঁরা লোকসংস্কৃতির ব্যবসা করে খাচ্ছেন তারা আঘাত পাবেন। আঘাত পাওয়ার দরকার অনেক আগেই ছিল। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ড. পশুপতি এই আঘাতটা হেনেছেন বলে সমগ্র 'হড়-মিতান' ও দলিত সমাজের গর্ব ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো।

'ভদ্রলোক' সংস্কৃতির মুখোশ ছিঁড়তে হবে। 'ভদ্রলোক' তার শ্রেণি-স্বার্থের জন্যে ভাঙবেন না। তবে ভাঙন শুরু হয়েছে। আর দেরি নেই। এবার ধস নামবে। আদিবাসী ও দলিত সমাজকে বুঝতে হবে, এই 'ভদ্রলোক'রা আদিবাসী ও দলিতদের টুকরো টুকরো দলে ভাগ করে, তাদের মধ্যেই ঝগড়া বাধিয়ে, একে অপরকে ছোটো-বড়ো করার কৌশল করে নিজেরা মাতব্বরী করছেন। এই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত।

পশুপতির প্রশ্ন মৌলিক। যারা কয়লাখনি ও চা বাগানে, ধানের মাঠে, কিংবা নদী-খাল-বিল, সমুদ্রে খেটে জীবন, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল, তাদের 'ভদ্রলোক'-রা কী দিয়েছে? খনিতে জল ঢুকছে। ইঞ্জিনিয়াররা নাকে তেল দিয়ে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে শুয়ে থাকল। কেউ কি গেল সময়মতো মাটির নিচে আটকে থাকা একজন মানুষকে উদ্ধার করতে? ওই কালো হীরের ডুবুরিরা আর উঠে আসবেন না খনির তলা থেকে। তাদের আওয়াজ আর শোনা যাবেনা। কে প্রায়শ্চিত্ত করবে? আমি জানি 'ভদ্রলোক'রা এর উত্তর দেবে না। পশুপতি সেই উত্তরের খোঁজে নেমেছেন।

ড. মাহাতোর সঙ্গে অনেক 'ভদ্রলোক' বিজ্ঞানী একমত হবেননা। তাদের শ্রেণি স্বার্থে আঘাত লাগবে। এতদিনের মৌরসীপাট্টায় যদি ধস ধরে? আতঙ্ক। আতঙ্কটা

পশুপতি ধরিয়েছেন। মুখোশ খুলবার বলিষ্ঠ প্রয়াস আর উদ্যম দেখেছি ড. মাহাতোর মধ্যে। 'ভদ্রলোক'-এর এই পঠন পাঠন এবং গবেষণার মুখোশ খুলতেই হবে। এ কাজ 'ভদ্রলোক'রা করবেন কেন? করতে হবে আদিবাসী ও দলিত ভাইদের।

নতুন করে লিখতে হবে ইতিহাস। পশুপতি শুরু করেছেন। আশা করি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত শ্রেণি যাদের সংখ্যা ৮৫ ভাগ তারা স্বাগত জানাবেন 'ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ' দলিলটিকে।

আমরা এই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তকটি নিয়ে সেমিনার, আলোচনা তথা আন্দোলনের হাতিয়ার করব। পিপ্‌লস্‌ এডুকেশন সোসাইটি-র সভ্য হয়ে বলছি এবার শুরু দলিত ও হড়-মিতানদের ঐক্যের গান। ভাঙো বাঙালি 'ভদ্রলোক'-এর জাতপাতের ভণ্ডামিকে। খোলো তার চাতুরির মুখোশ। বিদ্রোহ করো এই অসমান সমাজের বিরুদ্ধে। আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন হড়-মিতান সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বর্ণবাদী-মনুবাদীরা কেটে খান খান করেছে। এদের ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই হবে। আমাদের রক্ত ঝরিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে এরা দিব্যি পায়ের উপর পা তুলে মাতব্বরি করছে দুই পংক্তি সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজি শিখে।

অনেক হয়েছে। আর নয়। প্রতিশোধ শান্তি আনেনা। শোষক সহজে তার অবস্থান ছাড়তে চায়না। ছলে, বলে, কৌশলে তার স্বার্থ বজায় সে রাখতে চায়। তাই তাকে টেনে নামাতে হবে সম্মিলিত সংঘ শক্তির মাধ্যমে। সংগ্রাম করতেই হবে। হিংসা দিয়ে নয়, গণতান্ত্রিক জোটবদ্ধতার দ্বারা— হড় মিতান ও দলিত, সংখ্যালঘু অনগ্রসর মানুষের গণতান্ত্রিক শক্তি দিয়ে। আকুল হয়ে বসে আছি হড়-মিতানের অর্জিত সাম্যবাদের দিনের অপেক্ষায়।

ড. পশুপতির বন্ধু, বান্ধব ও তার পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন জানালাম আরও একবার।

ইতি—

ড. উপেন বিশ্বাস, পি. এইচ. ডি.
পিপ্‌লস্‌ এডুকেশন সোসাইটি
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

১৪ অক্টোবর, ১৯৯৫

সূচি

অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানেরা

পুরাতত্ত্ব, গোষ্ঠীবিদ্যা এবং লিখিত ইতিহাসের দর্পণে দেখা যায় যে, মানব সমাজগুলির প্রগতির বিশালত্ব, জটিলতা এবং সুবিশাল ভূমিখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব তখনই সম্ভব হয়েছে যখন মানুষ সূক্ষ্ম কৃৎ-কৌশলের উদ্‌ভাবন ও প্রয়োগের দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি ছোটো ছোটো দলে বিভাজিত হয়ে যাযাবর হিসেবে ঘুরে বেড়িয়ে অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক জীবনযাপন করেছিলেন। যদি আমরা তাঁদের 'হোমোস্যাপিয়ান্‌স্' আখ্যা দিয়ে থাকি, তবে সেই মানব প্রজাতিসমূহ শিকার করতেন যে অস্ত্র দ্বারা অথবা খাদ্যসংগ্রহ করতেন যে সমস্ত সামগ্রী দিয়ে সেগুলির জন্যেই তাঁরা স্বল্প সংখ্যক জন-বল নিয়েও বাঁচার চেষ্টা করতেন। মাত্র দশ হাজার বছর আগে মানুষ খাদ্যোৎপাদনকারী এবং পশুপালনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ ভি. গরউন চাইল্ড-এর ভাষাতে বলা যায় যে, এই খাদ্য-উৎপাদনের বিপ্লব ও তার কৃৎ-কৌশল, প্রাথমিক কেন্দ্রগুলি থেকে অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন মানব প্রজাতির অধিকাংশের বেশি মানুষ এই খাদ্যোৎপাদন বা কৃষকীকরণকে গ্রহণ করলেও অতি দুর্গম বনাঞ্চলে অথবা পার্বত্য উপত্যকার কিছু কিছু নরগোষ্ঠী এই নতুন জীবনের আহ্বানকে মেনে নিতে পারলেন না, আবার যখন মানলেন, তখন প্রবল শক্তিধর ওই মানুষগুলি তাঁদের হটিয়ে দিয়ে জোর করে দখল করলেন তাঁদের এলাকা। খেত-খামার, পালিত পশুসম্পদ ও জঙ্গল থেকে আহরিত খাদ্যসম্ভার সরবরাহের পরম নিশ্চিন্ততার ফলে গ্রাম নির্মাণ করে মানুষ স্থায়ী বসবাস শুরু করে। কিন্তু সেই জীবনও ছিল শিকারজীবী ও খাদ্য-আহরণকারী গোষ্ঠীগুলির মতোই আদিম। পুরোধা নৃতত্ত্ববিদ রবার্ট রেডফিল্ড-এর মতে সমগ্র প্রস্তরযুগে ও নব্য প্রস্তরযুগে ছোটো ছোটো সমাজ বা দলে বিভক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর। এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি যে সমস্ত খাদ্য-আহরণ ও শিকারজীবী মানবকুল তাঁদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো দেখলেই সহজে তা অনুমান করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিপ্লব ও আগ্রাসন

নৃতত্ত্ববিদ চার্লস ওয়াগ্‌লে ও মারভিন হ্যারিস-এর মতে আনুমানিক ৫০০০ বছর আগে দ্বিতীয় 'বিপ্লব' হয়েছিল যার ফলে মানুষ জন্ম দিতে পেরেছিল শহরের/নগরের। সেচ ব্যবস্থার আবিষ্কার, পতিত ভূমি উদ্ধার, লিপি ব্যবহার, ওজন ও পরিমাপের সামগ্রী, বিজ্ঞাপনের সূত্রপাত, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষ শ্রমিকের আবির্ভাব নগর-জীবনের অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 'পুরাতন পৃথিবীর' মধ্যপ্রাচ্যে এই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' শুরু এবং পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। 'দ্বিতীয় পৃথিবীতে' এই মহান 'বিপ্লব' ঘটে গিয়েছিল স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে। মেক্সিকোর আজটেক, ইয়াকাটানের মায়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য এলাকার ইন্‌কা সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল তাঁদের দেশজ সভ্যতার প্রেক্ষাপটে। মানব সমাজের ইতিহাসে এই দ্বিতীয় 'বিপ্লব' অতি স্পষ্টভাবে আরও একটি সামাজিক সংগঠনের জন্ম দেয়, যাকে আমরা বলতে পারি স্টেট বা রাষ্ট্র। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পার যে, এই সামাজিক সংগঠনটির জন্যেই ছোটো ছোটো গোষ্ঠীগুলির বাঁচা সম্ভব ছিল। কারণ আদিম সমাজগুলি ছিল রাষ্ট্রবিহীন সমাজ। যদিও আদিম সমাজের নিজস্ব পঞ্চায়েত, সর্দার নিয়ে দেশজ বিধিবদ্ধতাতে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, তবুও মূলত তাঁরা সামাজিক শাসনের দায়বদ্ধতা বজায় রাখতেন বৈবাহিক ও বংশধারার সঙ্গে যুক্ত আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে। আদিম গোষ্ঠীগুলির আত্মীয়তাবন্ধন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আবেগের দ্বারা, যার ফলে দূর-দূরান্তে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি, যদি তাঁদের নিজস্ব বংশপ্রতীককে মেনে চলেন তবে তিনি দূরের আত্মীয় সুবাদে কিংবা বংশের সদস্য হিসেবে তাঁদের 'আত্মীয়' অথবা 'ভাই' বলে পরিচিত হন। কারণ একই ভাষা ও সংস্কৃতি, একই ধরনের জীবনযাপন ও একই ধর্মীয়বোধ ও চেতনা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁরা একই নরপ্রবাহের বা গোষ্ঠীর অংশ। আদিম মানব-সমাজের নিজস্ব ভূখণ্ড সম্পর্কে ধারণা, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগঠিত হওয়া, অথবা অনুপ্রবেশকারীদের নিজ ভূখণ্ড থেকে বের করে দেবার জন্যে শক্তি প্রয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তাঁদের নিজস্ব সামাজিক সংগঠনগুলি সদা সচেতন থাকে। 'আমাদের লোক' বলে পরিচিতির অমোঘ নিয়ন্ত্রণের জন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই সমাজের এক একটি একক হিসেবে ধরে নিয়ে, যাঁরা অন্য প্রথা-পদ্ধতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ভাবনা, সর্বোপরি জীবনবোধ দ্বারা পরিচালিত তাঁদের 'বিদেশি' বা অন্য মানব গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আজও ভারতীয় উপমহাদেশের সুবিশাল ভূখণ্ডে তথা পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন

প্রজাতির মানবকুল যাঁরা অরণ্য ও প্রকৃতি-নির্ভর, তাঁরা নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছেন বিভিন্ন আঘাত, আগ্রাসনের টানাপোড়েন সত্ত্বেও নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলির শক্তির তেজে ও বিক্রমে। আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনাতে অগ্রসর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে ইতিহাসের উষালগ্নেই সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অভয়বাণী না শুনিয়ে, তাঁদের সহযোগী না করে বীরদর্পে এগিয়ে এসেছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের কৃৎ-কৌশল হাতে নিয়ে ; আর তাঁরা আজও পড়ে আছেন নিজেদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা উৎপাদন-কৌশল, জীবনবোধ নিয়ে। ক্ষুধা, অনাহার, রোগ, মৃত্যু, মহামারী, অপুষ্টি তাঁদের নিত্যসঙ্গী। নিজভূমে পরবাসীর বেদনা তাঁরা বুঝলেও একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছেন। অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানরা নীরবে দেখেছেন তাঁদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ও নির্ভরযোগ্য বনভূমি অপরের হাতে চলে যাচ্ছে। বিশাল কর্মকাণ্ডে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে তাঁদের অতি আপন ভূখণ্ড, কিন্তু সেই বিশাল কর্মকাণ্ডের কোনোটাতে তাঁরা অংশীদার নন। আর শঠতা কত নিম্নমানের হলে বাঁচা সম্ভব সেটা তাঁদের জীবনের মূল্যবোধে আজও স্থান পায়নি। সুসভ্য মানুষজনের অত্যাচার, নির্বিচারে হত্যা, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, বলপ্রয়োগ, উৎখাত, উৎপীড়ন, সারা পৃথিবীব্যাপী নারকীয় ঘটনা এই সহজ সরল মানুষগুলির উপর নেমে এসেছিল তাঁদের নিজ নিজ বাসভূমিতে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক ভূমিখণ্ড থেকে অন্য ভূমিখণ্ডে বাঁচার তাগিদেই তাঁরা আশ্রয় নিলেও মানবতার উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে সুসভ্য মানুষরা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেননি এই সেদিন পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বিশ্বমানবতার পতাকা তুলে ধরে এই আদিম মানবগোষ্ঠীগুলিকে বাঁচাবার শপথ নিল। এই দেশজ গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করল একটি কার্যকরী পরিভাষা দিয়ে।

'দেশজ মানব সমাজ, গোষ্ঠী অথবা জাতিসত্তার পরিচিতি পাবার অধিকারী তাঁরাই, যাঁদের প্রাক্-আগ্রাসন ও প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের আগে থেকেই একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, যা তাঁরা নিজ বাসভূমিতে তৈরি করেছিলেন। যাঁরা তাঁদের বাসভূমিতে অথবা তার কিয়দংশে পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্য মানবকূল থেকে নিজেদের একটি বিশেষত্বময় পৃথক সত্তার অধিকারী মনে করেন। যাঁরা আজ সমাজের প্রতিপত্তিশালী না হয়েও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে তাঁদের নিজস্ব ভূখণ্ড, গোষ্ঠীসত্তা, সাংস্কৃতিক কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিধিব্যবস্থা রেখে যেতে চান একটি বিশেষ মানব-সমাজের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে।'*

---

* সূত্র : আই এল ও কনভেনশন, ১৯৫৭ (ক্রমিক সংখ্যা ১০৭) জেনেভা।

ভারতীয় উপমহাদেশে এই গোষ্ঠীবদ্ধ দেশজ মানুষজনদের নাম বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পালাবদলের সময় বারে বারে পাল্টে গেছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আগে ঋগ্‌বেদ— অথর্ববেদের সময় থেকে এর শুরু, এখনও তাঁদের জাতিসত্তা বিকাশের কোনো সুযোগ না থাকার জন্যে কোনো সামগ্রিক নামে তাঁরা পরিচিত নন। এক সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত ইক্ষাকু, কুরু, পাঞ্চাল— প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী কৌমের মানুষরা বর্ণাশ্রমের অমোঘ নিয়মে ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষত্রিয় বর্ণে অতি আদরের সঙ্গে গৃহীত হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতের 'মেচ' কিংবা মধ্য ভারতের 'গোণ্ড'— ইত্যাদি গোষ্ঠীর সামন্ত পদবাচ্য অথবা রাজাদেরই গ্রহণ করা হয়েছিল জাতি-বর্ণের মধ্যে, সাধারণ মানুষদের নয়। শাস্ত্রকার মনুর নির্দেশ ছিল 'পৃথিবীতে মাত্র চারটি বর্ণ আছে। পঞ্চম নাই— বর্ণ নাস্তি তু পঞ্চমঃ।' তিনি আরও বলেছিলেন, ওই চতুবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য— ইঁহারা দ্বি-জাতি অর্থাৎ দ্বি-জ এবং শূদ্র এক-জাতি। বর্ণের প্রকৃত অর্থ রং। গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাজনের যাবতীয় তত্ত্বকথা প্রচারিত হউকনা কেন, ভারতের পক্ষে এটা আজ স্বতঃসিদ্ধ যে জাতিভেদের একমাত্র নির্ণায়ক জন্ম। তাই বৈদিক যুগ থেকে 'দাস', 'দস্যু', 'চণ্ডাল', 'রাক্ষস', 'বানর', 'নিষাদ', 'কিরাত', 'শবর', 'কোল', 'ভীল', 'বুনো', 'কুলী'-নামে ভূষিত একদল মানবগোষ্ঠী ভারতের তথাকথিত সংস্কৃত জনমানসে এবং তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে মর্যাদাবান হয়ে ওঠেনি। ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু তার জন্যে ওই সমস্ত কৌমের মানুষজন সম্পর্কে সাধারণ ভারতীয়ের ধারণা পাল্টে যায়নি। তাই আমরা দেখি বহুল প্রচলিত অভিধানে এবং শব্দকোষে বলা হয়েছে 'আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বকাল হইতে যে সকল অসভ্য জাতি এখানে বাস করিত বা এখন পর্যন্ত করিতেছে, তাহাদিগকে অনার্য জাতি বলে।' কোশাম্বীই ঠিক— 'আর্য' শব্দটি ভদ্রজাত, এবং অভিজাত— ইত্যাদি বিশেষণের পরিপূরক ছিল।

অরণ্য সভ্যতা বিপন্ন

তথাকথিত 'সভ্যতা'-র আঘাতে সারা পৃথিবীব্যাপী অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানেরা বিপন্ন। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, রাষ্ট্র ও রাজনীতিবিদ্যাসহ নৃতত্ত্ববিদেরা কেতাবি ও গবেষণালব্ধ প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু একমাত্র নৃতত্ত্ববিদরাই খুব সহজভাবে বলতে পারেন, কোনো মানুষের আকৃতি, গায়ের রং, ভাষা, সামাজিক ঐতিহ্য অন্য কোনো মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা হীন নয়। যদিও বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা গেছে সমাজজীবনে পাশাপাশি বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরকে গোষ্ঠীগতভাবে

'হীন বা শ্রেষ্ঠ' হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার নৃতত্ত্ববিদরাই অতি সহজভাবে বলতে পারেন যে, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করার ফলে যে কোনো দু-দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং ভাবাদর্শ ও জীবনবোধের সম্পৃক্তি হতে বাধ্য। বিজয়ী এবং শক্তিশালী গোষ্ঠীর মানুষরা, সংখ্যালঘু আদিবাসী মানুষের উপর নিজেদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চাপাবার ফলে, বিজিত গোষ্ঠী হিসেবে তাঁরা সেটা কিছুদিনের জন্যে মেনে নিলেও অসন্তোষ ও আক্রোশ ধূমায়িত হতে থাকে। নৃতত্ত্ববিদরা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে বৃহত্তর পাঠকের কাছে তুলে ধরেন বলেই তাঁরা শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীর কাছে চিরকালই দেশে দেশে বিষকাঁটার মতো।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিগত চারশো বছর ধরে আদি মাতৃভূমি স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড, ইতালি থেকে এবং বিশ শতাব্দীতে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চিন, জাপান থেকে বহু মানুষের আগমনে এক মিশ্র সংস্কৃতির মানবকুলের আবির্ভাব ঘটেছে যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁদের যৌথ ও ব্যক্তিগত মেধা, পরিশ্রম ও কারিগরি কৃৎকৌশলের দ্বারা সম্পত্তি, ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদার জন্যে পরস্পর এবং অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে অবিরাম প্রতিযোগিতাতে লিপ্ত হয়ে শোষণ-বঞ্চনার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সাহচর্যে এক বিচিত্র সম্পৃক্তির পরীক্ষা আজও দিয়ে চলেছেন। নিজেদের তাঁরা সংখ্যালঘু আখ্যা দিতে চান। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যালঘু তাঁরাই যাঁরা অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষপাতমূলক আচরণ, অবিচার, পৃথকীকরণের চক্রে জর্জরিত। আফ্রিকা থেকে ধরে আনা 'নিগ্রো' দাস শ্রমিকরা শিক্ষা, তথা অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। 'নিগ্রো' বা 'নিগার' নামটি সভ্যতার নির্মমতম পরিহাস। তথাকথিত 'নিগ্রোয়েড' নরপ্রবাহের মানুষরা আজও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রতিবিম্বিত হন যে, তাঁরা বিগত দিনের দাস শ্রমিক।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে দু-কোটি আমেরিকান ইন্ডিয়ান বাস করতেন ওই উপমহাদেশে। মেক্সিকোর 'আজটেক', ইয়াকাটানের 'মায়া' এবং পার্বত্য গুয়েতামালার 'ইনকা' সভ্যতার মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে স্পেনীয়রা। গ্রামের পর গ্রাম তারা ব্রাজিলের আমাজান অববাহিকার প্রত্যন্ত প্রদেশে ঢুকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভীত, সন্ত্রস্ত 'ইন্ডিয়ান'-দের তাঁরা ধরে নিয়ে গেছে দাস শ্রমিক হিসেবে। 'নূতন পৃথিবী'র অরণ্য ও প্রকৃতির সন্তানেরা 'সুসভ্য' ইউরোপীয়দের কাছ থেকে হুপিং কাশি, যৌনরোগ, বসন্ত, ওলাওঠা রোগও পেলেন। ফলে আদিবাসীদের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পড়ে রইল হাতে গোনা যায় এমন কিছু

মানুষ। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে যাঁদের সংখ্যা ছিল এগার মিলিয়ন, ১৫৬৫ সালে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন আট মিলিয়নে এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা কমে দাঁড়ালেন মাত্র দু-মিলিয়নে। পেরুতে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ১৫৩১ থেকে ১৫৬১ সালে শতকরা ৫০০ ভাগ কমে গিয়েছিল। পেরু, গুয়েতেমালা, মেক্সিকোতে সামান্য কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য লক্ষ লক্ষ আমেরিকান আদিবাসীদের উপর এইভাবে রাজত্ব আরম্ভ করে। যাঁরা গভীর জঙ্গলে কিংবা পার্বত্য এলাকাতে পালিয়ে গেলেন তাঁরা কিছুদিনের জন্যে বাঁচলেও সুসভ্য নরমুণ্ড শিকারীদের হাত থেকে তাঁদের রেহাই ছিলনা। যাঁরা বাঁচলেন তাঁরা দুর্গম স্থানে আশ্রয় নিলেন। আজ তাঁদের সংখ্যা ষোলো মিলিয়ন। তাঁরাই আজ 'ইন্ডিয়ান' নামে পরিচিত। পার্বত্য উপত্যকাতে বসবাসকারী এই বিপুলসংখ্যক ইন্ডিয়ানরাই, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ছিল সস্তা শ্রমিকের মুক্ত আড়ত। খেতে-খামারে, খনিতে-বন্দরে, সরকারি, বেসরকারি, গৃহস্থালির কাজে সর্বত্র এরাই সস্তা শ্রমিক। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্পেনীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'ইন্ডিয়ান' সংস্কৃতির বহু উপাদান সর্বসাধারণের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে। 'ইন্ডিয়ান'দের ভাষা 'নাহাটিও', 'মায়া', 'কিউচুয়া', 'আয়মারা' অনেকেই বলতে পারেন।

ক্যাথলিক ধর্ম সরকারি ধর্ম হলেও ইন্ডিয়ানদের ধর্মীয় ভাবনা ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে। গুয়েতেমালা, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, পেরু, বলিভিয়া, সুরিনাম প্রভৃতি দেশে ইন্ডিয়ানরা বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। এক কথায় তাঁরা নিজ নিজ বাসভূমিতেই পরবাসী। অন্যদিকে, ব্রাজিলের ইন্ডিয়ানরা ইউরোপীয় 'সুসভ্য' মানুষজনদের আসার আগেও বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাঁদের ছিল বহু ভাষা ও সংস্কৃতি। পর্তুগীজরা দক্ষিণ আমেরিকাতে সমুদ্র উপকূলবর্তী 'টুপি' ভাষাভাষী গোষ্ঠীর প্রথম সাক্ষাৎ পান। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি এক একটি গ্রাম বা মাত্র ৪০০ জন লোকসংখ্যা নিয়ে একটি পৃথক রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখতেন। ঝুমচাষ, মাছধরা আর শিকার ছিল তাঁদের জীবিকা। তাঁদের উলঙ্গ শরীর, বিচিত্র পোশাক এবং জীবিকা ইউরোপীয়দের ভীত করে তুলেছিল। তাঁরা ইন্ডিয়ান নারীদের মধ্যে আকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারতেন না। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগিজদের এই নতুন উপনিবেশে বহু 'ম্যামেলিওকস'-দের (পর্তুগিজ পিতা ও ইন্ডিয়ান মায়ের সন্তান) সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পর্তুগিজ শাসকদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং তাঁদের আসল প্রয়োজন ছিল সস্তা শ্রমিকের— যাঁরা ব্রাজিলে চিনি উৎপাদনে সহায়ক হবে। নিগ্রো দাস শ্রমিকের পাশাপাশি 'ইন্ডিয়ান' শ্রমিকরা তাঁদের মুনাফার বাজারকে রমরমা করে রাখতেন। জেসুইট ধর্মীয় কর্তারা ইন্ডিয়ানদের

জন্যে 'অ্যালডিয়ামেনটজ' বা মিশন প্রতিষ্ঠা করেন সমতল এলাকাতে আমাজন নদীর ধারে, যাতে সহজেই বাইরের লোকরা যাঁরা সস্তা শ্রমিকের জন্যে আগ্রহী তাঁরা যাতায়াত করতে পারেন। হত্যা, রোগ, অত্যাচার, অবিচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বহু আদিবাসী প্রজাতি নিঃশেষিত হয়ে যায় ব্রাজিল-এ। আসলে যেখানেই উৎপন্ন পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার পাওয়া যেত সেখানে আদিবাসীরা হয় সমূলে নিহত হতেন অথবা সেখান থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হত। বিশেষত আমাজন নদীর উপত্যকাতে 'রাবার' চাষের ক্ষেত্র নির্বাচিত হবার পরই আদিবাসীদের উপর দুর্বার আক্রমণ আসে।

১৯১০ সালে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, কারণ সেই সময়ই ইন্ডিয়ানদের জন্যে সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও 'অশান্ত' ও 'বৈরী' কায়েনগাং আদিবাসী গোষ্ঠী ত্রাসের সঞ্চারক ছিলেন। ইতালির অধীনস্থ সান্টা ম্যাথিউজ শহরটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয়ে। রিও ডি জেনিরো এবং সাও-পালো-র সংবাদপত্রগুলিতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের খবর ছাপা হতে থাকে, কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, ব্রাজিলের অর্থনৈতিক বিকাশের পথে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিই সবচেয়ে বড়ো বাধা। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সাহায্য করার জন্যে ফেডারেল সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। রেল লাইন পত্তন ত্বরান্বিত করা হল। জঙ্গল সাফ করে বসবাসকারী কফি চাষিদের এবং নব অভিবাসনকারী ইউরোপীয়দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হল। গুটি কয়েক মানবপ্রেমী সংস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং কিছু আদর্শবান ব্যক্তি আদিবাসী গণহত্যার প্রতিবাদে মুখর হলেও ব্রাজিলের শাসকগোষ্ঠীর তথা সাম্রাজ্যবাদীদের কালো হাতকে তারা নিরস্ত করতে পারেনি। ১৯১০ সালে ব্রাজিল সরকার 'রনডম কমিশন' নিয়োগ করেন এবং সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সমবেদনা নিয়ে 'অ্যাসিমিলেশন' বা সম্পৃক্তির কথা বললেন। রনডম সাহেবের সুপারিশ অনুসারে ব্রাজিলিয়ান ইন্ডিয়ান প্রোটেক্শন সার্ভিস গঠন করা হয় এবং সরকারি কর্মচারীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল, মৃত্যু অবধারিত হলে মর, কিন্তু হত্যা করনা। রনডম সাহেব এইভাবে 'নামবিকিউবা', 'কেপকিরিয়াদ', 'রামারামা', 'টুপি', 'জিকবি', 'কয়াপো', 'আসুরিনি', 'গোভিয়াস' প্রমুখ বৈরী ইন্ডিয়ানের জন্যে সমঝোতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। বিদ্রোহী, যুদ্ধবিশারদ 'কায়েনগাং' আদিবাসীরা ১৯১৬ সালে মাত্র ২০০ জন বেঁচেছিলেন।

মেক্সিকোর আজটেক, কুলহুয়াজটেক্স, টারসকানস, শাপোটেকানস্ প্রভৃতি গোষ্ঠী সভ্যতাতে ছিল প্রাগ্রসর। মোট ১২৫টি ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী

গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করতেন। সংস্কৃতি ও ভাষার অমিল হলেও সকলেই ভুট্টা, বীন, স্কোয়াস উৎপাদন করতেন। এঁরা বর্ষপঞ্জী ব্যবসাতে ছিলেন উন্নত। প্রাসাদ, পিরামিড, দেবতাদের জন্যে মন্দির, দুর্গ তাঁরা তৈরি করেছিলেন। তাঁদের পাথরের খোদাই করা মূর্তি ও ধাতুর শিল্পকর্মে ছিল শিল্পীর ছোঁয়া। কিন্তু তাঁদের সমাজেও ছিল অভিজাত, সাধারণ ও দাস মানুষের শ্রেণিবিভাগ। টেনোচিটলান ও টেকস্-কোকো নামে দুটি সুন্দর শহরও ছিল তাঁদের। ১৫২১ সালে তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় নয় মিলিয়ন। ১৫১৯ সালে ৬০০ জন স্পেনবাসী মেক্সিকোর সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করার পর ১৮১০ সালের মধ্যে এই 'নূতন স্পেন'-এ মোট ২ লক্ষ ইউরোপীয় নববসতি তৈরি করেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার 'নিগ্রো' দাস শ্রমিকও আসেন এই নতুন দেশে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইন্ডিয়ানদের জনসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে যায়। সাম্রাজ্যবাদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মেসটিগাজি' গোষ্ঠী অর্থাৎ বর্ণসংকর গোষ্ঠীর আবির্ভাব শুরু হয়। যদিও শতকরা দশভাগ ইন্ডিয়ান মহিলা এবং শতকরা তিরিশভাগ নিগ্রো দাস মহিলা শ্রমিকও ছিল সেখানে। ককেশয়েড এবং আফ্রিকান পুরুষরা বাধ্য হয়ে আমেরিকান ইন্ডিয়ান মহিলাদের সঙ্গে বৈধ ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এক মিশ্র প্রজাতির সৃষ্টি করেন। সামাজিক মর্যাদাতেও এরা ছিল শাসক স্পেনবাসী ও আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মাঝামাঝি। স্পেনের শাসকগোষ্ঠী এই বর্ণসংকর 'মেসটিজোস' এবং ইন্ডিয়ানদের গোষ্ঠীগুলির অভিজাত সামাজিক শ্রেণি 'পিলিজ'-দের মাধ্যমে শাসন চালাতেন। পরবর্তীকালে 'পিলিজ'-দের ক্ষমতা কমে আসে এবং সাধারণ ইন্ডিয়ানদের মালিকত্ব এক শ্রেণি থেকে অপর শ্রেণিতে চলে যায়। ইন্ডিয়ানদের 'গ্রাম্য' এবং 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' বলে মনে করা হত। ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার ছিলনা। বাধ্যতামূলক শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্যে স্পেনীয় সামন্ত 'এনকোমিয়ান্ডারা' ওই নিয়ম চালু করেছিলেন। ইন্ডিয়ানদের সভ্য করার জন্যে ক্যাথলিকরা ভার নিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের মালিকদের জন্যে মুরগি ও 'টার্কি' হাঁস রাখতে বাধ্য হতেন। আজ মেক্সিকোতে শতকরা তেতাল্লিশ জন 'মেসটিজো', শতকরা বিশজন শাদা মানুষ এবং সাঁইত্রিশ জন ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ানদের 'এজিডো' বলে খ্যাত অনুর্বর জমিতে চাষ করতে বাধ্য করানো হত।

আমেরিকার নিগ্রোদের কথা উঠলে মেলভিল হার্সকোভিটের কথা স্বাভাবিকভাবেই আসবে। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই নৃতত্ত্ববিদ দেখিয়েছেন নিগ্রোরা দাস-শ্রমিক হিসেবে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কীভাবে। মূলত পশ্চিম আফ্রিকা, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, গোল্ডকোস্ট, নাইজিরিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি দেশ থেকে এরা আগত।

১৮৩৪ সালে ইংরেজ উপনিবেশে, ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের উপনিবেশে, ১৮৬৩ সালে ওলন্দাজ উপনিবেশে, ১৮৬৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৮৮৮ সালে ব্রাজিলে দাসপ্রথা উচ্ছেদ হলেও, তাঁদের চুল, দেহের গড়ন, গায়ের রং সবকিছু আজও পুরোনো দাস-শ্রমিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পশ্চিম আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইক্ষু চাষ ছিল সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তুলোর চাষ ছিল আরও লাভজনক। অতি মুনাফার জন্যে তাই প্রয়োজন ছিল দাস শ্রমিকের। নিগ্রোদের দাস শ্রমিক থেকে মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি তখনই ঘটল যখন আবাদ-অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। নিগ্রোদের দাস-শ্রমিক থেকে মুক্ত-মানুষ হিসেবে স্বীকৃতির পিছনে এটাই হল আসল সত্য।

কলম্বিয়া থেকে প্রকাশিত 'ইয়াভি' পত্রিকার সূত্র ধরে জানতে পারা গেছে যে, কলম্বিয়া সরকার সেই দেশের ইন্ডিজিনাস মানুষজনের অধিকার সীমিত করার জন্যে একটি 'আইন প্রণয়ন করতে চান। কিন্তু ওই আইনের পিছনে ইন্ডিজিনাস মানুষরা লক্ষ করেছেন বদ মতলব। গুপ্তহত্যা, ভয়, পুলিশি সন্ত্রাস চালিয়ে বহু 'কুনা' আদিবাসী মানুষ নিজ বাসভূমি ছেড়ে পানামা সীমান্তে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৭৫ সালে তাহামি ইন্ডিয়ানরা তাঁদের নিজ বাসভূমিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেন, কিন্তু ক্ষমতাশালী এস্‌কোবার পরিবার পুলিশের সাহায্যে ১৯৭৮ সালে তাঁদের তাড়িয়ে দেন। 'তাহামি' গোষ্ঠী পুরোপুরি বৈরী হয়ে পড়েছে এবং এমতাবস্থায় নরহত্যা বন্ধ করার জন্যে মানবাধিকার কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

মেক্সিকোর ম্যাটল্যানজিনকা উপত্যকাতে বসবাসকারী মাজাহুয়া লাহুয়কা, ওটোমি, ম্যাটল্যানজিনকা গোষ্ঠীগুলির সর্বোচ্চ পরিষদীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে। তাতে স্বাধিকার ও স্বশাসনের অধিকার, আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির স্বীকৃতি ও বিকাশের জন্যে ঐক্যের শপথ নেন ওই চারটি গোষ্ঠীর নেতারা। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে টেমোয়া শহরে অনুষ্ঠিত একটি সভার ঘোষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে যে, মেক্সিকোর জাতীয় সংবিধান সংশোধন করে মেক্সিকোর বহুভাষা ও বহু গোষ্ঠীকে স্বীকার করে নেওয়া হোক। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ সকলের জন্যে উন্মুক্ত করা হোক এবং আদিবাসীদের জন্যে রাষ্ট্র কল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসুক। পানামার উত্তর-পশ্চিম এলাকার চিরিকুই প্রদেশের তাবাসারা অঞ্চলে 'গুয়ামি' আদিবাসীদের বাসভূমিতে চেরো-কলোরাডো পরিকল্পনার ফলে এক সুবিশাল খনি ও ধাতব কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। 'গুয়ামি' আদিবাসী গোষ্ঠী ছোটো ছোটো দলে বিভাজিত হয়ে আত্মীয়তা-বন্ধনের উষ্ণতাতে বসবাস করেন। এঁরা ঝুমচাষি, মৎস্যশিকারী ও শিকারজীবি। ফেলিক্স

নদীতে পড়েছে তামা, কয়লার মিশ্র-গর্দা। পবিত্র নদী ফেলিক্সের জলে মাছ ধরা, স্নান করা, পশুপালন করা, সবই তাঁরা করতেন। সবই এখন বিপন্ন। ১৯৭৯ সালের ১৮-২১ সেপ্টেম্বর গুয়ামি জাতীয় মহাসভার সম্মেলন কানক্যুয়েনটো শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৫০০ প্রতিনিধি দেশজ জেলা বোকাস, ডেল টোরো, ভ্যারাগুয়াজ এবং চিরিকিউ থেকে অংশগ্রহণ করেন। তারা ওই বিশাল কর্মকাণ্ড ও অন্য দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধিতা করেন।

নরওয়ের উত্তর অংশে বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে বসবাস করেন 'সামি' গোষ্ঠীর মানুষ। যাঁদের জীবিকা বল্‌গা হরিণ পালন। তুষারের উপর একধরনের শৈবাল হচ্ছে বল্‌গা হরিণের মূল খাদ্য। কিন্তু আলটাক্যাওটোকেইনো নদীর উপর জলাধার নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ তৈরি করার ফলে 'সামি' গোষ্ঠীর মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ওয়ার্লড কাউন্সিল অভ্‌ ইন্ডিজেনাস পিপ্‌লস্‌ ও ইন্টারন্যাশন্যাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ারস-এর কর্তাব্যক্তিরা নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'সামি' আদিবাসী গোষ্ঠীকে বাঁচাবার জন্যে আবেদন করেছেন। কানাডার সুপরিচিত আদিবাসী 'নুটকা' গোষ্ঠীর 'মাওয়াছাট' উপগোষ্ঠীর প্রধান জেরি জ্যাক একটি আন্তর্জাতিক কাগজ কোম্পানির (তাহাশিস কোম্পানি) অমানবিক কার্যকলাপের উপর গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। এই কোম্পানি ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপমালার গোল্ড নদীর অববাহিকাতে প্রায় দশ লক্ষ একর কাঠের (বৃক্ষের) জমির মালিক। সুবৃহৎ এই কাগজ কোম্পানিটির সুবিশাল কাঠের আড়ত 'মাওয়াছাট' প্রজাতিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষত যেভাবে পরিবেশ দূষণ হয়ে চলেছে তাতে সমগ্র উপজাতি গোষ্ঠীটিকে হয় সরে যেতে হবে, নচেৎ বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অস্ট্রেলিয়া লেবার পার্টির বর্ষীয়ান সদস্য মি. কেন ফ্রাই দাবি করেছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনী পূর্ব টিমর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী দখল করার পর সেই দেশে মোট জনসংখ্যার ছয়ভাগের একভাগ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ আদিবাসীকে হত্যা করেছে। (সূত্র : রবার্ট ম্যাক্লাউহিন, দি গার্ডিয়ান, লন্ডন, ২১.৫.১৯৭৯)।

সমগ্র বলিভিয়ার মূল অর্থনীতির আধার হল চিনি। ইজোজেনো, চিরিকুয়ানে প্রভৃতি বহু দেশজ গোষ্ঠীর মানুষ সেই দেশে মোট ৬৮,০০০ হেক্টর জমিতে বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং তাঁদের কোনো স্বাধীনতা নেই। ১৭৮৮ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অস্ট্রেলিয়াতে প্রবেশ করার পর দেখা গেছে যে, এই 'সভ্য' মানুষগুলির আগমনের আগে ৬০০ গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রায় তিন লক্ষ আদিবাসী মানুষজন সেখানে বসবাস করতেন। সেখানকার আদিবাসীরা ১৯৭২ সালে প্রথম রাজনৈতিক ভোটাধিকার ও ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষার আইনানুগ

সুযোগ পান। পশুপালক অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ইরকালা, বিবলুম্যান, পাপুয়াসহ নিউগিনি ও নিউজিল্যান্ডের মাউরি গোষ্ঠীর মানুষরা আজ খনিজ দ্রব্য উৎপাদন, জঙ্গল নিধন, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা, ইউরেনিয়াম সন্ধান, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ফলে মারালিঙ্গা, উমেরা, ওয়েপা গোষ্ঠীর মানুষের মতোই সস্তা শ্রমিক হয়ে পড়েছেন— এমনকী মরুভূমি অঞ্চল থেকেও তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চিলিতে মাপাচুদের অরণ্য ও ভূমির জন্যে আন্দোলন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরী রিয়াংদের বাঁচার লড়াই, বার্মার কারেন, কাচিন এবং আরাকানীদের আত্মত্যাগ ও মৃত্যু— স্বাধিকার লাভের জন্যেই। বরফাচ্ছাদিত গ্রিনল্যান্ড-এর ইন্ডিজেনাস মানুষজনের স্বশাসন ও স্বাধিকার সমর্থন করে ওয়ার্লড কাউন্সিল অভ ইন্ডিজেনাস পিপলস্-এর সভাপতি জর্জ ম্যানুয়্যাল বলেছিলেন যে, এই স্বশাসন সমস্ত পৃথিবীর আদিবাসী মানুষজনদের কাম্য ছিল। ক্যারিব ভাষী সুরিনামের আকুরিও গোষ্ঠীর জনসংখ্যা মাত্র ৬০ জন। শিকারীজীবি এই গোষ্ঠী আজ নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে চলেছে। নিকারাগুয়ার আদিবাসীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম মানবমুক্তির অন্যতম বিপ্লবী সূত্র বলে পরিচিত হয়েছে। প্যারাগুয়ের টোবা ম্যাসকোই গোষ্ঠী আন্দোলনের পর তাঁদের জমির অধিকার ফিরে পেয়েছেন, গুয়েতেমালাতে সৈন্যবাহিনীর ‘আদিবাসীদের খতম কর’ অভিযান চলছে। ভেনজুয়েলার আদিবাসীরা ‘সভ্য’ মানুষদের দেওয়া রোগে অবলুপ্তির পথে। উত্তর ব্রাজিলের ‘অ্যানোয়ামা’ গোষ্ঠীর বসবাসকারী বনাঞ্চলে উন্নয়নের, রাস্তাঘাটের নামে চলছে ‘খাণ্ডব দাহন’। পেরুর পার্বত্য অঞ্চলে ‘আমাহুয়াকা’ নামক একটি গোষ্ঠী যেন এখনও ইভ এবং আদম-এর জীবনযাপন করে তাঁদের নিজ বাসভূমিতে। কিন্তু স্বর্গ থেকে বিদায় আসন্ন। সভ্য মানুষ পৌঁছে গেছে সেখানেও।

জাতি গর্ব

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ লিখেছেন, ‘কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্বাবাহ মহাহনু, হ্রস্বাপাণি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্ধজ— ভগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সব দিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন। বলা বাহুল্য এ ধরনের উক্তি সেই প্রাচীনকালের আর্য ভারতীয়ের জাতি-গর্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।... মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষকে প্রবল করবার একটা বড়ো উপায় এই জাতি-গর্ববাদ।’ বরেণ্য এই কথাসাহিত্যিক তাই ক্ষোভে ও দুঃখে বলেছিলেন— ‘ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সংগঠন হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা পাইনা, যাতে

বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসীকে আর্য ভারতবর্ষ আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী দুহিতা উলুপীকে এবং মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িকভাবে সহচরীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি। ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনাপুরের আর্যগরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নির্বাসিত জীবনের সুখ-সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। আর্য-ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজও সেই ব্যবধান দূর হয়নি। আর্যয়ানার মধ্যে এক রকম জাতিগত ঔদ্ধত্য আছে। আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদারনীতিক হলেও এই বনিয়াদি জাতি-গর্ব (রেস প্রাইড) মানুষের রুচিকে অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ নতুন সাহিত্য শিল্প ও সমাজ সংস্কারের ভারতবর্ষ। কিন্তু এর মধ্যেও বিশেষভাবে একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজকে আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন, আধুনিক ভারতীয় তাঁর সাহিত্যের দর্পণে এমন প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেননি।' তপন সান্যাল বলেছেন, 'ল্যাতিন 'ট্রাইবাস' শব্দটি থেকে ইংরেজিতে 'ট্রাইব' কথাটি এসেছে। যার অর্থ হল একই বংশধারার ধারাবাহিকতা নিয়ে বসবাসকারী একটি গোষ্ঠী। এক সময় রোমানরা খুবই আনন্দের সঙ্গে প্রয়োগ করতেন নিজেদের গর্বিত পরিচয়ের সুবাদে।' পরে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ প্রভৃতি উন্নত জাতি-সত্তার মানুষরা এশিয়া, আফ্রিকা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া দখল করে বসলেন। তখন থেকেই 'অ্যাবোরিজিন্যাল', 'ট্রাইব', 'ওয়াইল্ড', 'হিলম্যান', 'স্যাভেজ', 'প্রিমিটিভ' ইত্যাদি শব্দ ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে বহুল প্রচারিত হতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছু আগে থেকেই ইংরেজ প্রশাসকদের দৌলতে, মিশনারিদের মদতে লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠনের সুবাদে ওই শব্দগুলি ভারতে প্রবেশ করে। কারণ ওই সমস্ত প্রতিশব্দে ইংরেজ সরকার যাদের ভূষিত করলেন তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল বিদ্রোহ ও বলিদানের অসাধারণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। উন্নত জাতিসত্তার ভারতীয় বংশধরেরা ওই সময়ে ইংরেজ আগমনকে যখন স্বাগত জানাচ্ছে, তখন প্রত্যন্ত ও দুর্গম অরণ্যে পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষরা দেশ ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতার জন্যে কোনো আপোস করেননি। বাংলা ভাষাতে ওই সমস্ত ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিরূপ সমাজবিজ্ঞানী প্রয়াত বিনয়কুমার সরকার তাঁর গ্রন্থ 'নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন', দ্বিতীয় ভাগে 'আদিম' ও 'পার্বত্য' জাতি শব্দগুলি প্রয়োগ করেন। অধ্যাপক প্রয়াত নির্মলকুমার বসু তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' পুস্তকে 'অরণ্যবাসী' শব্দ প্রয়োগ করেন। অন্যদিকে,

ভারতীয় নৃতত্ত্বের প্রবাদপুরুষ প্রয়াত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'মানভূম জেলায় পুরাকীর্তি ও কয়েকটি আদিম অধিবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে 'আদিম' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম সর্বগ্রাহ্য 'আদিবাসী' শব্দটি প্রয়োগ করেন কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে। পরে সংবাদপত্র মারফত আদিবাসী বুদ্ধিজীবীরাও 'আদিবাসী' কথাটি মেনে নেন। ডক্টর এ. কে. নাজমুল করিম সম্পাদিত 'সমাজবিজ্ঞান পরিভাষাকোষ' পুস্তিকাতে (বাংলা একাডেমী, ঢাকা) ইংরেজি 'ট্রাইব' শব্দের বাংলা 'গোষ্ঠী'/'উপজাতি' রূপে ধরা হয়েছে। কিন্তু বহু আদিবাসী বুদ্ধিজীবী 'উপজাতি' শব্দটিকে সর্বগ্রাহ্য বলে মনে করেননা। কারণ এক একটি আদিবাসী গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁরা কোনো ভারতীয় জাতির (কাস্টের) 'উপ' বা 'শাখা' নন। মধ্যভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ড. রামদয়াল মুণ্ডা, লোকসংস্কৃতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে প্রমুখ মনে করেন 'ট্রাইব' শব্দটিকে বিশ্বের সর্বত্র দেশজ মানুষরা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণা অনুসারে 'ইন্ডিজেনাস' শব্দটি সাদরে গ্রহণ করেছেন, তখন সেটি গ্রহণ করতে বাধা কোথায় ? কিন্তু ভারতের সংবিধান ৩৪২ ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যের রাজ্যপালদের সুপারিশক্রমে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যাকে বলা হয় 'তালিকাভুক্ত উপজাতিসূচী'। এই তালিকাটি অসম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয়— যার ফলে একটি প্রদেশে কোনো গোষ্ঠী তপশিলিভুক্ত উপজাতি হয়েও অন্য প্রদেশের জন্যে তালিকাভুক্ত নন। অথবা ১৯৩১ সালে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধি করানোর জন্যে শক্তিশালী জাতি-সত্তাগুলির চাপে, অথবা কোনো বৃহৎ পুঁজিপতিদের অবাধ জমিদারি ভোগের সুবাদে কোনো কোনো গোষ্ঠীকে আদিবাসী তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পিছনে যে গভীর উদ্দেশ্য ছিল তা আজ সমগ্র আদিবাসী মানুষজন বুঝতে পেরেছেন। বর্তমানে 'তপশিলী উপজাতি' শব্দটিও 'আদিবাসী' শব্দটির সমার্থক হয়ে গেছে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা। সরকারও এটা চান। কিন্তু আদিবাসী বুদ্ধিজীবীরা জানেন যে, সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীই তপশিলী উপজাতিতে তালিকাভুক্ত নন, যাঁরা তালিকাভুক্ত তাঁরাই শুধুমাত্র প্রশাসনিক ও আইনানুগত সুযোগ-সুবিধা পান।

নৃতত্ত্বের চালাকি

নৃতত্ত্ববিদ্যার পঠন-পাঠন এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছিল। রিজলের বর্ণিত 'বুনো', বা 'বুনা' নামে পরিচিত আদৌ কোনো গোষ্ঠী নেই। ছোটনাগপুর থেকে আগত একই সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের সামগ্রিক জাতি-সত্তা সেদিন 'বাঙ্গালি' জাতিসত্তার মানুষের কাছ থেকে নাম পেয়েছিলেন

'বুনো' বা 'বুনা' বলে— বিশেষত যাঁরা সুন্দরবন, নদিয়া, কিংবা বর্তমান বাংলাদেশের জলাজমি হাসিল, কিংবা নীলচাষের শ্রমিক হিসেবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জ্বালাতে নিজ বাসভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রবোধকুমার ভৌমিক মনে করেন যে, 'ব্রিটিশ শাসনের সময় বৈষম্যমূলক মানসিকতায় চালিত হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে তা গবেষণা নয়।' (দেশ, ২৯ নভেম্বর, ১৯৮৬) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্রের নাম 'বুনাজ অব বেঙ্গল' ; বাংলা বিভাগের একটি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে 'কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিত দেহাকৃতির জন্য পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করিবার কালে পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজ স্বভাবতই মুখোসের ব্যবহার প্রচলন করিয়াছে।' আরও একটি অভিনব গবেষণার নজির ওই গ্রন্থেই আছে বাঁধনা (?) পরবের গান শীর্ষকে— 'এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ গরু বা মহিষ নাচানো। শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মহিষ কিংবা ষাঁড়কে বাঁধিয়া তাহাকে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্বে এইভাবে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ইহাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হইত। বর্তমানে কেবলমাত্র লাঠি দিয়া খুঁচাইয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।' বইগুলির উদ্ধৃতি দিলাম এই জন্যে যে, এগুলি গবেষণালব্ধ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব ও বাংলা বিভাগের লোকসংস্কৃতি শাখার আকর গ্রন্থ। আদিবাসী ভারত ও তথাকথিত আর্য ভারতের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তাই অন্য ভাষা ও অন্য রূপ নিচ্ছে। সুবোধ ঘোষ বলেছেন, 'হাজার হাজার বছর পরে খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দীতে আর্য ভারতের সৌহার্দ্যের আহ্বান মাত্র ক্ষীণস্বরে ঘোষিত হয়ে আদিবাসীদের কানে পৌছতে আরম্ভ করেছে। আদিবাসীদের কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারেনা, অনেকেই সংশয় করে।'

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি

ছায়াবৃত অরণ্য, পাহাড়, ডুংরি, টিলা, পাহাড়ি চালের ঝর্ণা, নদী, তাঁরই মাঝে জঙ্গল কেটে উদ্ধার করা চাষ-জমি ছিল আদিবাসীদের পরম নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের অবাধ ক্ষেত্র। তাঁদের লৌকিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের জন্যে পবিত্র শাল বৃক্ষের সুশোভিত কুঞ্জে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সারনা থান/জাহিরা থান বা গ্রাম দেবতার স্থান। গ্রাম প্রতিষ্ঠা করার আগে, গ্রামের সীমানার চারিপাশে বড়াম, দুয়ারসিনী, রঙ্কিনী, কুদরা, সন্ন্যাসী নানা দেবী-দেবতা প্রতিষ্ঠা করে জাহির থানে মারাংবুরু/বড় পাহাড়, জাহের এরা, গোঁসাই এরা, মড়েকো, তুরুইকো (পাঁচ বহিনী, সাত বহিনী) প্রভৃতি দেবী-দেবতা প্রতিষ্ঠা করে

নিভৃত জঙ্গলের মাঝে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রাম। দেবী-দেবতার তুষ্টির জন্যে নাইকি/লায়া, দেহরী/দেশউলি/পাহান, অর্থাৎ পুরোহিতদের হাতে সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে গোষ্ঠী এবং গ্রামের অভ্যন্তরীণ শাসন ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল মাঝি/মুণ্ডা/মাহাতো/মানকি/সর্দার প্রভৃতি পরম্পরাগত কার্যনির্বাহকদের উপর। সারা বছর ধরে নানা উৎসব, গান, নাচের অসাধারণ যৌথ সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মাধ্যমে শিশু, কিশোরদের প্রকৃতিকে, জঙ্গলকে অতি আপন করে ভালোবাসতে শেখানোর জন্য অসংখ্য গল্প, রূপকথা, ধাঁধা/কুদুম/জান-কহনী, শুন-কহনীর মিছিল, প্রবাদ ও ছড়ার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুশাসন শেখানো হোত। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া হোত— গ্রামের একপ্রান্তে, জঙ্গলের কাছাকাছি ধূমখুড়িয়া, ঘোটুল, আর যৌবনের জয়-গানে মুখরিত, উধয়া ঝুমুর বীরসেরেঞ-এ আপ্লুত জীবন-যৌবনের 'দেশ-শিকার' বা 'দিশুম সেঁন্দরা'কে কেন্দ্র করে। শারহুল, বাহা, করমা প্রভৃতি উৎসবে শালফুল, কুড়চি, ধাধকি, বেঁওরা, মহুয়া ফুলের অসাধারণ মাদকতা জঙ্গল-কেন্দ্রিক মানুষগুলোকে কঠিন-জীবন সংগ্রামের মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে। যেভাবে দ্রুত জঙ্গল নিধন হচ্ছে, সভ্যতার অক্টোপাস যেভাবে আদিবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে আদিবাসীদের সমস্ত জীবন-জীবিকা, গোষ্ঠীসত্তা, সংস্কৃতি বিপন্নই শুধু নয়, তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্নটিও জড়িয়ে পড়েছে। সমগ্র সাঁওতাল 'বিনতিতে' (মৌখিক শ্রুতিতে) বনভূমি ও বনদেবতাদের স্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বনভূমি আবিষ্কার, জনপদ সৃষ্টি, নগর, গ্রাম সবকিছুই বনভূমিকে কেন্দ্র করে।

অকয় মায় চিয় লেৎ হো বির দিসম দ? (কে বনভূমি আবিষ্কার করেছেন?)

মারাং বুরুয় চিয়ালেৎ হো বির দিসম দ।
(মারাং বুরু এই বনভূমি আবিষ্কার করেছেন।)
অকয় মায় বেরেল লেৎ হো বির দিসম দ?
অকয় মায় বস্তিলেৎ আতো ডিয়াড়ো?
মারাং বুরুয় বেরেলং লেৎ বির দিশম দ
জাহের এরায় বস্তিলেৎ আতো ডিয়াড়ো।

(কে বনভূমি সঞ্জীবিত করিয়াছিল? কে গ্রামগুলির বসতি স্থাপন করিয়াছিল? মারাংবুরু বনভূমি সঞ্জীবিত করিয়াছিল। জাহের এরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল গ্রামগুলিতে। সংগ্রহ ও অনুবাদ শ্রীমঙ্গলচন্দ্র সরেন— 'শিলালিপি', দ্বিতীয় সঙ্কলন, জামশেদপুর, ১৯৭৯, সম্পাদক: ড. বঙ্কিম মাহাতো।)

সম্পূর্ণ ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে কুড়মী, হো, লোহার, কুম্ভার,

ঘাসি, গড়, বাগাল, ঠেঠরী, দেশওয়ালী মাঝি, ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি গোষ্ঠীর উপর সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, লোকসংস্কৃতি বিষয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধান করেছি, তাতে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে জঙ্গলের বিভিন্ন জীব-জন্তু তাঁদের বংশধারার প্রতীকই শুধু নন, পাহাড়, গাছ, বুনোঘাসসহ নদী-ঝরনার নামগুলো আজও তাঁদের পূর্বপুরুষদের নাম হিসেবে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত। চাঁইবাসা, চক্রধরপুর, সম্বলপুর, রাঁচী, ময়ূরভঞ্জের চিতোড়া, মাকুন্দ ইত্যাদি এলাকাতে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে গঁড়/আহির গোষ্ঠীর কিল্লী বা বংশপ্রতীক হচ্ছে হাতি, ভেঁসা, হনুমত (হনুমান), বাঘ, (চুয়ারী বাঘ, মোহনা বাঘ, কেন্দয়া বাঘ, পরামানিক বাঘ), নাগ (কদম বংশী নাগ), কুটার (ছোটো হরিণ), সুবর্ণ কুটার, বাঙ্কি কুটার, তাছাড়াও আছে সুঁয়া (টিয়া পাখি), বালি হাঁস ইত্যাদি।

জঙ্গলের দেবতা সাঁওতাল পরগনার রাজমহল পাহাড় থেকে শিমলীপাল পাহাড় পর্যন্ত অসংখ্য। ডেলরা বুরু, দালমা বুরু, হিজলা বুরু, বড়পাহাড়, পাংগা, পাবড়া বুরু, অযোধিয়া বুরু, পাঞ্চেত বুরু, সারান্ডা, কিরিবুরু, কসুত দারাগাড়া, বাচ্চিবুড়ি, বন-কুমারী, চক্কাসিনী, বড়াম, রাঙ্গাহাড়ি প্রমুখ অসংখ্য দেবী-দেবতার বিশ্বাসে, জঙ্গল নির্ভরতার সুবাদে আদিবাসী-চাষি মানুষজন ছিলেন আপন বিশ্বাসে সুখী। অরণ্য তাঁদের দিত ফুল আর নানা ধরনের সুস্বাদু ফল। আম, জাম, কাঁঠাল, পিয়াল, কেন্দু, আতা, মহুয়া ফল, কুসুম, হরতকী, বহড়া, আমলকী, কুল, বট, পাকুড় সহ জঙ্গলের বিভিন্ন কন্দ-মূল, মধু ছিল তাঁদের খাদ্য। বাঁশের কুরুল, বিভিন্ন গাছের শাক, লতা, ব্যাঙের ছাতা ছিল অফুরান। এ ছাড়া জঙ্গলের শুকনো ঝুড়িপাতা, কাঠ ছিল জ্বালানি। শালগাছের পাতা, ধুনো, দাঁতন, শালফুল, শালফল ছিল সামান্য অর্থ রোজগারের সাধন। ছাগল, ভেড়াসহ গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য জঙ্গলের পাতা ছিল অপরিহার্য। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই শিকার করা বন-মোরগ, তিতির, ময়ূর, খরগোশ, হরিণ— বনশূয়োরের সুস্বাদু মাংস, নদী-নালা-ডোবার মাছ তো ছিলই। চাষাবাদ করে যেটুকু ধান পাওয়া যেতো, তাতে সারা বৎসর চলতো না অনেক আদিবাসী পরিবারের, কিন্তু জঙ্গল বাকিটা পুষিয়ে দিত।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে, জঙ্গল কেটে জঙ্গলের দেব-দেবীকে মান্য করে কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহনশীলতা, সামাজিক সাম্য ও লেনদেনের মাধ্যমে যে ঐক্য বজায় রাখতেন তার প্রতীক ছিল 'খুঁটকাঠি' স্বত্বাধিকার। এই খুঁটকাঠি কৃষকদের সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ রাধাগোবিন্দ মাহাতো বলেছেন, 'পোড়াহাটের গ্রামপ্রধান মুণ্ডা হইলে মুণ্ডা ; হো, গোয়ালা, অথবা কুম্ভার হইলে প্রধান, কুড়মি

হইলে মাহাতো, নাগপুরিয়া গৌনজু, সাঁওতাল হইলে মাঝি, ভূঁঞা হইলে তাঁহাকে নায়েক বলা হয়। পোড়াহাটের অধিকাংশ গ্রামপ্রধান-ই গ্রামের আদি বাসিন্দা অর্থাৎ খুঁটকাঠিদারদের বংশধর। উত্তরাধিকার অগ্রজের, কিন্তু যাঁরা বহিরাগত (আদিবাসী নন) তাঁরা সাধারণত এই অধিকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হন।' তাই যে বনাঞ্চল ছিল আদিবাসীদের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের লীলাভূমি, সেই বনাঞ্চল যখন ইংরাজদের শাসনাধীনে চলে যাবার পর 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' ঘোষণা করে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল, আদিবাসীরা ঠিক তখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

ভারতের ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র ও লোকসংস্কৃতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর অতি সুপরিচিত 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— 'প্রকৃতির কোলে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়, শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। তখন তাদের কণ্ঠে জাগে বিচিত্র মধুর সংগীত—

বিড় নাড়গে নওআ অডাঃক' কঃক' আলাং
রাজারানি নন্ডে আলাং কংক' আলাং
রেঙ্গেচ জালা দ লাং এড়ের গিডিয়া,
সের্মা রেয়াঃক' সুক্লাং ভুঞ্জাও সুকজংআ।

অর্থাৎ—

এ বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করব
রাজারানি হয়ে আমরা থাকব,
জগতের দুঃখ-কষ্ট আমরা ভুলে যাব
স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।

বছরের পর বছর তাদের জীবন কাটে প্রকৃতির অন্তঃপুরে, অফুরন্ত আনন্দের মাঝে। বাইরের জগতের এতটুকু কালিমা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনা। প্রকৃতির মতই তারা সরল, শান্ত ও সুন্দর। ছল, চাতুরী, প্রতারণা তাদের অজানা।'

ভারতের বিভিন্ন নরপ্রবাহের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষজন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ও তাদের সহযোগী জমিদার, মহাজন, সুদখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১), চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৯-১৭৯৯), তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ (১৭৮৩-১৭৮৫), লাল সিং বিদ্রোহ (১৮০০), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), ভূমিজ বিদ্রোহ ও গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা

(১৮৩২-৩৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), বিরসা মুণ্ডার বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০) ইত্যাদি বিদ্রোহ শুধুমাত্র ঘটে গিয়েছিল তৎকালীন বাংলা প্রদেশের রাজমহল পাহাড় থেকে শুরু করে ধলভূমের পাবড়া পাহাড়ে। কঁকা মাহাতো ও কালিয়া মাঝির নেতৃত্বে ময়ুরভঞ্জ রাজার পারিষদ ও সর্দারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯১৭-১৯১৯ সালে যে প্রজা-বিদ্রোহ হয়েছিল— তার মূল্যায়ন আজও হয়নি। প্রিয় ভূমি থেকে উচ্ছেদের নব নব সাম্রাজ্যবাদী কৌশলকে আদিবাসীরা মানতে পারছিলেন না। তাই ১৮৭৯ সালে গোদাবরীর রাম্পা অঞ্চলে বিদ্রোহ, বাস্তারের আদিবাসী বিদ্রোহ (১৯১০) তাছাড়া ভীলরা ১৮০০-১৮২৮ পর্যন্ত এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলেন গুজরাটে। মহারাষ্ট্রের ওয়ারলি বিদ্রোহ (১৯৪৭), উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার 'সাওরা' উপজাতিদের বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ অরণ্যের অধিকারের জন্য (১৯৪১)। এছাড়া আসামের খাসিয়া বিদ্রোহ (১৮২৯-১৮৩৩), নাগা-বিদ্রোহ (১৮৭২) আবোর বিদ্রোহ (১৯১২) উল্লেখযোগ্য। ভারতের নারীকুলের গৌরব রানি গুইদইলোর নেতৃত্বে নাগা আদিবাসী গোষ্ঠী যে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম করেছিলেন ১৯৩৩ সালে তা নজিরবিহীন। রতনমণি (রত্নমনি) নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে ত্রিপুরার আদিবাসীরা ১৯৩৭ সালে যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তার দমন কী ভয়ঙ্করভাবে হয়েছিল তা শুনলে সভ্য মানুষ আঁতকে উঠবেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজারা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর দিতে অস্বীকার করেন, তখন শাসক পারিষদরা মহারাজা বীরবিক্রমকে বুঝিয়ে দিলেন যে রত্নমণির আদেশেই এটা হয়েছে এবং তিনি নিজেকে 'মহারাজা' ঘোষণা করেছেন। এরপর আগরতলার মানুষ দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছিলেন উপজাতিদের উপর নির্মম ও বর্বর অত্যাচার। দূর দূরান্তের পাহাড়ী গ্রাম জ্বালিয়ে ক্ষুধার্ত, অস্থিচর্মসার উপজাতি শিশু-নারী-পুরুষদের পায়ে হাঁটিয়ে, দড়িতে বেঁধে, আগরতলাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। জীবন চক্রবর্তী লিখেছেন, 'ক্ষুধার্ত, অস্থি-চর্মসার যেন কতকগুলি শবদেহের মিছিল।' সারা ভারতের আদিবাসীদের এই বিদ্রোহগুলিকে নানা কেতাবি ও প্রগতিবাদী মোড়কে চুলচেরা বিচার করে অনেকেই শ্রেণিসংগ্রামের সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে গোষ্ঠী ও আঞ্চলিকতার প্রভাব ওইগুলিতে ছিল সবচেয়ে বেশি।

ভারতের আদিবাসী

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে নীরোদ সি চৌধুরী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দি কন্টিনেন্ট অফ সারসি' গ্রন্থে বলেছেন— 'মিশরের নীলনদের জলাধার নির্মাণের ফলে ঐতিহ্যমণ্ডিত মিশরের মন্দিরগুলি যেভাবে ডুবে গেছে ঠিক

তেমনি অবস্থা হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসীদের, শিল্পায়নের ফলে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেভাবে চলছে তাতে এই জাঁকজমকপূর্ণ সুবিশাল কর্মকাণ্ডে আদিবাসীদের কোনো ভূমিকা নাই, যার ফলে মানব ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ, অবলুপ্তির দিকে তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসীরা এক জঘন্য ও বিবর্ণ অবস্থার দিকে পৌঁছচ্ছে, দুঃখজনক হলেও এটা মানতেই হবে। ভবিতব্যের মাঝে এখন তাহলে প্রশ্ন কী? অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সত্যি সত্যিই তাঁরা অবলুপ্ত হবেন, না দাসত্ব ও অবক্ষয়ের নয়া শৃঙ্খলে তাঁদের জড়ানো হবে।'

নৃতত্ত্বের পুরোধা গবেষক হাইমেনড্রফ শ্রীচৌধুরির বক্তব্যকে সমর্থন করে সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী মানুষজনদের সম্পর্কে আমাদের যেভাবে আলোকিত করেছেন তার জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। অধ্যাপক হাইমেনড্রফ লিখেছেন যে, পনেরো বছর আগে অত্যন্ত উত্তেজক বিশ্লেষণ করে নীরোদ সি চৌধুরী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা আজও এই চার কোটি ভারতীয় আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের একই প্রাকৃতিক পরিবেশে অন্যান্য বর্ণ-হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাগ্যের সঙ্গে অরুণাচলের উচ্চভূমিতে এককভাবে বসবাসকারী আদিবাসীদের তুলনা করলে একটি বিকল্প উন্নয়নের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে— যার ফলে আদিবাসীদের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু আজ আদিবাসীদের উন্নয়নের কর্মসূচি, মত ও পথ কী হবে তা মূলত আদিবাসীদের উপর নির্ভর করে না। সমস্ত ব্যাপারটাই উপর থেকে চাপানো, বহির্নিয়ন্ত্রিত, যা আদিবাসীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ব্রিটিশ শাসনের শেষদিকে আদিবাসীদের জন্য নীতিবিষয়ক প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চালক বিতর্ক শুরু হয়। নৃতত্ত্বের দ্বারা আলোকিত কিছু প্রশাসক আদিবাসীদের জন্য বিশেষ সুরক্ষার নীতি গ্রহণের পক্ষে মতামত দিলেন, কেউ বা তাঁদের পুরোপুরি নিরালাতে থাকার স্বাতন্ত্র্য দিতে চাইলেন। কিন্তু এগুলি ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মনঃপূত হয়নি, তাঁরা এই সংরক্ষণ ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, এর ফলে ভারতীয় মূল জনস্রোতের সঙ্গে তাঁদের সাঙ্গীকরণের দেরি হবে এবং এই নীতির ফলেই ভারতীয় জাতির (ইন্ডিয়ান নেশন) মধ্যেই পৃথকীকরণ অব্যাহত থাকবে। সংবাদপত্র, রাজনৈতিক বক্তৃতার মারফত যদিও মাঝে-মাঝেই এই বিতর্কটিকে টেনে আনা হয় তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরিত্যক্ত হয়েছে। যাই হোক, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংহতিসূচক লেনদেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে চলেছে সংরক্ষিত অরুণাচল প্রদেশেও। চাপে পড়ে এই সংহতি সাধনের ফলে আদিবাসীদের স্থান ভারতীয় মূল জনসমাজে কতটা সম্মাননীয় হয়েছে, সেটাও আজ খতিয়ে দেখতে হবে।

সংহতির উগ্র সমর্থকরা দেশজ কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন এবং তাঁরা মনে করেন যে সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের দ্বারা আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি মিলেমিশে যাবে মূল জনসমাজে। কিন্তু ভাষা, ধর্ম, জাতিতে বিভক্ত তথাকথিত প্রাগ্রসর ভারতীয় সমাজের কোনো সমানতাই নেই, যার ফলে বহুধা বিভক্ত কোন বিশেষ প্রকোষ্ঠে, কোন বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠীর সমন্বয়ের জায়গা হবে তার কোনো উল্লেখ থাকেনা। ভারতীয় আদিবাসী জনসংখ্যাও একইভাবে বহুধা বিভক্ত, তাঁদের অসংহত, বিক্ষিপ্ততার দরুন নরপ্রবাহ (রেস), ভাষা, সাংস্কৃতিক মান ছাড়াও অসংখ্য ভৌগোলিক পরিবেশে তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন। আদিবাসীদের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের সমন্বয় ভাবতে হলে তাই ভাবা দরকার নরপ্রবাহগুলির বৈশিষ্ট্য— যা উপেক্ষা করা হয়।

ভারতের রাজনীতিতে ধর্ম ও ভাষা মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক বিতর্ক সৃষ্টি করলেও দেহগত বৈশিষ্ট্য তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। আদিবাসীরা নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য বাজারি ভাষা বলতে পারেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কোনো সরকারই আদিবাসীদের ভাষায় পঠন-পাঠনের উৎসাহ দেননি; যদিও শাসক নেতৃবর্গের ঝুলিতে মাঝে-মাঝেই আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন কায়দা-কানুনের ম্যাজিক বাক্সটা থেকেই গেছে। আদিবাসীদের জঙ্গল ও ভূমি, চাষযোগ্য জমি ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়াতে যেভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে, তার জন্য আদিবাসীদের ঐতিহ্য প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেয়েছে, নড়বড়ে হয়ে পড়েছে তাঁদের স্ব-পরিচয়। হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়ার জন্য আদিবাসীরা কোনো সংগঠিত আন্দোলন আজও করতে পারেননি। গুটিকয়েক আইন প্রণয়ন করে আদিবাসীদের জমি কোনোমতেই রক্ষা করা যাবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত আইনী-ব্যবস্থাকে সরল করা হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আদিবাসীরা সামাজিক ন্যায়বিচার পাবেননা। বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বন আইনের ২৯ নম্বর ধারার সুবাদে বিজ্ঞপ্তি ৪৮৪৫ (২ নভেম্বর ১৮৯৪) দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন যে, ভাগলপুর বিভাগের সাঁওতাল পরগনা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নিম্নলিখিত প্রজাতির গাছ কাটা নিষিদ্ধ ঃ যেমন (১) শাল, (২) সৎশাল, (৩) কুসুম, (৪) খেওয়া, (৫) গামহারকাশমার, (৬) মুর্গা, (৭) নিম, (৮) আম, (৯) তেঁতুল, (১০) জাম, (১১) কেঁন্দ, (১২) মহুয়া, (১৩) কাঁঠাল, (১৬) আসন, (১৭) হেসেল, (১৮) টিলাই, (১৯) হোরো, (২০) মুরূপ, (২১) সেগুন, (২২) শিশু, (২৩) তাল। কিন্তু সরকারের আদেশ সত্ত্বেও রাজমহল, হিজলা, লিটিপাড়া, দেওঘর, জামতাড়া কোথাও আর সেই গাছগুলি দেখতে পাওয়া যাবেনা।

আদিবাসী তথা বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্গীয় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান যাঁরাই জঙ্গলের মধ্যে ও জঙ্গলের কাছাকাছি বহুদিন ধরে আছেন তাঁরাই জ্বালানির জন্য, পশুখাদ্যের জন্য, ঘরগৃহস্থালি ও চাষাবাদের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। দুঃসহ দারিদ্র্যের জন্য আট-দশ মাইল দূর থেকে ঝাঁটি, শুকনো কাঠ কেটে মাথায় বোঝাসহ, কোলে শিশু সন্তান নিয়ে আদিবাসী লোধা ও খেড়িয়াদের শহরে কাঠ বিক্রি করতে দেখে যাঁরা জঙ্গল নিধনের ছবি ছাপেন সংবাদপত্রে, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন প্রতিদিন সরকারি ঠিকাদার, কনট্রাক্টাররা, চোরাই কাঠ ব্যবসায়ীরা কটক, কলকাতা, রাঁচী, পাটনাতে ট্রাকে ট্রাকে কাঠ পাঠাচ্ছেন। কাঠের হাজার গুদামের মালিকানা একজন আদিবাসীরও নেই।

রাজ্য সীমানা কমিশনের সুপারিশে পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে ভুক্তির পর ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ম্যানুয়েল সংশোধন করে (১৯৬২) বলা হয়েছিল, শাল গাছের 'পঙ' (গোড়া) বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর, পাঞ্চেট, কেশরগড়, রাকাব, বান্দোয়ান, কুইলাপাল, বলরামপুর, অযোধ্যা, মাঠা, ঝালদার শাল-জঙ্গলগুলি আজ শেষ হলো কেন? সিংভূমের ঘাটশিলা, কোকপাড়া, দামপাড়া, মুসাবনী, ডুমুরিয়া, নরসিংহগড়, যাদুগোড়া, চাণ্ডিল, পটমদা, চক্রধরপুর, চাইবাসার শাল-জঙ্গল শেষ আজ। এশিয়ার সর্ববৃহৎ শাল অরণ্য 'সারান্ডা'তে চলছে মাফিয়া চক্রের অবাধ লুঠতরাজ। সারা ভারতেই রাজনৈতিক স্বার্থপুষ্ট দুষ্টচক্রের সাহায্যে বন-লুণ্ঠন অব্যাহত। তাহলে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু-কানু, চাঁদ ভৈরব-সহ তিরিশ হাজার মানুষের গণআত্মদান কি বিফলে যাবে? ধরতীআবা বিরসা মুণ্ডার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'জঙ্গল আমাদের' স্লোগান।

কুল, কুসুম, পলাশের লাক্ষা আজ পৃথিবীতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রপ্তানি পণ্য। জ্বালানির অভাবে মানুষ সেগুলোতেও হাত দিচ্ছে। ফরেস্ট ডেভলেপমেন্ট করপোরেশনের মারফত জঙ্গলের সমস্ত তৈলবীজ (শাল, কুসুম, মহুয়া, করঞ্জ, নিম) অধিগ্রহণ করে ব্যবসা শুরু হলো ঠিকাদার মারফত। বিহারের আদিবাসীরা যাতে একেবারে জলের দরে সেগুলো ঠিকাদারদের কাছে বিক্রি করে তার জন্য ১৯৮০-৮১ সালে দীর্ঘ ছয় থেকে সাত সপ্তাহ কোনো বীজ কেনা হলনা। শালফুল, শালফল, কেন্দুপাতা, সমস্ত কিছু আদিবাসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল সরকারি আইন করে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী গ্রামগুলির সমস্ত মানুষ অলিখিত কেনা গোলাম হয়ে গেলেন বনবিভাগের কর্তাদের, কারণ নিজেদের ইচ্ছামতো বাইরে কাজ করতে গেলেই জমি-বাড়ি, গরু-ছাগল সবকিছুই বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা। বনবিভাগের সামান্য একজন কর্মীও ছোটনাগপুরে 'বড় সাহেব'।

শিমলীপাল জঙ্গল উন্নয়ন পরিকল্পনাতে ৫০,০০০ আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হবার সম্ভাবনা, এই শীর্ষকে ওড়িয়া ভাষাতে প্রকাশিত 'সমাজ' পত্রিকাতে (২৫/১২/৮০) একটি খবর বের হয়েছিল। এ ছাড়াও বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বড়ো বড়ো নদী বাঁধ জলাধার যেমন ডি. ভি. সি., কোয়েল কারো, সুবর্ণরেখা, হীরাকুন্দ, কংসাবতী-সহ অসংখ্য পরিকল্পনাতেও জঙ্গলকেন্দ্রিক মানুষেরা বিপন্ন হয়েছেন। এ ছাড়াও আছে জঙ্গলাকীর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য যথা লোহা, কয়লা, সোনা, তামা, সীসা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের খনি স্থাপন এবং তার ফলস্বরূপ আদিবাসীদের জমি, বাস্তু ও অবাধ বিচরণক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা শক্তিশালী ও বৃহৎ গোষ্ঠী তাঁরা, বিশেষত মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও, হো, কুড়মী, গঁড় গোষ্ঠীর মানুষরা অন্যান্য ছোটো ছোটো ও দুর্বল গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন। সেই ছোটো ছোটো গোষ্ঠীগুলি হল বীরহোড়, লোধা, খেড়িয়া, অসুর, জুয়াঙ্গ, শবর, মাহলী, দেশওয়ালী মাঝি, পাহাড়িয়া (পাহিরা), মাল-পাহাড়িয়া এবং সোয়ারিয়া পাহাড়িয়া বা মালের ইত্যাদি। এই ছোটো গোষ্ঠীগুলির সমস্যা অন্যরকম। বড়ো বড়ো গোষ্ঠীগুলির কাছে এরা সমবেদনা ও নিরাপত্তা আশা করে। বীড়হোড় গোষ্ঠী জঙ্গলের চিহড়লতা দিয়ে দড়ি তৈরি করে। দালমা ও অযোধ্যা পাহাড়ের পাহাড়িয়া (পাহিরা) গোষ্ঠী জঙ্গল থেকে ঝাঁটার কাঠি বিক্রি করে সংসার চালায়। লোধা, খেড়িয়ারা জঙ্গল শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের বাঁচার স্বার্থেই লুটপাট করে বলে সরকারি ভাষা অনুসারে তাঁরা অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী। মাহলীরা বাঁশের কাজ করে, কিন্তু বাঁশ আজ দুর্মূল্য। অসুর, ঠেঁঠরী, লোহার গোষ্ঠীর মানুষেরা লোহা গলিয়ে, কাঁসা, পিতল গলিয়ে কারিগর।

৩১ আগস্ট ১৯৮৭-তে প্রকাশিত টাইমস্ অভ ইন্ডিয়ার একটি খবরে জানা গেছে যে সাহেবগঞ্জের নবগাছিয়া গ্রামের আঠারো জন পাহাড়িয়া ১৫ মে থেকে অনাহারে মারা গেছেন। হাসপাতালের সূত্র ধরে জানা গেছে যে, বাঁঝি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে তেত্রিশ জন ভর্তি হয়েছেন যাঁরা অতিশয় দুর্বল এবং কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাই তাঁদের নেই। নবভারত টাইমস পত্রিকার ওই একই দিনের একটি খবরে জানতে পারা গেছে যে, বড়হেট প্রখণ্ডের পাথরচাটি গ্রামের ২৬ জন পাহাড়িয়া মারা গেছেন এবং ৬০ জন বড়হেট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁরা মৃত কোনো পশুর মাংস খাওয়ার জন্য রক্ত আমাশয়ে ভুগছেন। দুটি খবরের বিষয়বস্তু এক এবং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে

প্রাকৃতিক জীবনদায়িনী সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত ; যার ফলে গোটা পাহাড়িয়া গোষ্ঠীই আজ বিপদের সম্মুখীন। নৃতত্ত্ববিদ শ্রীভগবান রায় ও সুনীত মণ্ডল সাঁওতাল পরগনার সোয়ারিয়া পাহাড়িয়াদের উপর ক্ষেত্র গবেষণা চালিয়ে লক্ষ করেছেন, যে বনভূমি ও বনসম্পদ তাঁদের কাছে মাতৃদুগ্ধের মতো ছিল, সেই প্রকৃতি অন্য শক্তিশালী মানুষেরা লুণ্ঠন করেছে এবং করছে। তাঁরা এখনও 'খালু-কুদে' বা ঝুমচাষি। অনাহার, অপুষ্টি রোগ (যক্ষ্মা, গলগণ্ড, চর্মরোগ) তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও লক্ষ্য করেছেন অযোধ্যা ও দালমা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী পাহাড়িয়া (পাহিরা) গোষ্ঠীর বিলুপ্তির ঘণ্টাধ্বনি। বাঘমুণ্ডীর বীরহোড়দেরও সেই একই অবস্থা। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, অনাহার, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যুর ভয়াবহতাতে তাঁরা আতঙ্কিত। কিন্তু এই বিপন্ন মানবগোষ্ঠীগুলিকে বাঁচাবে কে ? বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের নেতারা এখনই হয়তো নানা স্তোকবাক্য শোনাবেন। আদিবাসী নেতারা, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতব্বর ব্যক্তিরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকারের সাহায্য, বৈদেশিক সাহায্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য নিয়ে দরিদ্র মানুষগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে হয়তো তাঁরা বাঁচবেন। সরকারকেও নতুনভাবে ভাবতে হবে ওই সমস্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলিকে বাঁচাবার কথা।

নৃতত্ত্বের গবেষণার আচার্য ড. সুরজিৎচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ধারণাই ঠিক—ভারতীয় জনজীবনে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব খুব ধীরে হওয়ার জন্য ভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আদিম কেন্দ্রীয় ও গোষ্ঠীমুখী জনজীবনের পারস্পরিক হৃদয়াবেগ এখনও অক্ষুণ্ণ। তাঁর মতে 'বিচ্ছিন্ন আদিবাসী/কৃষক স্থিতি থেকে জাতি/কৃষক স্থিতিতে আসতে হলে মিশ্র বহু গোষ্ঠীর সঙ্গে লেনদেনের সামাজিক সম্পর্ক, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগতভাবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের দক্ষতা, সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব, আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সভ্যতাকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, মিশ্র সংস্কৃতি চর্চা, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ঐতিহ্যের লেনদেনের দরজা খুলে রাখতে হবে।' আলোকপ্রাপ্ত এবং প্রাগ্রসর 'এলিট' সমাজ প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যেভাবে প্রাকৃতিক বিষয়-আশয়কে নাড়া দিচ্ছেন, তাতে ভারতীয় সমাজের হাজার হাজার বছরের বিবর্তনবাদী সংস্কৃতি গত একশো বছরের মধ্যেই ওলট-পালট হয়ে গেছে। আজ প্রযুক্তি নিয়েই সমস্ত ক্ষেত্রে লেনদেনের পথ খুলতে হবে। জঙ্গলকেন্দ্রিক আদিবাসী মানুষজনকে শিক্ষা ও সরলীকৃত প্রযুক্তিবিদ্যার হাত ধরে চলতে সাহায্য করতে হবে। যত দ্রুত এটা সম্ভব ততই সকলের মঙ্গল।

আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের সুবিশাল বনাঞ্চলে, সমুদ্রে উচ্ছল প্রাকৃতিক পরিবেশে ছটি আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করেন। তার মধ্যে চারটি নিগ্রিটো ও দুটি মঙ্গোলয়েড বৈশিষ্ট্যসমূহের মানবকুল। নিগ্রিটো নরপ্রবাহের মানুষজন আজ নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে। গ্রেট আন্দামানীজদের সংখ্যা ২৮, ওঙ্গেদের সংখ্যা ১০১ জন, জারওয়াদের সংখ্যা আনুমানিক ১৫০ থেকে ২০০ জনের মধ্যে। সেন্টিনারীজদের সংখ্যা প্রায় ১০০। তরুণ নৃতত্ত্ববিদ শ্রীবিশ্বনাথ সরকার ১৯৮২-৮৬ সালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্ষেত্র-গবেষণা করেছেন জারওয়াদের মাঝে। শারীরিক নৃতত্ত্বের আলোকে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেমং এবং আয়েত্তা গোষ্ঠীভুক্ত দুটি নিগ্রিটো শাখার সঙ্গে তাঁদের মিল। ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার ফলে আন্দামানের নিগ্রিটো বৈশিষ্ট্যের মানুষজনদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে যার ফলে তাঁদের মধ্যে সামূহিক বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে এবং তাঁরা এই মহা-প্রযুক্তির যুগেও গোষ্ঠীগতভাবে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছেন। এক সময় ৭০০ থেকে ৮০০ স্কোয়ার কিলোমিটার প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল, আজ তাতে টান পড়েছে নয়াবসতিকারী কৃষক ও সভ্যতার নয়ারূপকারদের আগমনে। এখন তাঁরা ৫০-৬০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে আবর্তিত, যার ফলে জীবিকার রসদে টান পড়ছে।

ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে আদিবাসী ভারত ও সংস্কৃত ভারতের এই দুরূহ দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে ভরাট করার জন্যে উন্নয়নের, প্রশাসনের বিকল্প বের করতে হবে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের 'হড়' বা মানুষ বলেন, অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষদের তাঁরা বলেন 'দিকু' বা 'দেকো'। ত্রিপুরার পাহাড়ী মানুষেরা, বিশেষত জামাতিয়া, রিয়াং, ত্রিপুরী, কলই, বংচের, মলশম ইত্যাদি মানুষেরা নিজেদের 'বরক' বলেন, বাংলাভাষীদের বলেন 'ওয়ানশা'। লোকসংস্কৃতিবিদ ড. শিশির মজুমদার উত্তরবঙ্গের একই নরপ্রবাহের দেশি, পলি, রাজবংশীদের পারস্পরিক উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ জ্ঞানের ব্যাপারটি তুলে ধরে বলেছেন, দেশী ও পলিরা ভিন্ন সম্প্রদায় এবং দেশীরা নিজেদের 'আহেল' বা প্রথম বাসিন্দা বলে দাবি করেন। পাহাড়িয়া গোষ্ঠী সাঁওতালদের 'গোলের' বা ভিনদেশী মানুষ এবং নিজেদের মালের অর্থাৎ মাল বা পাহাড়ের আদি বাসিন্দা বলেন। অসম বিকাশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের কৃৎ-কৌশল, জীবনবোধের তফাৎ সব কিছুই এই পরস্পর দোষারোপের জন্য দায়ি। মানুষের শাশ্বত মহিমা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজ প্রয়োজন বিকল্প গণ-চেতনার মাধ্যমের খোঁজ করা। পঠন-পাঠনের জন্য যে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়, সেগুলির নতুন করে লেখার

প্রয়োজনীয়তারও আজ সর্বব্যাপী। আদিবাসীদের নিয়ে জীবনঘন আবেগ দিয়ে যদি তাঁদের সমস্যাগুলি নাটকীয় আবেগে, তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতির মূল্যবোধকে সম্মান করে পরিবেশন করা হয়, তবে আলোকিত সমাজগুলির সঙ্গে আদিবাসীদের অপরিচয়ের দূরত্ব কমবে। শহর, গ্রামের শিক্ষিত মানুষরা তাঁদের প্রতি সমব্যথী হবেন। অন্যদিকে, বর্ণহিন্দুদের দ্বারা সর্বৈব নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমগুলিতে আদিবাসীদের সামগ্রিক সৃষ্টিশীল প্রয়াসও প্রগতিবাদী শহরের বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্যে নিজেদের সংস্কৃতির আবদ্ধতা থেকে বের করে এনে নূতন নূতন প্রয়োগ-পদ্ধতিতে তারা অভ্যস্ত হবেন। এ ছাড়াও আদিবাসীদের নিজস্ব মাধ্যমগুলি যেমন গান, নাচ, নাটক সব কিছুই নতুন সচেতনতার মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদী-মনের সৃষ্টিগুলির দ্বারা প্রকৃতি ও মানুষের জয়গান করতে পারবেন। আজ সারা পৃথিবী ধরে আদিবাসীদের নাচ, গান নিয়ে পরীক্ষা চলছে। ভারতের পরিকল্পনাবিদরা যদি এখনও ভেবে থাকেন যে আদিবাসীরা 'দ্বিতীয় শ্রেণির' নাগরিক তা হলে তাঁরা ভুল করবেন। সমস্ত পরিকল্পনার খসড়া তাঁদের করতে হবে আদিবাসীদের সাহায্য নিয়ে। হ্যাঁ, বিগত চল্লিশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বহু আদিবাসী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, তাঁদের সহযোগিতা নিলে শাসক গোষ্ঠীগুলির কোনো ক্ষতি হবে না ; উল্টে আদিবাসীরা নিজেদের উন্নয়ন-পরিকল্পনাতে সহযোগী হবেন যদি তাঁদের সম্মানের সঙ্গে ডাকা হয়। নচেৎ আদিবাসী উন্নয়নের নামে এতদিন যা হয়েছে তাই হবে। সংখ্যাতত্ত্বের বহর বাড়বে আর আদিবাসীরা দূরে সরে যাবে অভিমান নিয়ে। তাই অধ্যাপক রামদয়াল মুণ্ডা বলেছেন— কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বপরিচয়ের সঙ্কট দেখা দেয় মূলত নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে। আর এই নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, যাতে সৃষ্টিশীল শক্তি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আদিবাসী ভারত ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি বিষয়ে উন্নত ভারতের তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন জীবনবোধের কত তফাৎ—

(১) আদিবাসী ভারত প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী। অন্যদিকে, উন্নত এবং সংস্কৃত ভারত প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্যহীন।

(২) আদিবাসী ভারতের ইতিহাস অন্যকে আপন করার ইতিহাস। উন্নত ও সংস্কৃত ভারতের ইতিহাস শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস।

(৩) আদিবাসী ভারত সমতাকেন্দ্রিক। উন্নত ও সংস্কৃত ভারত উচ্চ নীচ স্তরভেদে জর্জরিত।

(৪) আদিবাসী ভারত গণতান্ত্রিক এবং সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বিবেক প্রসূত। অন্যদিকে, উন্নত ও সংস্কৃত ভারত সামন্তবাদী ধনতান্ত্রিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট।

(৫) আদিবাসী ভারতের অর্থনীতি সামুদায়িক, পারস্পরিক সাহায্যপুষ্ট, উন্নত ও সংস্কৃত ভারত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ধনতান্ত্রিক।

(৬) আদিবাসী ভারত প্রকৃতির থেকে পেয়েছে অনাবিল গ্রাম্য সরলতা। উন্নত ও সংস্কৃত ভারত দুর্নীতিগ্রস্ত, চাটুকার ও ধান্দাবাজ।

(৭) আদিবাসী ভারতের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিগুলি গণমুখী ও যৌথ অংশগ্রহণকারী। উন্নত ও সংস্কৃত ভারতের শিল্প-সাহিত্য দূরের বস্তু, সাধারণ মানুষ সেখানে দর্শক, শ্রোতা, পাঠকমাত্র, অংশগ্রহণকারী নন।

নতুন ভারতের, নূতন প্রজন্মের কাছে আদিবাসী সমাজ এখনও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনর্গঠনের উজ্জ্বলতম নমুনার আলোর দিশারী।

ভারতের পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়

ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রচিন্তা এদেশের ইতিহাসের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিল। যদিও আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা এবং তার কাঠামো অনিবার্যভাবেই ঔপনিবেশিকতার কারণে, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র-কাঠামোর আদলে সূচিত হয়েছে। কিন্তু এই বিবর্তনের ধারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতিভূ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আরও বেশি শক্তিশালী করেছে। আর এই বিবর্তনের স্ফটিকীকরণ আমরা লক্ষ করেছি মোঘল বা মুঘল আমল থেকেই। মধ্য-এশীয় রাজ্যগুলিতে ইসলাম প্রসারিত হওয়ায়, বিশেষত পারসিক ও মোঙ্গলীয় প্রভাবে 'বাদশাহ' কথাটি ব্যবহৃত হতে থাকে যা ভারতের ক্ষেত্রে আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে। মোঙ্গলীয় চিন্তাতে 'বাদশাহ' হলেন ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং ভারতবর্ষে 'মঙ্গোলীয়' ধারার প্রতিনিধি হয়ে যে শাসকরা, যাঁদের আমরা বলি মুঘল, যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন, তাঁদের এই 'বাদশাহ' প্রত্যয় তাত্ত্বিকভাবে প্রথম যুগের 'সুলতান' প্রত্যয় থেকে অন্যদিকে মোড় নিল। ওই সময় থেকেই কেন্দ্রীভূত 'মসনদের' ধ্যান-ধারণা ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে। যদিও লোকজীবনে তা সত্যিই কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল বা সক্রিয় হয়েছিল তা অবশ্যই বিতর্কের বিষয়। অবশ্য মুসলমান যুগ থেকে মুসলমান ও অ-মুসলমান এই দুটি ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাগ নিশ্চিতভাবে ভারতের ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। এর পরে ইংরাজ যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয় স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে তাই অনুসৃত হচ্ছে। রাষ্ট্র এখানে অনেক বিমূর্ত ও শাসক হিসেবে সর্বব্যাপী। আর পাশ্চাত্যের এই রাষ্ট্র-প্রত্যয় ইংরাজদের একক সৃষ্ট নয়।

জাতীয়তা ও বঞ্চনা

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর তদানীন্তন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যে সর্বব্যাপী রাষ্ট্র প্রত্যয় গড়ে ওঠে তার মূল আধার ছিল খ্রিস্ট ধর্ম। ফরাসি বিপ্লব যে জাতীয়তার (নেশান্যালিটি) কথা তুলে পুরাতন ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল তার

রেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে পূর্ব ইউরোপের ভাষা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে বর্তমান রাষ্ট্রগুলি গড়ে ওঠে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পশ্চিমি রাষ্ট্রচিন্তা গড়ে উঠেছে এবং পশ্চিমি ভাবধারার মধ্য দিয়েই আধুনিক ভারত সেই কাঠামো গ্রহণ করেছে। ফলে 'পলিটিক্স' এবং 'স্টেট' আজও লোকজীবনের একটি বহু দূরের বিমূর্ত বিষয়, যার প্রাণভোমরা কেন্দ্রীভূত আছে কোনো কোনো বিশাল নগরে, যা গড়ে উঠেছে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামকে বঞ্চনা করে অসম বিকাশের মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে বিমূর্তভাবে বা প্রাক্-ইংরাজ শাসনাধীনের আগে ভারতবর্ষের জনপদীয় শাসন ব্যবস্থাগুলি এক না হলেও কীভাবে একটি সর্বগ্রাহ্য মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে বহু ভাষা ও সংস্কৃতি, বহু ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস নিয়ে তা আজও টিকে আছে। এই মহাশক্তির উৎস খুঁজতে গেলে অবশ্যই ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের লোকচর্চা ও জীবন দর্শনের ভাবাবেগ বোঝা দরকার। রাষ্ট্রীয় কারণে (ভারতের বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রত্যয়ে) অবশ্যই এক জনগোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর উপর তার শাসন ও প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেছে। প্রভাবশালী ও সুসংগঠিত জাতিসত্তার মানুষ দুর্বল ও অসংগঠিত জাতি-সত্তার ভাষা, সংস্কৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে, হীনমন্যতার বোঝা সুপরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তল্পিবাহক করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই প্রক্রিয়া আক্রমণাত্মক বা সক্রিয়ভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ধর্মীয় বিধান ও জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার। নৃতত্ত্বের আলোকে দেখা যাবে যে ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক সমানুপাতিক লেনদেনের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ-মৈত্রী করে, অথবা মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরকে আপন করেছে এবং প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে চলার নীতি নিয়ে জনপদীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন। ভারতের মতো এই সুবিশাল দেশে, যা একটি উপমহাদেশ বলেও পরিচিত, সেখানে একটি একক ধারার জীবনবোধ কখনো সর্বগ্রাসী হয়ে সমগ্র ভারতের জনজীবনে অখণ্ডতা প্রমাণ করতে পারেনি।

নৃতাত্ত্বিকদের একটি চিন্তাসূত্রে ধরা পড়েছিল যে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা একটি সর্বব্যাপী ধারা। কিন্তু তা আংশিক সত্য মেনে নিলেও উত্তরপূর্ব ভারতে, মধ্য ভারতে, দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য ও অরণ্যসংকুল প্রদেশে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার স্রোত যেন শুকিয়ে পড়েছে। পরম নিশ্চিন্তে বহু মানুষ ও গোষ্ঠী জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সর্বব্যাপকতাকে

উপেক্ষা করে আজও স্তর ভেদাভেদপুষ্ট জীবন মেনে নেননি। জনপদীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেখানে ব্রাহ্মণ্য জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার শিকড় গভীরে প্রোথিত হয়েছে, সেখানে লোকজ ও দেশজ পরিশ্রমমুখী উৎপাদনমুখী সমাজমুখী মানুষের প্রাণশক্তির উপর স্তরভেদের শিকল এমনভাবে হাজার হাজার বছর ধরে পরানো হয়েছে যে, তাঁরা অসহায় বোধ করে বেছে নিয়েছে 'নির্বাক' থাকার সংস্কৃতিকে ; আর তাঁদের হয়ে কথা বলে চলেছেন কুলগুরু, পুরোহিত, গুরুদেব ঋত্বিক, ঠাকুরের দল। নিজের জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়ে কে আর অপমানিত তথা শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি শুনতে চান ? ফলে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে শাস্ত্রীয়-নগর ও লোকজ-শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির মিশ্র পরিবেশ। সংগঠিতভাবে যখন প্রতিবাদের ভাষা নিম্নবর্ণের ও বর্ণবহির্ভূত মানুষেরা হারালেন তখন তাঁরা 'ভদ্রলোক' বা 'ভদ্রজাত' হবার জন্যে গোপাল ঠাকুরকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে পুজো-অর্চনা শুরু করলেন। নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করে তাঁরা যত্নবান হলেন উচ্চবর্ণ ও উচ্চজাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলি আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করতে।

নিজ নিজ সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল যৌথ প্রয়াসকে হারাবার সময় তাঁরা মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও একটি 'সম্মানশীল' আসনের স্বার্থে তাঁর সবই মেনে নিলেন। শহর-নগর/গড় থেকে অথবা বর্ণশাস্ত্রীয় অবয়বে গঠিত সংস্কৃত মন ও মনস্তত্ত্ব, পরবর্তীকালে ইংরেজ-সৃষ্ট মেকলীয় শিক্ষার প্রভাবে ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিষয়-আশয় নিয়ন্ত্রণের সুবাদে মেইন স্ট্রিম বা 'মূল ধারা' নামক চিন্তাটি এসেছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ক্ষমতাশীল, সম্পদকুক্ষিকারী নগর-শহরের এক বিশেষ শ্রেণির মানুষের তোতাপাখির বুলির নাম 'মূলধারা'। ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই এঁরা ভারতীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার হাজার হাজার বছরের নীরব, উষ্ণ, সংবেদনশীল ছোটোবড়ো বিভিন্ন স্রোতকে অস্বীকার করেন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে।

নৃতাত্ত্বিক ও পরিকল্পনা-বিশেষজ্ঞ তপন সান্যাল লিখেছেন, 'যেসব অঞ্চলের স্বাধীনচেতা পাইক বা রায়ত চাষীরা ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদেরকেই ইংরেজরা চিহ্নিত করেছিলেন, 'বর্বর', 'জংলী', 'চুয়ার' ইত্যাদি হীন সম্বোধনে, এগুলোর ইংরাজি প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'বারবারিয়ান', 'স্যাভেজ', 'ফিল্ড র‍্যাট'। আগেই বলা হয়েছে আঠারো উনিশ শতকে ইউরোপীয় বা ইংরেজরা এশিয়া-আফ্রিকার মানুষদের সম্পর্কে কোন্ ধারণা পোষণ করত। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময়েই দখলীকৃত উপনিবেশের স্থানীয় মানুষ সম্পর্কে 'আবরিজিন্যাল' ও 'নেটিভ' এই দুটি শব্দের বহুল প্রচলন শুরু হয়। এখনকার দিনে এই শব্দ দুটির যে অর্থই হোক না কেন, উপনিবেশবাদের যুগে তা কখনোই সদর্থে ব্যবহৃত হয়নি।... অবশ্য

সেদিন চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, সেনগুপ্ত, সান্যাল, ঘোষ, বোস, সেন, মিত্র, পানিগ্রাহী, মিশ্র, মহাপাত্র, চতুর্বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, শ্রীবাস্তব, পাণ্ডে বাবুদের কাছে 'নেটিভ' শব্দটা হয়তো-বা গ্রহণযোগ্য ছিল ইংরেজের মিত্র হিসেবে ; ইংরেজরা এটাই চেয়েছিল। ফলে 'নেটিভ' ক্রমশ 'নেটিভবাবু' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করল, যা অচিরেই বিদেশি প্রসাদগুণে মেকলের সৃষ্ট 'কলমচি বাবুসমাজ' হিসেবে ধনেজনে গৌরব প্রতিষ্ঠা লাভ করে গেল। অন্যদিকে, তাদের সমগোত্রীয় সমাজ পরিণত হল নিছক 'বন্য', 'অসভ্য', 'আদিম' ও 'সংস্কৃতি বহির্ভূত মানুষদের' সমাজ হিসেবে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'নেটিভ' শব্দটি বর্ণহিন্দুদের কাছে কাঁটার মতো ফুটছিল— তাই 'আর্য' শব্দটির প্রতিরূপ 'ভদ্রজাত' ও 'ভদ্রলোক' কথাগুলি তাঁরা সহজেই আমদানি করলেন ম্যাকস্‌মূলার-এর সূত্র খুঁজে। 'অসভ্য', 'জংলি', 'বুনো', 'আদিম', 'কুলি' ভূষণে ভূষিত এক বিশাল জনসমূহের মাঝে আরও একদল মানুষের জন্যে উপহার দিলেন 'ছোটোজাত' বা 'ছোটোলোক' শব্দটির। নেটিভ কথাটির কদর্থ 'ছোটোলোক' শব্দটির সঙ্গে মিলেমিশে গেল। এমনকী অতি-ব্যবহারে দীর্ণ 'চাঁড়াল' শব্দটি 'ছোটোলোক' শব্দটির পরিপূরক হয়ে দাঁড়াল।

সংস্কৃত ভাষা ও পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বর্ণ-হিন্দুদের সমূহ যে 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'র আদর্শ নিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করলেন, তাতে সুবিশাল ও উন্মুক্ত ভারতীয় মানসিকতাকে করল সংকুচিত। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের স্বাভাবিক ধারা হল রুদ্ধ। এতে উচ্চবর্ণ জাতিগোষ্ঠীগুলির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত থাকল না, স্বাধীনতার আগে ও পরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের ফলে এই সংগঠিত জাতিসত্তার মানুষদের জাতি-কেন্দ্রিকতার নির্লজ্জ প্রকাশও ঘটল। সাম্রাজ্যবাদীরা চলে গেলেও, দেশীয় বাজার দখলের জন্য আগ্রাসী জাতিসত্তার মানুষরা পুঁজিবাদী ও রাষ্ট্রীয় ধারণার অবয়বে জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়াতে বিভিন্ন 'সুবা' ভাগ করে নিলেন। এই 'সুবা' বা প্রদেশ ভাগের ঘটনা লোকজ মানুষজনের কাছে, বিভিন্ন জনপদে আবেশ আবেগ স্তিমিত হবার পর বোঝা গেল, কারা প্রভু এবং কারা প্রজা ? কিংবা প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্ক কতটুকু বা কত বেশি। ফলে উৎপাদনমুখী, পরিশ্রমমুখী মানুষ যাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকেই স্বাভাবিক বলে পরম্পরাগতভাবে ভাবতেন, তাঁরা আগ্রাসী ও স্থিতাবস্থা বজায়ের পক্ষে ওকালতি করার অর্থাৎ সংখ্যালঘু 'মূলধারা'র প্রবক্তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন বারবার।

হোমেন বরগোহাঞি লিখিত (আজকাল, ২৮ অগস্ট, ১৯৮৬) 'রাজ্যের

জনগোষ্ঠীগুলি সচেতন হওয়ায় অসমীয়া বর্ণহিন্দুরা শঙ্কিত' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "আসামের সবচেয়ে অগ্রসর সম্প্রদায় হল অসমিয়া বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়। আসামের সমস্ত প্রচার মাধ্যম তাদের হাতে। যতদিন আসামের উপজাতি, নিম্ন বর্ণহিন্দু এবং মুসলমান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীগুলি সমস্ত প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েও চুপ করেছিলেন ততদিন কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু নবজাগরণে এই জনগোষ্ঠীগুলি নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্রই, অসমীয়া বর্ণহিন্দুদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব হারাবার ভয়ে তারা যুদ্ধং দেহী মনোভাব দেখাতে শুরু করেছেন। আসামে যা ঘটেছে তা হল অসমীয়া বর্ণহিন্দু ও অন্যান্যদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। অসমীয়া বর্ণহিন্দু লড়াই-এ নেমেছেন তাদের এতদিন ধরে ভোগ করে আসা নিষ্কণ্টক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য। অন্যরা জোর কদমে এগিয়ে আসছেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করার জন্যে। এটাকে আসামের ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। কেননা অদূর ভবিষ্যতে আসামের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি কী রূপ নেবে তা বহুলাংশে নির্ভর করছে, এই লড়াই-এর পরিণামের উপর।" অসমের উদাহরণটি আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমানভাবে বিভিন্ন প্রদেশে ও প্রভাবশালী জাতি-বর্ণগোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য নয়?

সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

ভারতীয় গণতন্ত্রে মূল আধার ভারতের 'পবিত্র' সংবিধান। এই সংবিধানের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে ভারতের দুর্বলতম ও অনগ্রসর তথা সংখ্যালঘু মানুষজনদের রক্ষাকবচ। নৃবিজ্ঞানী ড. অজিতকুমার দণ্ডসহ বহু বিশিষ্ট আইনবিদ, রাজনৈতিক প্রবক্তা এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তপশিলি উপজাতিরা দেশের মোট জনসংখ্যার ২২ ভাগ। দুর্বলতম, অনগ্রসর ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতের কন্‌স্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লির প্রথম সভাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন যে, ওই সমস্ত পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষের উন্নয়নের জন্যে যথাযোগ্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনগ্রসর, সংখ্যালঘু এবং দুর্বলতম মানবসমূহের অপমান, লাঞ্ছনা ও বৈষম্য লক্ষ করে সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এবং এর জন্যে মহান সংবিধান প্রণেতারা, বিশেষত ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতের ইতিহাসের

পক্ষে এক উজ্জ্বলতম নাম হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ক অনুচ্ছেদে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র সমস্ত দুর্বল শ্রেণির মানুষের বিশেষত তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির মানুষজনদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে এবং সামাজিক অবিচারসহ বিভিন্ন ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। সংবিধানের ৪৬তম ধারাসহ মোট চব্বিশটি বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের রক্ষাকবচের জন্যে বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ২৪৪ ও ২৭৫ অনুচ্ছেদও রয়েছে, যেখানে সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৯ ও ৩৫ নম্বর ধারা বা অনুচ্ছেদ অনুসারে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের সর্বস্তরে নিরাপত্তা প্রদান করার জন্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে ধর্ম, নরপ্রবাহ, জাতি-গোষ্ঠী, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থান নিয়ে কোনোভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ রাষ্ট্র বরদাস্ত করবে না। বিশেষত, দোকানে কেনাকাটার অবাধ অধিকার, হোটেল, ভোজনালয়, পানগৃহে, আনন্দমুখর প্রেক্ষাগৃহে বা সরকারি খরচে নির্মিত কুয়ো, স্নানঘাট, পুকুর, রাস্তাঘাটে অবাধ গতিবিধিসহ অবকাশযাপনকেন্দ্রে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিদের প্রতি কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। সংবিধানের মূল নীতি অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ওই অনুচ্ছেদ অনুসারে অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ তথা তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতিগোষ্ঠীরা মানুষজনদের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ বা ধারা অনুসারে বলা হয়েছে যে, তপশিলিভুক্ত জাতি এবং তপসিলী উপজাতির মানুষজন চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবেন এবং তার জন্যে রাষ্ট্র সংবিধান মারফত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৭ নম্বর ধারাতে অস্পৃশ্যতাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, অস্পৃশ্যতার আচরণ করা দণ্ডণীয় অপরাধ। ১৯ নম্বর ধারাতে ভারতের সর্বত্র বসবাস ও সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয় করার অধিকার ন্যস্ত হয়েছে। ২৩ নম্বর ধারাতে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক শ্রমিক বা বেগার শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা চলবে না, কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ করা চলবে না। সংবিধানের ২৯ নম্বর ধারার দুটি উপধারাতে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থকে নিরাপত্তা দেবার জন্যে বা নিশ্চিত করার জন্যে বলা হয়েছে যে, ভারতের যে-কোনো নাগরিকসমূহের, যাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা ও লিপি আছে,

অথবা যাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তাঁরা তা অবিকৃত রাখতে পারবেন। এবং আরও বলা হয়েছে যে, ধর্ম, নরপ্রবাহ, ভাষা, জাতি-গোষ্ঠীর অথবা অন্য কোনো অজুহাত দেখিয়ে কোনো নাগরিককে সরকারি সাহায্যে অথবা সরকারি মদতে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে যাবে না। সংবিধানের চতুর্থ অংশের ৩৮ ও ৪৬ ধারা অনুসারে, বাধ্যতামূলক নির্দেশের দ্বারা দুর্বল শ্রেণির মানুষদের বিশেষত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়নের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ন্যায়বিচার তাঁরা পাবার অধিকারী।

সংবিধানের ২৭৫ নম্বর ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ-সাহায্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হয়। এই টাকা কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য বাবদ অথবা অনুদান বাবদ রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয় তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের উন্নয়নের জন্যে। রাজ্য সরকারগুলি ওই টাকা পাবার পর তাঁদের ত্রাণ, খয়রাতিসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্যে ব্রতী হন। ৩২০ অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ মারফত চাকুরিক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকারকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ৩৩০তম ধারা অনুসারে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের লোকসভাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৩২তম ধারা অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা যা সংবিধানের প্রথম তফশিলের ক ও খ বিভাগে উল্লেখিত আছে তাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৩৩৪তম ধারা অনুসারে সংরক্ষিত আসনের সময়সীমা ও বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। ৩৩৫তম ধারা অনুসারে বিভিন্ন সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষত, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন চাকুরির ক্ষেত্রে। ৩৩৮তম ধারা অনুসারে ভারতের সংবিধানে উপরোক্তদের জন্যে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তার সুষ্ঠু প্রয়োগের এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা এবং তাঁদের নিরাপত্তার জন্যে যে সমস্ত রক্ষাকবচ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার জন্যে এক বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন আধিকারিক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ৩৩৯ ধারাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তপশিলি এলাকা ও তপশিলি উপজাতিদের কল্যাণের জন্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি দশ বছর অন্তর একটি কমিশন নিয়োগ করে ওই সমস্ত এলাকা ও উপজাতিদের উন্নয়ন ও শাসন সম্পর্কিত অবস্থার কথা প্রতিবেদন মারফত জানতে চাইবেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বলে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারেন, তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্যে। সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২তম ধারাগুলি মারফত রাজ্যগুলির রাজ্যপালদের জন্যে পরামর্শ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী, জাতি অথবা নরপ্রবাহের (রেস) তালিকা প্রস্তুত করবেন, বা সংবিধানের নীতি অনুযায়ী ওই তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীগুলিই তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতি হিসেবে চিহ্নিত হবে। ওই অনুচ্ছেদগুলিতে বলা হয়েছে যে, সরকার লোকসভায় আইন প্রণয়ন করে তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির তালিকার পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। ৩৬৬তম ধারা অনুসারে যা সংবিধানের চোদ্দতম অংশে লিপিবদ্ধ তার ২৪তম উপধারাতে বলা হয়েছে যে, তালিকাভুক্ত সেই সমস্ত জাতিগোষ্ঠী বা নরপ্রবাহ অথবা উপজাতি এবং এদের কোনো অংশ বা গোষ্ঠী অথবা পূর্ণ গোষ্ঠীই তপশিলি জাতি হিসেবে পরিগণিত হবেন। তেমনি ২৫তম উপধারাতে তপশিলি উপজাতির কথা বলা হয়েছে।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্যে যে সমস্ত রক্ষাকবচ নিশ্চিত করা হয়েছে, তার মধ্যে লোকসভা, বিধানসভাতে জনপ্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা, তপশিলি উপজাতির উন্নয়নের জন্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশার ক্ষেত্রে তপশিলি উপজাতিদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে মন্ত্রিসভাতে মন্ত্রী নিয়োগ, অসমের স্ব-শাসিত জেলাপরিষদের বা এলাকা উন্নয়নের ও কল্যাণের তদারকির জন্যে মন্ত্রী নিয়োগ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চাকুরিতে প্রতিনিধিত্বের জন্যে সংরক্ষণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দুধর্মীয় সংগঠনে প্রবেশাধিকারসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা, বেগার খাটা শ্রমিক নিয়ে যাওয়ার উপর নিষিদ্ধতা, বিশেষ সরকারি পদাধিকারী নিয়োগ করে ওই সমস্ত রক্ষাকবচের সুষ্ঠু প্রয়োগের তদারকি করানো, এ ছাড়াও তপশিলি উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিশেষ বিশেষ আইন ও প্রশাসনিক হুকুমনামা মারফত রক্ষাকবচগুলিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা হয়েছে। যার ফলে তাঁদের সার্বিক নিরাপত্তা, উন্নয়নের সুযোগ এবং বিশেষ বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

তপশিলি উপজাতিদের পারিবারিক ও জমির অধিকার-সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন, ১৯৫৬ সালের হিন্দু পোষ্য আইন এবং ১৯৫৬ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের আওতা থেকে তাঁদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তাঁদের পরম্পরাগত বিবাহের স্বীকৃতি এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তাঁদের নিজস্ব

বিধি-বিধানের উপর কোনো বড়ো রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি। জমির অধিকারকে তাঁদের পরম্পরাগত অধিকার বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তপশিলি উপজাতিদের জমি হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। প্রায় সমস্ত রাজ্য সরকার তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে তপশিলি উপজাতিদের জমি রক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ ছাড়াও শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে বয়সের ও যোগ্যতার শিথিলতা, বিভিন্ন পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট ধার্য মূল্যেরও বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সুপারিশ অনুসারে আদিবাসী ও দেশজ মানুষজনদের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রশ্নগুলিকেও মেনে নিয়েছেন।

অনগ্রসর কমিশন

ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৪০ ধারা অনুসারে ১৯৫৩ সালের ২৯ জানুয়ারি প্রথম অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন গঠন করেন। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কাকাসাহেব কালেলকর। এই কমিশন সারা ভারতের ২৩৯৯টি অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর তালিকা এবং ৮৩৭টি দুর্বলতম অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর তালিকাও প্রণয়ন করেছিলেন। শিক্ষায় ও সামাজিক পশ্চাৎপদ অনগ্রসর শ্রেণি-গোষ্ঠীগুলির জন্যে ছাত্রবৃত্তির সুযোগ এবং চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সুপারিশ করেছিলেন। সরকার চাকরিতে সংরক্ষণ দেননি। কারণ ৩৪০ ধারা বাধ্যতামূলক নয়। সংবিধানের নির্দেশে বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজ নিজ উদ্যোগে রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন গঠন করে, সেগুলির সুপারিশ নিজ নিজ রাজ্যে কার্যকরীও করেছেন। এমনকী রাজ্যের চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন। যে দশটি রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলি হল বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু। অন্যান্য ৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে শিক্ষা, চাকরিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পান। এই রাজ্যগুলি হল অসম, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, ওড়িশা, পণ্ডিচেরি ও রাজস্থান। কাকাসাহেব কালেলকর-এর সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৩-৬৪ পর্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র-বৃত্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেই ছাত্র-বৃত্তির সুযোগও কোনো এক গোপন আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। চাকরিতে অনগ্রসর শ্রেণির সুযোগ দূরে থাক, ছাত্র-বৃত্তি ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনের সুযোগ কেন বন্ধ হল তা তৎকালীন সামাজিক কল্যাণমন্ত্রী ও আমলারা বলতে পারবেন।

দ্বিতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের চেয়ারম্যান হন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দুবে। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৮ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই লোকসভাতে কমিশনের সদস্যদের নাম ও কমিশনের কার্যধারার নীতি ঘোষণা করেন। কমিশনের বিদায়ী সভা হয় ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে। সেই সভাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ দেন। কমিশন সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থান গমন করে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, জনপ্রতিনিধি এবং বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিসহ সাধারণ নাগরিদেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সমস্ত স্তরের বহু মানুষ অনগ্রসর শ্রেণিগুলির অবর্ণনীয় অবস্থার কথা কমিশনে কাছে তুলে ধরে এই শ্রেণিগুলির জন্যে চাকরিতে সংরক্ষণ, ছাত্র-বৃত্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্যে সংরক্ষণ, বয়স ও যোগ্যতার ছাড় দাবি করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মণ্ডল কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে তড়িঘড়ি করে ১ অগস্ট ১৯৮০ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ৩০ অগস্ট ১৯৮০ সালে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন যে, অনগ্রসরতার মানদণ্ড দেওয়া উচিত দারিদ্র্য ও দুঃস্থ জীবনযাপনের নিরিখে। জাতিগোষ্ঠীগতভাবে অনগ্রসরতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কমিটি অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীগুলির জন্যে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দেবার বিরোধিতা করেন। কার্যত পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জাতি ও গোষ্ঠী-পরিচয়, যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে অমোঘ এক অসাম্য, তাকে অস্বীকার করে।

পশ্চিমবাংলাতে মণ্ডল কমিশন যখন দার্জিলিং, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও কলকাতায় বিধানসভার একটি নির্দিষ্ট কক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি ফেডারেশন, আদিবাসী কুড়মী সমাজ, যাদব মহাসভা, বৈশ্য-তেলি মহাসংঘ, বারুজীবী সংঘ, যোগী সংঘ ইত্যাদির অগ্রণী নেতারা সাক্ষ্যদান কালে অভিযোগ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের লোকেরা সংখ্যালঘু হলেও সর্বক্ষেত্রে 'ডোমিনেট' করে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্যদিকে, সংখ্যাগুরু অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের জোর করে 'সাইলেন্স' বা নিশ্চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর সারা দেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বস্তুত কমিশনের সুপারিশগুলি আজ জাতীয় বিতর্কে পরিণত হয়েছে। ভারত সরকারের অধীনে কর্মরত অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব কত— তারও চুলচেরা হিসেব কমিশন দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দপ্তরে এবং বিভিন্ন বিভাগে মোট ১১,৭০৭ জন প্রথম শ্রেণির অফিসারদের মধ্যে তপশিলি জাতি

ও উপজাতির সংখ্যা ৮৪০ জন এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীর ৩০৩ জন। দ্বিতীয় শ্রেণির মোট অফিসার ৪৩,৮০৩ জনের মধ্যে তপশিলি উপজাতির ৫৯৮৫ জন এবং অনগ্রসর শ্রেণির ১৭৪২ জন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১৭,৮২৯ জনের মধ্যে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ৫৫২৮ এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলির ১৫০০ জন। স্বশাসিত সংস্থা ও অধস্তন সরকারি অফিসে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৯,০৭,৬১০ জনের মধ্যে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ১,৬৩,৯৪৮ জন এবং অনগ্রসর শ্রেণির সংখ্যা ১,৩১,০১২। সরকারি শিল্পোদ্যোগে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৫,৯০,৬৮৯ জনের মধ্যে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ১,১৭,৮৬৪ জন এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীর ৬২,৬৫০ ইত্যাদি।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিং মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদন পাবার পর সরকারিভাবে উল্লেখ করেন যে, সারা ভারতে ৩৭৪৩টি জাতিগোষ্ঠীকে 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি'র মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যাঁরা ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ। তাই সর্বক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীগুলির জন্যে শতকরা ৫২ ভাগ 'হিস্যা' পাবার তাঁরা অধিকারী বলে কমিশন মনে করলেও সুপ্রিম কোর্ট-এর একটি মামলার রায়কে মেনে নিয়ে সংবিধানের ১৫ (৪) এবং ১৬ (৪) ধারা অনুসারে সংরক্ষণ কোনো মতেই ৫০%-এর বেশি হতে পারে না বলেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে মোট ২৭% চাকরি সংরক্ষণের সুপারিশসহ, ছাত্র-বৃত্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিসহ নানা সুযোগসুবিধা নেবার সুপারিশ মণ্ডল কমিশন করেছেন।

মাদ্রাজের রামস্বামী পেরিয়ার, কেরলের শ্রীনারায়ণ গুরু, মহারাষ্ট্রের মহাত্মা ফুলে, তথা সর্বভারতের জন্যে ভীমরাও আম্বেদকর নিপীড়িত, বঞ্চিত, অচ্ছুৎ আদিবাসী, হরিজন, অনগ্রসর শ্রেণির তথা সংখ্যালঘু মানুষদের সমানাধিকার দেবার জন্যে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ ভারতের সংবিধানের ন্যায়বিচারের আহ্বানকে আর কোনো শাসকগোষ্ঠী চেপে রাখতে পারবেন না। শিক্ষা, চেতনা ও আন্দোলনের ক্রমাগত কুচকাওয়াজে বাজতেই থাকবে সকলের সমান অধিকার।

উচ্চবর্ণ রাজ

সমুদ্র মন্থনের গল্পটা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে গল্পটা, কিন্তু মূল্যহীন হয়ে পড়েনি।... সমুদ্র মন্থনে দেবতারা ধরেছিল বাসুকীর লেজের দিকটা, অসুরেরা মুখের দিকটা। সমুদ্র মন্থনে বিষ ও অমৃত দুই-ই উঠল। বিষ্ণু ছল করে অমৃতের ভাঁড় নিয়ে পালাল। দেবতারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে

নিল অমৃত। অসুরদের জন্যে পড়ে রইল প্রাণঘাতী হলাহল। শিবকে নীলকণ্ঠ হতে হল সেই বিষ পান করে। সৃষ্টি বেঁচে গেল ধ্বংসের হাত থেকে।

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণ ও উচ্চজাতিগোষ্ঠীর লোকরা সর্বক্ষেত্রে চাতুরির খেলাতে অমৃত পান করে চলেছেন। পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর, দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলির জন্যে বঞ্চনা, বৈষম্য ও দারিদ্র্যের হলাহল পড়ে আছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নামে উচ্চবর্ণ ও উচ্চজাতি-গোষ্ঠী তাঁদের নিজ নিজ 'সুবা'-তে নির্ভয়চিত্তে অমৃত পান করার অবাধ সুযোগ পেলেন। কিন্তু এ নিয়ে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে গান্ধীজিও খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। দেশবিভাগ, দাঙ্গা, সহস্র লক্ষ মানুষের চোখের জল, উদ্বাস্তুদের অসহায় মিছিল— সেদিন কিন্তু ক্ষমতালোভী 'সুবা'গুলির কর্ণধারদের মনে সামান্যতম আঁচড়ও কাটেনি। ভারতের শাশ্বত বাণী 'দিবে আর নিবে' যেন এখানে স্তব্ধ হতে চলেছিল। সকলেই নিজের ও তার পরিবারের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য চায় (হরিজন : ২৩।১১।৪৭)।

২৫।১।৪৮ তারিখে গান্ধীজি তাঁর প্রাক্-প্রার্থনার বক্তৃতাতে বললেন ভারতের যে জৈবিক সংহতি প্রক্রিয়া চলছে তার বিরুদ্ধে এই পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত যেন অন্য কোনো বিরোধ না বাধিয়ে ফেলে। কংগ্রেস মূলত ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছে গ্রাম-স্বরাজের মাধ্যমে। (হরিজন : ১।৩।৪৮)। গান্ধীজির জৈবিক সংহতি শব্দগুলি শুনতে খুব ছোটো হলেও এই ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষি সর্বভারতের আত্মাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। ক্ষমতালোভী বর্ণহিন্দুদের সর্ববিষয়ে ক্রমাগত আগ্রাসন ও আক্রমণাত্মক মনোভাবে ক্লিষ্ট এই মহামানবের রক্তাক্ত বলিদানও উন্নাসিক ও স্যাভেনিস্টদের এতটুকু দমাতে পারেনি। ফলে ভারতীয় বিবেক বলে আর কিছু রইল না। এর ফলে আদিবাসী, হরিজন, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানেরা শুধু অসহায় নয় অনাথও হলেন।

কিছুদিন আগে মেদিনীপুরের এক বড়োসড়ো পদাধিকারী বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, 'মাহাতো'রা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন এবং নিজেদের তপশিলি উপজাতি হিসেবে পরিচিত চাইছেন। আদিবাসী কুড়মী সমাজের এবং অ্যাবোরিজিন্যাল কুড়মী পঞ্চ-এর নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তির এবং সাধারণ পরিবারের বহু লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম যে, 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের আন্দোলনের কোনো যোগ নেই। দলমতনির্বিশেষে হাজারে হাজারে শিক্ষিত যুবক সাংবিধানিক ধারাগুলির ভিত্তিতে নিজেদের তপশিলি উপজাতি হিসেবে পরিচিতি চাইছেন। এটা মানবাধিকারের প্রশ্ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন অনুমোদিত 'সর্বভারতীয় দেশজ ও আদিবাসী মহাগোষ্ঠী' তাঁদের আদিবাসী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কুড়মী গোষ্ঠী

ছোটোনাগপুর মালভূমির বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাবর গাদাগাদিভাবে অন্যান্য তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতিগোষ্ঠীর মানুষজনদের সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী জঙ্গল সাফ করে, খেতখামার বানিয়ে, গ্রাম বসিয়ে, গ্রাম্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করে যৌথ সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীল প্রয়াস, নৃত্য ও গীতের জন্ম দিয়ে কংসাবতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা ও বৈতরণী নদীর অববাহিকাতে বসবাস করছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক দলের আগমনের বহু পূর্ব থেকে।

আদিবাসী কুড়মী সমাজ ও অ্যাবোরিজিন্যাল কুড়মী পঞ্চের নেতাদের মতে কুড়মী গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। এই বিশাল গোষ্ঠীর লোকরা শুধুমাত্র ঝাড়খণ্ডী হবেন কেন? তারা সি. পি. আই. (এম) এবং কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের অধিকারী! সংবিধানের বিভিন্ন ধারা মেনে কুড়মীরা আন্দোলন করছেন। বিশেষত পুরুলিয়া জেলার ঝুঁঝকা গ্রামে গত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী কুড়মী মহাসম্মেলন করেছিলেন। তাঁদের মূল দাবি— তাঁদের গোষ্ঠীকে তপশিলিভুক্ত উপজাতি করতে হবে, এই দাবি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর নিশ্চয় খবর রেখেছেন।

১৯১৩ সালের ২ মে সিমলা থেকে প্রকাশিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কুড়মী গোষ্ঠীসহ অন্যান্য কিছু গোষ্ঠী আদিবাসী। সুতরাং সর্ববিষয়ে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। অন্যদিকে, অযোধ্যা পাহাড় ও দলমা পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী 'পাহাড়িয়া' গোষ্ঠী আজও তপশিলিভুক্ত এলাকাতে স্থান না পেয়ে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছেন। সাঁওতাল গোষ্ঠী থেকে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ছিটকে যাওয়া একটি খুবই ছোট্ট অংশ, যাঁরা আজ দেশওয়ালি মাঝি বলে পরিচিত, তাঁরা পুরুলিয়া ও সিংভূম জেলার দেশজ ও মাটির সন্তান। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গোষ্ঠীর বহু মানুষ যেমন কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, দারিদ্র্য ও অভাবের জন্যে সুদীর্ঘ তিরিশ বছরে প্রায় ৫৫ জন মহিলা 'নাচনী' পেশা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে দেশওয়ালী মাঝিদের প্রবীণ নেতা, সমাজসেবী অতুলচন্দ্র মাঝি তাঁর প্যাঁচাড়া গ্রামে বসে আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান যে, তপশিলিভুক্ত উপজাতি তালিকাতে এই গোষ্ঠীর নাম সংযোজনের জন্যে তাঁরা আন্দোলন করছেন।

অন্যদিকে, পুরুলিয়া জেলার 'অঘোরী' নামে একটি যাযাবর গোষ্ঠী যাঁরা লোকের এঁটো-কাঁটা ও ভিক্ষা করে জীবনযাপন করেন, তাঁরা কিন্তু আজও তপশিলি জাতি তালিকাতে স্থান পাননি। তেমনি পাননি বেদে বা যাঁরা সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখিয়ে, ভিক্ষা করে জীবনযাপন করেন তাঁরাও। পশ্চিমবঙ্গের জেলে-কৈবর্তরা

তপশিলি জাতি। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু পুরুলিয়া ও সিংভূমে এই জেলে-কৈবর্তরা 'ঘুন্যা' নামে পরিচিত। সরকারি কাগজপত্র ও প্রাক্তন পঞ্চকোট জমিদারির খাজনার রসিদে তাঁরা 'ঘুন্যা' নামে পরিচিত থাকার জন্যে আর জেলে-কৈবর্ত হতে পারছেন না। ফলে তাঁরা তপশিলিভুক্ত জাতি-গোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গের মূল মেচগোষ্ঠীর কৃষকীকরণের ফলে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের চাপে গোষ্ঠীটি নানাভাবে খণ্ডিত হয়েছে। পরে এই খণ্ড-গোষ্ঠীগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি জাতি-গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের পরিচিতি স্থাপিত করতে পেরেছেন মহাকালের অমোঘ সময়ের নিরিখে। 'মেচ', 'রাভা', 'পোলিয়া', 'দিশি', 'রাজবংশী' গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব এইভাবে। মেচ, রাভা-গোষ্ঠী তপশিলি উপজাতি আর রাজবংশী গোষ্ঠী তপশিলি জাতি তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত। ওড়িশা ময়ূরভঞ্জ জেলাতে দণ্ড-ছত্র-মাঝি গোষ্ঠী থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, সিংভূমের 'প্যাটকার' বা যাদুপের্দা গোষ্ঠীর স্থান তপশিলি জাতি তালিকাতে হয়নি। পশ্চিমবাংলার শুঁড়ি গোষ্ঠী তপশিলি জাতি হলেও বিহার ও ওড়িশাতে তাঁরা তপশিলি জাতি নন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মোদ্দা কথা, রাজ্য সরকারগুলির সুপারিশে এই পরিবর্তনগুলি সম্ভব অথবা লোকসভাতে বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে নূতন তালিকাতে স্থানলাভ সম্ভব। কিন্তু এর জন্যে যে বিশাল জন-আন্দোলন খাড়া করা দরকার, সেটা আজ সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

'পশ্চিমবাংলার উচ্চবর্ণ ও উচ্চজাতির ক্ষমতার উৎস যাঁরা, তাঁরা শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু মুসলমান, ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধদের কোনো সম্মিলিত মহাসংঘ পুরোদমে কাজ করুক, এটা শাসকগোষ্ঠীর মনঃপূত নয়— কারণ সারা ভারতের যা চিত্র, পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম নয়। ৮৫ শতাংশ লোকের উপর ১৫ শতাংশ লোকের এই লড়াইয়ে শিক্ষা, চেতনা ও আন্দোলনই হবে সব চেয়ে বড়ো সহযোগী। কারণ এই লড়াই ভারতের সবচেয়ে তীব্রতম ও জটিল রাষ্ট্রীয় সমস্যা', বলে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চন্দ্রজিৎ যাদব গত ৬।১১।৮৮ তারিখে ভারত সভা হলের ভিড়ে উপচে পড়া অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের মহাসংঘের এক জনসভাতে। তিনি আরও জানান যে, 'স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও আজ আমাদের দেশে মাত্র ১৫ শতাংশ লোক রাজত্ব করছেন। ৮৫ শতাংশ মানুষ আজও অসাম্য, শোষণ, দারিদ্র্য ও অপমানের শিকার। সমাজের পঁচাশি শতাংশ মানুষের স্বাধীনতার অর্থ কেবল ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে অধিকার লাভ। কিন্তু তাঁদেরই

গণতান্ত্রিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাঁদের সামাজিক, আর্থিক উন্নয়ন ও অন্য নীতিগুলির রূপায়ণ ও সেগুলির প্রয়োগের সময় ওই বিশাল জনগোষ্ঠীর কোনো 'হিস্যাদারী' বা অংশগ্রহণ থাকে না। শাসকরা শাসক হিসেবেই অধিষ্ঠিত থাকেন। সাধারণ গণতান্ত্রিক মানুষ তাঁদের 'প্রজা'ই থেকে যান। এর জন্যে প্রায় সমস্ত নীতি-নির্ধারণ এবং কর্মসূচি এমনভাবে নেওয়া হয়, অথবা এমন বৈপ্লবিক স্লোগান দেওয়া হয়, অথবা মানুষের সার্বিক আন্দোলনের দোহাই দিয়ে করা হলেও সেই পনেরো শতাংশ মানুষের সুবিধাই হয়। আনুমানিক তিন হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর এই অমোঘ নিয়ম চেপে বসেছে। এই ব্যবস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাচারী, জঘন্য, বর্বর ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাতে যাকে বলা হয় 'বর্ণ-ব্যবস্থা'।

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই অতি দুঃখের সঙ্গে (দেশ : ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪) তাঁর 'ভারতের গণতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন— 'ভারতের মতো বহুধা বিভক্ত সমাজে গণতন্ত্রের কতকগুলি মৌলিক সামাজিক আঙ্গিকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিশেষত জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুসংস্কার এদেশের মানুষের অস্থিমজ্জায় বাসা বেঁধেছে, আর সমাজকে উচ্চ-নীচ স্তরে বহুধা বিভক্ত করেছে। কিন্তু মানুষের জন্মগত সাম্য যে দেশ স্বীকার করে না, সে দেশে রাজনৈতিক ও আর্থিক সাম্যের স্থান কোথায়? গণতন্ত্রের বনিয়াদকে এদেশে মজবুত করে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জাতিভেদের আশু বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে জড়িত মানসিক প্রবৃত্তি ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন। অনুরূপভাবে ধর্মভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করে মানবতার উপর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু জাতিভেদ ও সঙ্কীর্ণ ধর্মপ্রবণতা বিরোধী গণতন্ত্র আজও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কংগ্রেস দল গত ৩০ বৎসরে এ ব্যাপারে যত্নশীল হননি। আর বামপন্থী দলগুলিও আজ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেননি যে এদেশে শ্রেণিভেদ জাতিভেদের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে শ্রেণিসংগ্রামের স্লোগান দেওয়া শুধুমাত্র ভ্রান্ত চেতনার ফল।' জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছিলেন, 'যেখানে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আছেন সেখানেই সুনিশ্চিতভাবে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের দু-মুখো ভাষানুসারে একেই তাঁরা বলে থাকেন জনগণতন্ত্র, এমনকী সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। ওইসব ঘটনার দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, কোনো প্রকার একনায়কত্বের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্রে পৌঁছান যায় না।' (অনুবাদ : সজল বসু)

...আসলে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির কল্পনা সমগ্র সমাজের পরিবর্তন। সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে, ব্যক্তির জীবনে, সামাজিক সংগঠনগুলির চাল-চলন, কাজকর্ম, রীতিনীতি

সব কিছুতেই যেন পরিবর্তন আসে। সম্পূর্ণ ক্রান্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা বা নিজের হাতে ক্ষমতা নেবার কোনো ব্যাপার নেই। এর লক্ষ্য ব্যবস্থা-পরিবর্তন, পদ্ধতি-পরিবর্তন এবং সমসমাজ গঠন। সম্পূর্ণ-ক্রান্তি জনতার ক্রান্তি। এই ক্রান্তির রণাঙ্গন কেবল রাজধানীগুলিতে সীমিত নেই। এর রণভূমি গ্রামে-গ্রামে ও শহরগুলিতে বিস্তৃত, প্রত্যেক কার্যালয়, বিদ্যালয় এবং কারখানায় এর পরিধি রয়েছে, এমনকী প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে। এইসব ক্ষেত্রেই আমাদের সম্পূর্ণ ক্রান্তির সংগ্রাম করতে হবে। যেখানেই লোক একে অপরের সঙ্গে বাস করে, কাজ করে যেখানেই পারস্পরিক সম্পর্ক রচিত হয়, সেইসব স্থানই এই সংগ্রামের রণাঙ্গন। আবার প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরেও এই রণভূমি, কেননা আমাদের তো জীর্ণ-পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে। এই হল সম্পূর্ণ-ক্রান্তি।... যতক্ষণ না যৌতুক, 'হুণ্ডা', 'বাঁকড়ো' 'পৈঠন' (মরাঠি ও গুজরাটি ভাষায় যৌতুক), অস্পৃশ্যতা, উচ্চনীচ ভেদাভেদ প্রভৃতি অবসান হচ্ছে এবং যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি যে, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা উপরে উঠতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা না পারব সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে, না পারব দুর্নীতি দূর করতে।' (অনুবাদ : ৬ : সজল বসু)

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল ও হরেকৃষ্ণ কোঙার লিখিত 'যুক্তফ্রন্ট সরকার ও ভূমিসংস্কার' পুস্তকের 'স্মরণ করি' শীর্ষকে লিখেছেন 'কর্তৃপক্ষের এই অক্ষমতা ও অনীহার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমি স্বার্থের রক্ষকদের ধর্মের তত্ত্ব ও কুসংস্কার এবং রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাব। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা চেষ্টা করে এই অসংখ্য বঞ্চিত, দলিত ও নির্যাতিত মানুষকে তাদের দীর্ঘকালের মানসিক জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা ও কুসংস্কারের মধ্যে ফেলে রাখতে। সেইজন্য অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরবাদের হেঁয়ালিরও আশ্রয় নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য— কিছুতেই এই বিরাট সুপ্ত জনশক্তিকে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে না দেওয়া, তাদের আত্মসচেতন ও সক্রিয় হয়ে সামাজিক দমনপীড়ন প্রতিরোধ করার পথ আটক করা।

এই প্রতিক্রিয়াশীল মানবতা বিরোধী শক্তির শয়তানি বাধা দূর করার জন্য, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন এই বঞ্চিত সমাজকে একদিকে তার মনুষ্যত্ব-বোধ সম্বন্ধে, অন্যদিকে তার শ্রেণিস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে শ্রেণিসংগ্রামের পথে এনে দাঁড় করানো।'

শ্রীযতীন বাগচী লিখেছেন, 'অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কায়স্থরা 'সৎশূদ্র' বলে বিবেচিত হলেও হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। আধুনিক যুগে অর্থাৎ মেকলে এবং রামমোহনের যুগের শুরুতেই বাঙালি হিন্দুসমাজে এই

শ্রেণিস্তরের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ দেখা দেয়। বৈদ্য এবং কায়স্থদের পরের স্থান 'নবশাখ'দের অর্থাৎ গোপ, মালী, তাম্বুলী, শঙ্খকার, কংসকার, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় ও নাপিত— এই নয়টি জাতি 'জলচল'। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাতি-মর্যাদা উন্নত করার আন্দোলন করে তিলি, বারুজীবী (বারুই), গন্ধবণিক এবং মোদক (ময়রা) 'নবশাখ' পর্যায়ে চলে আসেন। গোপ জাতীয় লোকেরা পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন।

নবশাখদের নিচে যাঁদের স্থান তাঁরা হলেন সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র, যোগী, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, চাষা, সাহা, শুঁড়ি, তেলি, কলু, ধোপা প্রভৃতি। সমাজের সর্বনিম্নস্তরে বাগদি, চাঁড়াল, চামার, মুড়ি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা।... ভেদাভেদের প্রাচীর প্রত্যেক শ্রেণির স্তর উপস্তরের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জাতি, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি অনুসরণের ফলে দারিদ্র্য যেমন জন্মলগ্ন থেকে কবচকুণ্ডলের মতো— ঘৃণ্য, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা, তেমনি অসহনীয় হলেও আমরণ তা মেনে নিতে হত।' শ্রীবাগচী ঐতিহাসিক ড. সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোর-খুলনার ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'কায়স্থ ও বৈদ্যের বিকট মনোমালিন্য— বৈদ্যপক্ষে বৈদিকশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং কায়স্থ পক্ষে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তিনি আমাদের আরও জানিয়েছেন যে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের মনোমালিন্য নিষ্পত্তির জন্য ১৯৩৩ সালে বৈদ্যগণ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জির দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং পরে মহামান্য বিচারপতি এবং ব্রাহ্মণ সভা সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, বৈদ্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ সম্বন্ধাদি চলবে— অসবর্ণ হবে না।'

বঙ্গের বাংলাভাষী উচ্চজাতি বর্ণগোষ্ঠীর মানুষেরা সেদিন নিজেদের প্রয়োজনেই 'নবশাখ' বা জলচল নাম দিয়ে বিভিন্ন নিম্ন জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠীর সঙ্গে এক সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। কারণ ব্রাহ্মণ্য মৌলবাদীদের গোঁড়ামি ও আচার-আচরণে বাধ্য হয়ে অথবা সমাজপতিত হয়ে বহু অন্তঃজ গোষ্ঠীর মানুষ ইসলাম ধর্মে ও পরে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষরা তাই বিভিন্ন সময়ে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই বিশেষ বিশেষ ছাড়ের বা কনসেশনের ব্যবস্থা করতেন।

১৯০০ সাল থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দ্রুতগতিতে মুসলমান ও বর্ণ-হিন্দু পোলারাইজেশন দেখা দিলে মৌলবাদী হিন্দু সামন্ত-জমিদার ও পণ্ডিত, প্রশাসনিক বুদ্ধিজীবীরা অতি দ্রুতগতিতে নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে একটা অলিখিত আপসরফা করে ফেলেন,

স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে। এর ফলে 'ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থসমূহ' তৈরি হয় বাংলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন 'ব্রাহ্ম' ধর্মের মানুষেরা। এইভাবে বর্ণহিন্দুদের 'ক্ষমতার উৎস' মজবুত হয়।

পরমেশ আচার্য লিখেছেন— 'বিশ শতকের গোড়ায়, শিক্ষায় পেছিয়ে থাকা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা যখন আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠতে লাগল তখন তারা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে হিন্দুর একাধিপত্যকে নিজেদের শিক্ষার পথে এক বাধা হিসাবে গণ্য করল। অন্যদিকে প্যান-ইসলামে আশ্রয় খোঁজার প্রবণতায় ভাষাশিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার জটিল আবর্তে হাবুডুবু খেতে লাগল... এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানেরা শিক্ষাসমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য বাংলা সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি নীতিগতভাবে মুসলমানের জন্য কোনো আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা অনুমোদন করে না। তবে বর্তমান ব্যবস্থায় মুসলমানের শিক্ষার বাধাগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধানের জন্য কিছু সুপারিশ করে। প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে আছে উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও সরকারি অনুদানের অন্যতম শর্ত হয়ে পরিচালন সমিতিতে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি থাকা। অধিক সংখ্যক মুসলমান প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা। সরকারি বিদ্যালয়ে শতকরা পনের ভাগ আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখা'— ইত্যাদি। শ্রীআচার্য আরও লিখেছেন যে— '১৯১৭-১৯ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার সমস্যাটি বিবেচনা করে। কমিশনের কাছে মুসলমান প্রতিনিধিরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানায়—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সংস্কৃতানুগ বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে তা মুসলমানের পক্ষে শেখা কঠিন।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক মুসলমান শিক্ষার অনুকূল নয়, কেন না এগুলি হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যে ভরা। এমনকি এইসব বইয়ে এমন সব লেখা আছে যা মুসলমান মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এলফিনটনের 'হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া' এমনি একটি বই।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখার প্রথা মুসলমান পরীক্ষার্থীর ভালো ফল করার অন্তরায়। ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে হিন্দু-পরীক্ষক মুসলমান পরীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করে না বা পক্ষপাতিত্বহীন হতে পারেন না।

(ঘ) ১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত মোট ৮৯৫ জন পরীক্ষকের মধ্যে উর্দু, আরবি ও পারসি পরীক্ষক বাদে মাত্র নয়জন মুসলমান।'

শ্রীআচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালীন উপাচার্য আজিজুল হকের একটি 'নোট' যা তিনি শিক্ষাসমস্যা বিষয়ে কামাল ইয়ং জং শিক্ষা কমিটির কাছে দাখিল করেছিলেন, তারও উল্লেখ করেছেন। আজিজুল হকের নোটে বলা হয়েছিল যে, 'এই অবস্থায় দুটি মাত্র পথই খোলা আছে— হয় এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পক্ষপাতহীনভাবে স্থান পাবে, নয় দুই সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা শিক্ষার ভিত্তিতে সম্মিলিত (federation) ব্যবস্থা।' তিনি অবশ্য 'কায়মনোবাক্যে আশা করেন, শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং সকলের জন্য একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ভাববিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রীতির সম্পর্ক বিরাজ করবে।'

মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়ে উচ্চবর্ণ ও জাতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাঙালি জাতিসত্তার ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী আরও একবার নিম্নবর্ণ ও অচ্ছুৎদের সঙ্গে আপসরফা করার জন্য সক্রিয়ভাবে বেরিয়ে পড়ল মাঠে-ময়দানে। সংস্কারমূলক নিদানসহ উত্তরীয় ধারণের ছাড়পত্র তথা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়ে অবদমিত জাতি-গোষ্ঠীর মাতব্বরদের মধ্যে জাতি-গর্বের নানা সত্য-মিথ্যা, অলীক তথ্য, প্রয়োজনে সংস্কৃত শ্লোক সৃষ্টি করে হিন্দুর নবজাগরণ ঘটাতে লাগলেন। এই কাজে এগিয়ে এলেন শক্তিশালী গুরুদেব, ঠাকুর ও কুলপুরোহিতরা। আর সভা-সমিতির কাজে এগিয়ে এলেন আর্য-সমাজের দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও হিন্দু মিশনের দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী। এর ফলে ১৯৩১ সালের লোকগণনাতে বহু আদিবাসী ধর্মীয় গোষ্ঠীকে হিন্দু বলে দেখানো হল এবং মুসলমান সংখ্যাধিক্যকে খুব কায়দা করে চ্যালেঞ্জ জানানো হল। সুবোধ ঘোষ লিখেছেন— '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধান অনুসারে পৃথক নির্বাচন প্রথার দ্বারা আদিবাসীদের জন্য আইনসভায় কতকগুলি আসন সংরক্ষিত (রিজার্ভড) হয়েছে। এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা মোট ২৪টি। যথা—

প্রদেশ	আদিবাসীদের সংরক্ষিত আসন
১। আসাম	৯
২। বিহার	৭
৩। উড়িষ্যা	৫
৪। বোম্বাই	১
৫। মাদ্রাজ	১
৬। মধ্যপ্রদেশ	১
মোট	২৪

'বাংলা প্রদেশে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন একটিও নেই, যদিও বাংলায় আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষের ওপর। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার কথা না বলাই ভালো, সেখানে সাধারণ শিক্ষিত প্রজা-সমাজের প্রতিনিধিত্ব যা আছে তা না থাকারই মতো, আদিবাসীদের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।'

"এ প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব সম্পর্কে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগ করার মতো সঙ্গত কারণ আছে। আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে জাতীয়তাবাদীরা বলতে গেলে কোনো আন্দোলনই করেননি, যেমন হরিজনদের দাবির সম্পর্কে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় হরিজনদের সংখ্যার সমান, কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আইনসভায় আদিবাসীদের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত এবং হরিজনদের বেলায় কুড়িটি আসন সংরক্ষিত। উড়িষ্যাতে যদিও আদিবাসীদের জন্য পাঁচটি আসন সংরক্ষিত কিন্তু এর মধ্যে চারটি আসনের প্রতিনিধি স্বয়ং গবর্নমেন্ট মনোনীত (নমিনেট) করেন। আইনসভায় মনোনয়নের ব্যাপার কোনো প্রদেশেই নেই এবং কোনো সম্প্রদায়ের জন্যই নেই, মাত্র আদিবাসীদের বেলায় উড়িষ্যায় এই বিচিত্র গণতন্ত্র বিরোধী ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে।' দেশ বিভাজনের পর উচ্চ জাতি-বর্ণের দম্ভ দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে তাঁরা নূতন কলেবর নিয়ে সামনে উঠে এলেন। এবার তাঁদের হাতিয়ার মধ্যবিত্ত মানসিকতা, বৈপ্লবিক স্লোগানসর্বস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি। অন্যদিকে আরও একবার তাঁরা সমঝোতার হাত বাড়ালেন পূর্ববঙ্গীয় সাহা, শুঁড়ি, বেনে ইত্যাদি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে। ওই সমস্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উচ্চবর্ণের মানুষেরা করুন না কেন, অর্থকরী বিদ্যা, ব্যবসায়িক কুশলতা ও দক্ষতাতে তাঁরা কলকাতার অবাঙালি ব্যবসাদারদের তুলনাতে মেধা ও বুদ্ধিতে কম নন।

'আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণে জীবনধারা আরো ভোগপ্রবণ ও আরামপ্রদ করে তুলতে সবাই ব্যগ্র। মুদ্রাস্ফীতির সব দেশেই এই রোগের প্রকোপ। নব নব ভোগোপকরণ ও সামগ্রী অভ্যাস এমন সংক্রামক ও আকাঙ্ক্ষা বিস্ফোরণকারী যে মুদ্রাস্ফীতির আক্রমণ সত্ত্বেও যেনতেন প্রকারে পার্থিব জীবনমান উন্নয়নে সবাই উৎসুক' বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিজ্ঞানী সজল বসু। তাই আমরা দেখতে পেলাম বিত্তশালী 'সাহা' ও বেনে গোষ্ঠীকে ক্ষমতার উৎসকেন্দ্রে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে আনা হল। রক্ষণশীলতার আবরণ খুলে নারী-বিনিময়ের মাধ্যমে একটা সমঝোতা-চেষ্টা হলেও কুলীন সাহাদের বৈভব ও স্পর্শকাতরতা আজও যেমন অম্লান আছে, তেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাবানদের উন্নাসিকতাতে

এতটুকু চিড় ধরেনি। পশ্চিমবাংলাতে ক্রমাগত বামপন্থী আন্দোলনের জন্য 'জাতিভেদ'জনিত কোনো সমস্যা নেই বলে যাঁরা প্রচার চালান তাঁরা জানেন যে, এই স্লোগানটিও আপসরফা করার এক সাফল্যজনক স্ট্র্যাটেজি।

তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু শ্রেণির সুযোগ সুবিধার জন্য ভারতীয় সংবিধানে যা নির্ধারিত হয়েছে, তা হাজার হাজার বছর ধরে নির্যাতিত মানুষের মুক্তির রক্ষাকবচ। তাই সংরক্ষণের প্রশ্নটি মানবাধিকারের প্রশ্ন, এটা শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার নয় বলে দাবি করেছেন তপশিলি জাতি মহাসংঘের অন্যতম নেতা গোপাল বিশ্বাস। ভারতের দলিতদের জন্য বি. বি. আর. আম্বেদকর, রামস্বামী পেরিয়ারদের ছিনিয়ে আনা এই মানবাধিকার দেশের মধ্যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার বলিষ্ঠতম হাতিয়ার। কিছুদিন আগে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির যুগ্ম প্রবেশাধিকার পরীক্ষাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্যে উক্ত পরীক্ষাগুলিতে যথোপযুক্ত নম্বর না পেলেও বিশেষ ছাড় বাবদ ওই সমস্ত কলেজে ভর্তির সুযোগ করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বস্তুত এই ঘোষণাতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সংবাদপত্র মারফত। তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষরা অবাক বিস্ময়ে সরকারের এই মোক্ষম পরিহাস হজম করেছিলেন অসহায়ভাবে। সাধারণ জনসমাজে তারা পরিণত হয়েছিলেন উপহাসের বস্তু। অন্যদিকে মেধার ভিত্তিতে যে-সমস্ত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষাতে পাস করেন তাঁদেরও সেই শতকরা ২২ ভাগের সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, যাতে উচ্চবর্ণ ও জাতির 'মেধাবী' ছেলেমেয়েরা অনায়াসে জায়গা পান। এ ছাড়া মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত 'কোটা'তে যখন শক্তিশালী কোনো আমলা বা রাজনৈতিক নেতাদের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হন তখন কেউ প্রশ্ন তোলেন না। অন্যদিকে, বহু পরীক্ষার্থী জাল প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে ভর্তি হন বলে তপশিলি উপজাতি ও তপশিলি জাতির ছাত্রনেতারা গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

এ কথা নিঃসংশয়ে আমরা বলতে পারি যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ এবং সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে যে সাংবিধানিক সুরক্ষা না পেলে তাঁদের বর্তমানে যা অগ্রগতি হয়েছে তাও করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস তা

সহজেই অনুমান করা যায় যখন কোনো চাকরির বিজ্ঞাপনে থাকে "পদগুলি তপশিলিজাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত, কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থী না পেলে পদগুলি অসংরক্ষিত ঘোষণা করা হবে" ইত্যাদি। বিমান সেবিকাদের জন্য যদি তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের যোগ্যতার মানদণ্ডের মধ্যে থাকে যে প্রার্থীকে অবশ্যই সুন্দরী, ফর্সা, তন্বী, স্মার্ট হতে হবে তার উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী-কন্যারা ছাড়া অন্য কেউই দরখাস্তই করতে পারবেন না। কারণ মধ্য ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী কন্যারা সুন্দরী, তন্বী, স্মার্ট হলেও কৃষ্ণ ও শ্যামল বর্ণা।

সাংবাদিক ভি. টি. রাজশেখর শেট্টি তাঁর 'ক্লাস-কাস্ট-স্ট্রাগল' পুস্তিকাতে জাতিবৈষম্যের দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। গোলওয়ালকর এই ঘটনাটি লালা হরদয়ালের কাছ থেকে শুনেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে একজন ইংরেজ অফিসার ছিলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন সম্ভবত কোনো নাইডু। ইংরেজ অফিসারটির আদালি ছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ। একদিন ওই ইংরেজ ভদ্রলাক যখন আর্দালিকে পিছনে রেখে রাজপথে হাঁটছিলেন তখন তাঁর সহকারী উল্টোমুখে আসছিলেন। দুজন অফিসারই পরস্পরকে অভিবাদন জানালেন এবং করমর্দন করলেন। কিন্তু আর্দালির সঙ্গে সহকারীর সাক্ষাৎ হবার পর, তিনি তাঁর মাথার পাগড়ি খুলে, আর্দালির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। ইংরেজ সাহেব বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার বড়ো অফিসার তুমি শুধুমাত্র আমাকে অভিবাদন এবং করমর্দন করলে কিন্তু তুমি তো এই ব্যস্ত রাজপথে আমার সঙ্গে ওইরূপ ব্যবহার করলে না। সহকারী জবাব দিল, "আপনি আমার থেকে বড়ো অফিসার, এটা ঠিক, কিন্তু আপনি একজন ম্লেচ্ছ। আর তিনি একজন পিওন হলেও আমাদের জনসমাজের মধ্যে শতাব্দী ধরে পূজিত, খুবই সম্মাননীয় শ্রেণির মানুষ। তাঁকে নতজানু হয়ে সম্মান জানানো আমার কর্তব্য।" ভারতের এককালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী জগজীবন রাম শ্রেণি ও বর্ণের বৈপরীত্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। কারণ তিনি একবার বলেছিলেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে তাঁর সময় লাগবে এক হাজার বছর।

আদিবাসী বিবাহ : বৈচিত্র্য ও জীবনদর্শন

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসককুল ভারতের বিভিন্ন কৌম বা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজকে 'ট্রাইব্যাল' তকমা পরিয়ে ছিলেন নিজেদের স্বার্থেই। 'অ্যাবোরিজিন্যাল' বা 'ট্রাইব্যাল' শব্দগুলি মারফত বিশেষ বিশেষ এলাকার বিভিন্ন কৌমের বা 'কবিলার' মানুষজনকে বিশেষ বিশেষ ছাড় দেবার জন্যে একটি প্রশাসনিক ও আইনানুগত পন্থা বের করেছিলেন নানা ধর্মীয়-রাজনৈতিক ও বিদ্রোহের টানাপোড়েনে। 'অ্যাবোরিজিন্যাল' বা 'ট্রাইব্যাল' শব্দের বাংলা 'আদিবাসী' শব্দটি আজ সর্বগ্রাহ্য। ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হবার পর ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের (নেশন-স্টেট) প্রশাসনিক ও আইনানুগ পদ্ধতিতে আদিবাসী শব্দটির অর্থ দাঁড়াল তালিকাভুক্ত উপজাতি। ভারতীয় সংবিধানের ২৪১ ও ৩৪২ ধারা অনুসারে যাঁরা রষ্ট্রপতির বিশেষাদেশে তপশিলভুক্ত তাঁরাই তপশিলি উপজাতি।

এর ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইংরেজ আমলেও যাঁরা 'অ্যাবোরিজিন্যাল' হিসেবে চিহ্নিত বা তালিকাভুক্ত ছিলেন এমন বহু আদিবাসী/মূলবাসী গোষ্ঠী শুধুমাত্র রাজনৈতিক-সামাজিক কারণেই প্রশাসনিক ও আইনানুগ রক্ষাকবচ থেকে বাদ পড়লেন। আবার এমন দেখা গেল যে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশাতে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওরাঁও প্রভৃতি গোষ্ঠী তপশিলি ভুক্ত উপজাতি হলেও অসমে যাঁরা তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত নন। বিহার ও ওড়িশাতে 'বাথুডি' গোষ্ঠী উপজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা উপজাতি তালিকাতে স্থান পাননি। কুড়মি কৌমের মানুষ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে কুড়মি গোষ্ঠীর ও বেদিয়া উপগোষ্ঠী তপশিলি উপজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত।

আবার কোনো গোষ্ঠীর মানুষ একই প্রদেশে কয়েকটি জেলাতে তপশিলি জাতি, অন্যস্থানে তপশিলি উপজাতি। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবাংলাতে ছিল আট-দশটি গোষ্ঠী তপশিলি উপজাতি, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭টিতে। সুতরাং আমাদের আলোচনার স্বার্থে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে যাঁরা তালিকাভুক্ত এবং যাঁরা তালিকাভুক্ত নন, তাঁদের সকলের কথাই আদিবাসী হিসেবে আলোচিত হবে। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের পুরোধা গবেষক ও অধ্যাপকরা, বিশেষত অধ্যাপক সুরজিৎচন্দ্র সিংহ

আদিবাসী জাতি (বর্ণ-হিন্দু গোষ্ঠী ভেদে) ও আদিবাসী-কৃষক প্রবাহের কথা উল্লেখ করে ভারতীয় সমাজের মূল লেনদেন প্রক্রিয়ার ভাবাদর্শ ও জীবনবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে নৃ-বিজ্ঞানীরা আদিবাসীদের একটি সামাজিক প্রকারভেদে ফেলে বিচার করেছেন। কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞাদানে তাঁরা শুধুমাত্র বিরতই থাকেন নি, সরকারিভাবে স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা দেবার কথা তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। নৃ-বিজ্ঞানীদের একটি বৃহৎ অংশ জাতিপুঞ্জের 'আদিবাসী' সংজ্ঞাটিকে পৃথিবীব্যাপী মেনে নিয়েছেন, তাই আমিও 'আদিবাসী' কথাটিকে ওই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করব।

বিবাহে সংস্কৃতি ও তত্ত্ব

মানুষের জীবনে ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে সমাজ/গোষ্ঠী বা কৌম কর্তৃক স্বীকৃত নারী-পুরুষদের বৈধ যৌনমিলন, সন্তান উৎপাদন, তাদের সামাজিকীকরণ, গোষ্ঠী রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান মেনে স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্র বসবাস করার জন্যে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছাড়পত্র দেয় তাকে বিবাহ বলে। বিবাহ সর্বজনীন। নারী-পুরুষের যৌনমিলনের ক্ষেত্রে 'নিষিদ্ধতা' আরোপ করা হয়েছে মাতা ও পুত্রের, কন্যা ও পিতার, ভাই ও বোনের মধ্যে। এ ছাড়াও বিভিন্ন নিকট আত্মীয় ও স্বজনের সঙ্গে যৌনমিলনের নিষিদ্ধতা রয়েছে। গোষ্ঠী-ইতিহাসের ছাত্ররা স্বীকার করেন যে, প্রাচীন ইজিপ্ট, পেরু প্রভৃতি দেশে 'নিষিদ্ধ গমন' শিথিল ছিল। সেখানে ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহের ফলে সন্তানের জন্মদান করার সুযোগ দেওয়া হতো রাজপরিবার এবং সামন্ত ও সর্দার পরিবারগুলিতে।

এই 'নিষিদ্ধ-গমন' সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানীদের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা যেমন আছে তেমনি আছে জৈব-শারীরিক ব্যাখ্যাও। অধ্যাপক ওয়েস্টারমার্ক বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'এক বা একাধিক পুরুষ যখন এক বা একাধিক নারীর সঙ্গে যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হবার পর সন্তান উৎপাদন, তাদের ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব নেন, একই সঙ্গে বসবাস করার জন্যে, পারস্পরিক কর্মবিভাজন মেনে সমানুপাতিক ভালোবাসার শৃঙ্খলাতে আবদ্ধ হন তখন তাকে বিবাহ বলে।' ওয়েস্টারমার্ক আরও বলেছেন যে, মানবসমাজে বিবাহের ইতিহাস মূলত পুরুষের স্বার্থপুষ্ট যৌনকামনা ও জৈবিক উত্তেজনা চরিতার্থের বিরুদ্ধে নারীজাতির বিজয় ঘোষণা করেছে। তাই মানবসমাজের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে 'বিবাহ' প্রতিষ্ঠানটির আবির্ভাব একটি স্মরণীয় নিশান। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ. ও নারীর ভবঘুরে মানসিকতার লাগামকে সামলে ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রবণতাকে উষ্ণ ও সজীব করেছে। স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের মনের কাছাকাছি

এনে এক যৌথ চিন্তাভাবনার জন্ম দিয়ে পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াসে পুরুষ যেমন সক্রিয় হন, তেমনি নারীও সংসারকে সচ্ছল, সুন্দর, মনোরম ও লোভনীয় করার জন্যে তাঁর পরম্পরাগত সৌন্দর্য চেতনার পরশে অপরূপ গৃহকোণ প্রস্তুত করেন।

বিবর্তনবাদী সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুসারে বিবাহের প্রাথমিক পর্যায়ে নারী-বিনিময় ছিল এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যতার সূত্র খোঁজার অন্যতম হাতিয়ার। অধ্যাপক লেভিস্ট্রোস এই মতবাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। যোটক/জোড় বা বিবাহের জন্যে নারী ও পুরুষ খোঁজার মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও কৌমে বিভিন্ন ধারণা ছড়িয়ে আছে। ভারতের মতো সুবিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে একটি কন্যা সন্তানের জন্মের পরেই বিশ্বাস করা হয় যে তার ভাবী 'গোকুলে বাড়ছে'। অস্ট্রিলিয়ার 'টিউয়ি' গোষ্ঠীর মানুষরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের কোনো নারী অবিবাহিত থাকতে পারে না। বহু পত্নীর সঙ্গে বসবাসকারী একজন 'টিউয়ি' স্বামীর নবপরিণীতা স্ত্রীর বয়সের ফারাক ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর। স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ করার সামাজিক রীতি সেখানে চালু আছে। ত্রিপুরার 'হালাম' সংযুক্ত গোষ্ঠীর কলই, কাইপেং, বংচের, মলশম প্রভৃতি উপগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহেচ্ছু যুবককে তাঁর হবু শ্বশুরবাড়িতে 'চামরুই' (ঘরজামাই) থাকতে হয় তিন থেকে পাঁচ বছর। ওই সময় সেই যুবক ঘরগৃহস্থালির কাজ, রান্না করা, ঝুম খেতে কাজ করা ছাড়াও শ্বশুর-শাশুড়ি ও গুরুজন আত্মীয়দের সেবা ও হবু স্ত্রীর মনোরঞ্জন করে। ওড়িশার 'বোন্ডা'দের মধ্যে এম হক দেখিয়েছেন যে, দশ-বারো বছরের বালকের সঙ্গে ১৮/২০ বছরের যুবতী নারীর বিবাহ প্রচলিত। তাঁদের বিশ্বাস স্ত্রীরা বৃদ্ধা হলে জওয়ান স্বামী তাঁদের ভরণপোষণ করবে। বিবাহ সম্বন্ধে তাই বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র জৈবমনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা পূরণ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুস্থ-সাংস্কৃতিক মনস্কতা ও সাংস্কৃতিক স্বাক্ষরতার অসাধারণ নজির। "পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার জন্যে নিজের মা ছাড়া অন্যান্য সৎ-মায়েদের বিবাহ করতে হয় 'সেমা' নাগা গোষ্ঠীর যুবককে। কারণ মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর মায়েরা। সুতরাং যৌন-তাড়নার বশবর্তী হয়ে নয়, সম্পত্তি যাতে হস্তান্তরিত না হয় তার জন্য 'সেমা' নাগা গোষ্ঠীতে এই প্রথা আজও থেকে গেছে। এটা তাঁদের পরম্পরাগত বিধান", বলে মন্তব্য করেছেন ডি এন মজুমদার ও টি এন মদন।

অধ্যাপক র‍্যাল্ফ, এল বিলস, হ্যারি হোয়াইজার ও অ্যালেন, আর বিলস পলিনেশিয়ার 'সামুয়া' গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ করেছেন যে, ওই সমাজের যুবক-যুবতীরা

অবাধে সমুদ্র উপকূলের নারিকেল গাছের ছায়াতে পছন্দমতো জুটি বেঁধে মেলামেশা করছেন। যৌন-সঙ্গ করলেও যে তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন এমন কোনো স্থিরতা নেই। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 'ক্যারেন' উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রবণতা দেখেছেন নৃ-বিজ্ঞানী ভগবান রায়। কোনো যুবক বিবাহের সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর পরিচিত ও পছন্দমতো প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলেই, যুবতীর বাড়িতে উপঢৌকন, খাদ্য ও পানীয় নিয়ে হাজির হন বিবাহপ্রার্থী হিসেবে। উপঢৌকন গ্রহণ করে বিবাহে রাজি হন পরিবারের সদস্যরা।

পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া দেশের 'মাসাই' গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ পূর্বেই বহু নারীর সঙ্গে একজন যুবকের সংস্রব ঘটে। পাশাপাশি গ্রামের কোনো মাসাই যোদ্ধার 'ক্রাল'-এ থাকার জন্যে 'মাসাই' তরুণ ও যুবকরা নিজেদের বাড়ি ছাড়েন। এই 'ক্রাল'-এ থাকতে থাকতে তাঁরা সমর্থ ও বৃদ্ধদের কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শেখেন। দশ-বারো বছর এইভাবে কাটিয়ে তারা পাশাপাশি গ্রাম থেকে অপহরণ করা গরু-গাভী নিজ নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন সুরক্ষার জন্যে। ওই সময় তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু 'ক্রাল'-এ থাকতে থাকতে বহু অবিবাহিত যুবতীর সঙ্গে তাঁদের যৌন-সংসর্গ ঘটে। কারণ ওই যুবতীরা 'ক্রাল'-এ বসবাসকারী যোদ্ধাদের প্রেমিকার ভূমিকা পালন করে। কোনো নারী গর্ভবতী হলে সে তার নিজ গ্রামে ফিরে আসে এবং তার বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। গর্ভধারণ তার বিবাহের পক্ষে সহায়ক ও অভিনন্দনযোগ্য। পিতৃত্বের পরিচয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মধ্যপ্রদেশের 'মারিয়া' আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে 'ঘোটুল' নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে। 'ঘোটুল'-এ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের পছন্দমতো প্রেমিক বা প্রেমিকা বেছে বিবাহ পূর্বোত্তর জীবন কাটান। ওরাঁও গোষ্ঠীর মধ্যে 'ধুম ঘুড়িয়া' নামক অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অবশেষ এখনও আছে। ছোটনাগপুর মালভূমি, সাঁওতাল পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের সাঁওতাল, কুড়মি, ভূমিজ ইত্যাদি গোষ্ঠীর মধ্যে বাৎসরিক 'দেশ শিকার' বা 'দিশূম সেঁন্দরা'-নামে একটি উৎসব পালিত হয়। বৈশাখের বুদ্ধ পূর্ণিমাতে, পুরুলিয়া জেলার 'অযোধিয়া বুরু' বা অযোধ্যা পাহাড়ে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে যোগদান করে না ফিরলে ওই সমস্ত গোষ্ঠীর যুবতীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর কিশোর ও যুবকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে মনে করেন। কারণ ওই উৎসবে অংশগ্রহণকালে 'রেগড়া টামাক'-এর বাজনার তালে 'বীরসেরেঞ' বা উধয়া, কবি ঝুমুরের সুরে নানা যৌন-গল্প ও যৌন-গানের মাধ্যমে নারীদেহের গোপন অংশগুলি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হন। যদিও ওই উৎসবে নারীর যোগদান নিষিদ্ধ। ত্রিপুরার হালাম সংযুক্ত গোষ্ঠীর বংচের উপশাখার 'নুয়াকথাংওয়াল রিদি'

হল একটি প্রেম ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান। সন্ধ্যা রাত্রিতে যুবকেরা দলবদ্ধভাবে 'চংপ্রেন' নামে দু-তারের যন্ত্রে বোল তোলেন 'জাখনা কুং কুং জাখুন কুং' অর্থাৎ আমি বা আমরা আসছি ; তুমি তৈরি হও। মেয়েরা সুতো কাটার 'পাটখের' বা রুমুই মারফত উত্তর দেয় 'হংরহ, হংরহ হংরহ' অর্থাৎ আমি প্রস্তুত।

খাদ্য আহরণকারী দক্ষিণ ভারতের 'কাদার' গোষ্ঠী, মধ্যপ্রদেশের ও বিহারের 'কোরোওয়া', অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের 'সোলিগা' 'জেনু-কুরুবা' প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষজন বাঁচার জন্যেই বিবাহ করেন। আদিবাসী কৃষক ও কারিগর গোষ্ঠীগুলি তাঁদের চারপাশের ব্রাহ্মণ্য হিদুসমাজের দেখাদেখি বাল্যবিবাহ প্রচলন করেছিলেন। জন্ম সুবাদে জাতি-বর্ণ ও উঁচু-নিচু ভেদাভেদে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজে একটু সম্মাননীয় স্থান লাভ করার জন্যে তারা বাল্যবিবাহকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। পুরুলিয়া, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জে মঘয়া কুমোরদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। দক্ষিণ ভারতের 'নায়ার', 'লিঙ্গায়েৎ' প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মামা-ভাগ্নী, মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোন প্রমুখের বিবাহ প্রচলিত। অন্যদিকে বহু গোষ্ঠীর মধ্যে বহুপত্নী বা বহুস্বামী গ্রহণ করার রীতি সেই সেই সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। ভারতীয় সমাজে কোনো ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করলেও তাঁর প্রথমা স্ত্রীর ভূমিকা থাকে বাড়ির কর্ত্রীর মতো। পুত্রসন্তানের জন্মদানকারী চীনা বা ভারতীয় নারীর প্রতিপত্তি নিঃসন্দেহে অপুত্রক রমণী থেকে বেশি। নিজের সম্মানের স্বার্থেই তাঁরা নিজ স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ বা রক্ষিতা রাখতে অনুমতি দিতেন। আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে, বহু সন্তানের জননী তাঁর স্বামীকে তিরস্কার করেন অন্য নারীকে বিবাহ না করার জন্যে। কারণ স্বামীর পরিবারে কাজের যোগানদার তো একজন পাওয়া যায়। যৌনক্রীড়া বিবাহের একমাত্র নিয়ামক নয় ; সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠীগত ধারাবাহিকতার স্বার্থেই বিবাহ।

আদিবাসী ঐতিহ্য

নৃবিজ্ঞানের দর্পণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিবাহ আদিবাসী মানুষজনের নিজ নিজ গোষ্ঠী সংহতির স্বার্থে, সাংস্কৃতিক ও বংশধারা প্রবাহের একটি কার্যকারী ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্থা। বিভিন্ন ভৌগোলিক ক্ষেত্রে তথা বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্থিতিতে অবস্থানকারী বৈচিত্র্যময় আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিবাহের ভিন্নতা লক্ষণীয়। আবার দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার জন্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বিবাহের প্রকারভেদ, নাচ-গান সবই প্রায় এক রকম হয়ে পড়ে। পুরুলিয়া থেকে ময়ূরভঞ্জ, ঝাড়গ্রাম থেকে

রাঁচিতে যে অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করেন— যাঁরা মূলত চাষি, কারিগর ও আচার-অনুষ্ঠান সহায়ক গোষ্ঠী তাঁদের বিবাহের মূল অনুষ্ঠান, গীত ও নাচ এক।

বিবাহবিধি পৃথিবীর সমস্ত আদিবাসী মানুষজন নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুসারে নিজেদের পরম্পরা মেনে চলেন। এই বিধি দু প্রকারের— (১) আন্তর্গোষ্ঠী ; (২) বহির্বিবাহ। আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহে নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর (এথ্‌নিক গ্রুপ) মধ্যেই অগ্রাধিকার পায়। ভারতবর্ষের হিন্দু জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাতে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতির (কাস্ট) মানুষসহ বিভিন্ন আদিবাসী কৌমসমূহে স্ববর্ণ স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ করতে পারেন। তবে এর মধ্যে অবশ্যই কিছু সতর্ক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন একটি গোষ্ঠীর বা কৌমের একই বংশে/কুলে/গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের কথাবার্তা শুরু করার প্রাথমিক জিজ্ঞাসা হল বংশ/গোত্র/প্রতীকের মিল হলে সেই যোটক পরিত্যাজ্য হয়।

বংশ/কুল/গোত্র/ঝাড়/পারিস/কিলি/পাঞ্জি/আনাম, যে নামেই বলা হউক না কেন টোটেমিক প্রতীকগুলি যদি এক হয় তবে বিবাহ নিষিদ্ধ। সুতরাং ভারতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি আন্তর্বিবাহ করে থাকেন বহির্বংশ বা বহির্গোত্রে বিবাহের মাধ্যমে। প্রসিদ্ধ নৃ-বিজ্ঞানী দীপালি দণ্ড অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সেমখোর গ্রামে 'সেমসা' গোষ্ঠীর বিবাহ রীতি ও বিধি লক্ষ করেছেন একই গ্রামে। নৃ-বিজ্ঞানী অজয় চৌধুরী, দীপেশ চৌধুরী, জগৎমোহন সরকার ও নির্মল দাসের ওই গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধান পদ্ধতি আমাদের শিহরিত করে। তাঁরা লক্ষ করেছেন যে, আনুমানিক দুই শত বৎসর ধরে 'সেমসা' গোষ্ঠী ওই গ্রামেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। গ্রামের বাইরে বিবাহ অমঙ্গলসূচক বলে 'সেমসা' গোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করে।

আন্তর্বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে নৃ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। নৃ-বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ বিষয়ে একমত যে, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ কৌমের সামাজিক সংহতি এক উষ্ণ বাতাবরণের মাধ্যমে বজায় রাখেন। অবৈধ যৌন-সম্পর্ক রোধের যে মূল্যবোধ আদিবাসীদের মধ্যে আছে তা প্রতিফলিত হয় আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের দ্বারা। নিজ নিজ গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের সুবাদে বিবাহের যোগাযোগ হয়, তাই নিজ গোষ্ঠীর প্রতি অসীম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ তাঁদের অব্যাহত থাকে। আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপরিচিতকে আপন করে, পরস্পর বিরোধী 'বেড়' বা 'থাক'-এর মানুষজনকে বৈবাহিক কুটুম্ব হিসেবে আপন করে সম্পর্ক সুস্থির করা হয়। বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ পরিবারগুলির

পারস্পরিক সাহায্য, আনন্দ উৎসবে যোগদানের দায়বদ্ধতা, অর্থ, ধান, গরু ও গতর দিয়ে চাষাবাদ, গৃহনির্মাণ, বিবাহকার্য ও মৃতের জন্যে অশৌচ পালনের সময়ে যথাসম্ভব সাহায্য করা আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের কারণ। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ পরিবারের কন্যাদের সম্পদ হিসেবে প্রতিপালন করে। যার ফলে পাত্রের অভিভাবকেরা কন্যা খোঁজে।

কুড়মিদের বিবাহযোগ্যা কন্যার 'বর-লাগে' অর্থাৎ বরপক্ষ কন্যা আগে দেখতে যায়। কনের বাড়ি থেকে বর খোঁজা সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ। এই ধরনের 'বর-খোঁজা' কন্যার বিবাহ দেওয়া খুব মুশকিল হয়। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কন্যাপণ বা 'গোনোঙ্গ' প্রচলিত। কোথাও তিন টাকা, কোথাও সাত টাকা। কিন্তু সিংহভূমের 'হো' গোষ্ঠীর মধ্যে কন্যাপক্ষ চাওয়ার জন্যে 'গোনোঙ্গ' খুব বেশি (দু-জোড়া বলদ, একটি গাই বাছুরসহ এবং ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা)। হো যুবতীদের পাত্র খুব সহজে জোটে না। 'গোনোঙ্গ'-এ প্রাপ্ত টাকা দিয়ে 'হো' গোষ্ঠীর সমাজপতি মানকি-মুণ্ডারা হাঁড়িয়া মদ খেয়ে থাকেন। সমাজপতিদের ভয়ে কোনো কন্যার পিতা 'গোনোঙ্গ' কমাতে পারে না।

ওড়িশার কোরাপুট জেলার 'কোন্ধ' গোষ্ঠীর ও সিংহভূমের কিরিবুরু, জয়ন্তগড় এলাকা 'হো' যুবতীরা সেই জন্যে সরকারি কর্মচারী, অসাধু ব্যবসায়ী প্রমুখের সঙ্গে অবৈধ যৌনমিলনে বাধ্য হচ্ছেন। বহির্গোষ্ঠীতে বিবাহ করলে জৈবিক পিতার পরিচিতি হিসেবে সন্তানকে ভালো চোখে দেখে না আদিবাসীরা। সন্তানের পরিচয়ে কলঙ্ক ও অপবাদ দেওয়া হয়। বহির্গোষ্ঠীতে প্রেম করে গৃহত্যাগ করা যে কোনো আদিবাসী রমণীর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাই কুড়মি আদিবাসী গোষ্ঠীর কোনো যুবতী এই ধরনের প্রেম করে গৃহত্যাগ করলে, সেই যুবতীর পিতামাতাকে তাদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গৃহত্যাগী কন্যাকে মৃত বলে ঘোষণা করে তার 'কামান-খাওয়া' (শ্রাদ্ধ-ভোজ) অনুষ্ঠান করতে হয়। যুবতীর সঙ্গে জৈবিক পিতামাতাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামাজিক সম্পর্ক চিরকালের মতো শেষ হয়ে যায়। 'কামান-খাওয়া' পংক্তিভোজে 'পোটলোই', 'মাহাতো', 'পরগোনোৎ', দেশ-মণ্ডল' প্রমুখ বিশিষ্ট সামাজিক সমাজপতিরা অংশ নিয়ে পতিত পরিবারটিকে উদ্ধার করে।

আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহে বর বা কনের বাড়ির ভূ-প্রাকৃতিক স্থিতি ও দূরত্ব অনেক সময় বিবেচনা করা হয়। একই বংশের সদস্য হিসেবে, নিজ নিজ 'গুষ্টি-ভায়াদ' ও পরিবারে সদস্যদের সঙ্গে একই গ্রামে বসবাস করার জন্যে সামাজিক নিষিদ্ধতার গূঢ় তত্ত্বের শিক্ষালাভ ঘটে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। কিন্তু গ্রামের অন্য বংশ বা কুল বা পারিসের বা কিলির মহিলার প্রতি আকর্ষণ থাকেই। তাই স্ব-গ্রামে

বিবাহরীতি কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, দণ্ডমাঝি, লোহার, দেশওয়ালি মাঝি প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত।

গোষ্ঠী রীতি-নীতি মেনে নিজ নিজ জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে ওই গোষ্ঠীর পরিমণ্ডলের মধ্যে, তাকেই বলে নির্ধারিত বিবাহ। আর নির্দিষ্ট বংশমণ্ডলীর মধ্যে এবং আত্মীয় পরিচয়জ্ঞাপকতার সুবাদে যে বিবাহরীতি প্রচলিত তাকে বলে বাঞ্ছনীয় বিবাহ। মামাতুতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাই-বোনের বিবাহ কিংবা জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো ভাই-বোনের বিবাহ বহু গোষ্ঠীতেই প্রচলিত। আবার সাঁওতাল, কুড়মি, মুণ্ডাসমাজে এই ধরনের বিবাহরীতি নিষিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের বিবাহ সর্বাধিক। অধ্যাপক ডি. এম. মজুমদার ও টি. এন. মদন মনে করেন যে, কনে-পণের সুবাদে যে অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করা হয় তা আবর্তিত হয় নিজেদের মামাতুতো ও পিসতুতো পরিবারগুলির মধ্যে। এই 'দুধ-ফেরত' বা কনে-পণ আবার সেই পরিবারে ফেরত আসে যখন 'ক' তার নিজের মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মামার ছেলের বিয়ে দেন। আবার দুই ভাই বা বোনের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বিবাহ প্রথা যে-গোষ্ঠীতে প্রবর্তিত আছে সেখানে আত্মীয় সদস্যের মধ্যে অবাধ মেলামেশার এক বাতাবরণসহ হাসি-মশকরা সম্পর্কের মধ্যে যৌন-সঙ্গিনী নির্ধারণের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে মেনে নেন। নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিভিন্ন আত্মীয় সদস্যদের সঙ্গে নিয়মমাফিক ও রীতি-অনুসারে দূরত্ব বজায় রাখতে রাখতে একজন নারী বা পুরুষ মানসিক চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেই ক্লান্তির থেকে তাদের মুক্তি ঘটে কোনো কোনো নির্ধারিত নারী বা পুরুষের সঙ্গে হাসি-মশকরার মাধ্যমে।

বাঞ্ছনীয় বিবাহ পৃথিবীর নানা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘোরাফেরা করে আত্মীয়তার সুবাদে। অস্ট্রেলিয়ার 'ক্যারিইরাস' গোষ্ঠীর ভেতরে মামাতুতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলনের মাধ্যমে দুটি পিতৃস্থানীয় যুগ্ম পরিবারগুলিকে সুসংহত করে। উত্তর আরবের উট পালনকারী, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী যাযাবর বেদুইন গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের বিবাহ প্রচলিত। মরুভূমিতে বসবাসকারী এই গোষ্ঠীকে জল ও উটের খাদ্য সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়। এক শক্তিশালী পুরু দল উট-সম্পদ, নারী ও খাদ্য-পানীয় রক্ষার স্বার্থে সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। এই পুরুষেরা আত্মীয় সুবাদে নিকটতম। তাঁরা লক্ষ্য রাখে যে-কোনো বেদুইন যুবক বিবাহ করে অন্যত্র যেন চলে না যায়। বেদুইন উপ-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উট ও পানীয় জলসহ খাদ্যসমৃদ্ধ এলাকার জন্যে সবসময়ই খুনোখুনি লেগেই থাকে। চিরশত্রুদের ঘরে আপন সন্তান বিবাহ করুক এটা গোষ্ঠী কর্তৃক বাঞ্ছনীয় নয়। তাই

আন্তর্গোষ্ঠী বিবাহবিধি চালু আছে এই গোষ্ঠীতে। কোনো তরুণ-তরুণী গোষ্ঠী থেকে অন্যত্র বেরিয়ে যাওয়ার সহজতম অবকাশও পায় না। আত্মীয় সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক মিলে এক উষ্ণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে তারা আবদ্ধ ; যা তাদের দলের সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন।

সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যে কোনো কোনো গোষ্ঠীতে কোনো নারী তাঁর মৃত স্বামীর ছোটোভাইকে বিবাহ করেন। 'সাঁওতাল', 'মুণ্ডা', 'কুড়মি', 'দেশওয়ালী মাঝি', 'গড়', 'রাউতিয়া' প্রমুখ অসংখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে 'দেবর বরণ' বা 'ভাজ রাখা' শালী বিবাহ ইত্যাদি বিবাহরীতি গুলির সামাজিক তাৎপর্য খুব বেশি। একজনের মৃত্যুতে পরিবারগুলির মধ্যে যে সামাজিক ও আন্তরিক লেনদেনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তাকে পুনরায় সমপরিমাণে উষ্ণতাতে ভরিয়ে দেবার জন্যে এই প্রথার প্রচলন হয়েছে। যেহেতু ওই সমস্ত গোষ্ঠীতে বিধবা বিবাহ ও ছাড়ি (স্বামী পরিত্যক্তা) বিবাহ প্রচলিত বলে (সাঘা বিবাহ) পারিবারিক মর্যাদার স্বার্থে মৃত বড়ো ভাই-এর স্ত্রীকে বিবাহ করেন। তামিলনাড়ুর নীলগিরি পাহাড়ের 'টোডা' মহিলারা একই সঙ্গে তাঁর প্রথম স্বামীর ছোটো ভাইদের বিবাহ করেন। সবচেয়ে ছোটো বরের বয়স হয়তো তখন কন্যা অপেক্ষা পনেরো-বারো বৎসর কম। হিমালয়ের জৌনখার-বাওয়ার এলাকার 'খাসা' রমণীরা একই সঙ্গে পরিবারের সব ভাইকে বিবাহ করে। আরও একটি বাঞ্ছনীয় বিবাহের রীতি প্রচলিত তা হল 'বদল-বিবাহ'। দুটি পরিবারের ভাই-বোনেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহকে বদল-বিবাহ বলে।

বিভিন্ন প্রকারভেদ

বিবাহের দুটি প্রকারভেদ আছে। এক বিবাহ ও বহুবিবাহ। এক বিবাহে একজন পুরুষ একজন নারীকেই বিবাহ করতে পারেন। বহু বিবাহের আবার দুটি প্রকারভেদ। একজন পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণ এবং একজন নারীর বহুস্বামী গ্রহণ। এক বিবাহ পৃথিবীর সর্বজনীন প্রথা বা রীতি।

বহুপত্নী বিবাহের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম উদাহরণ আফ্রিকার উগান্ডা দেশের 'বাগান্ডা' গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন একনায়কদের এক শতেরও বেশি এবং সামন্ত-সর্দারদের দশ জনেরও বেশি পত্নী থাকে। পুরুষের নানা কারণে মৃত্যুর জন্যে 'বাগান্ডা' গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা নারী অপেক্ষা অনেক কম। আনুষ্ঠানিক হত্যা, সম্পত্তির লোভে সহোদর ভাইকে হত্যা, যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ওই গোষ্ঠীতে পুরুষের সংখ্যা অনেক কম। অন্যদিকে 'টোডা' গোষ্ঠীর মধ্যে মেয়েদের বহুস্বামী গ্রহণের প্রেক্ষাপট অন্য ধরনের। ভ্রাতৃ-সুলভ বিভিন্ন স্বামীদের নিয়ে একজন 'টোডা' মহিলা

একই কুঁড়েতে বসবাস করেন। যখন কোনো ভাই তাদের যৌথ স্ত্রীকে সাহচর্য দেন তখন দরজার বাইরে রাখা তার পাগড়িটি দেখে অন্য ভাইয়েরা বুঝতে পারেন। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলে কোনো একজন স্বামী 'ধনুকছোঁয়া' অনুষ্ঠান করে শিশুর পিতৃত্ব মেনে নেন। অনেক সময় একজন 'টোডা' মহিলা একদল ভাই ছাড়াও অন্য বংশের অভ্রাতৃমূলক পুরুষদেরও স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে একমাস করে স্বামীদের সঙ্গ দেন। এই অবস্থাতেও 'ধনুক ছোঁয়া' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আনুষ্ঠানিক হত্যাসহ নানা কারণে শিশু কন্যাদের মৃত্যুর জন্য দেখা গেছে যে ৮০০ জন পুরুষ ১০০ জন মহিলা 'টোডা' গোষ্ঠীতে বর্তমান।

পলিনেশিয়ার মারকুইস দ্বীপমালাতে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে দলবদ্ধ বা মণ্ডলী বিবাহ হয়ে থাকে। মূলত মৎস্যশিকারী ও কৃষিজীবী মানুষজন এক একটি গ্রামে বসবাস করেন। একটি গ্রাম মূলত একটি বৃহৎ যুগ্ম পরিবার। পরিবারের কর্তার বাড়িতে সুদৃশ্য মাচা দেখে অনুমান করতে হয় তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ও মর্যাদা। কর্তার বিবাহের পর তাঁর স্ত্রীকে অন্যান্য পরিবারের পুরুষেরা বিবাহ করে ওই পরিবারেই অবস্থান করেন কর্তার জনবল বাড়ানোর জন্যে। ওই নারীকে ঘিরে একটি বহুপতিযুক্ত পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের কর্তার স্ত্রীর গৌণ স্বামী হিসেবে থেকে তাঁরা নিজেরাও গৌরবে ভূষিত হন।

সমগ্র ভারতে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির বর ও কনে গ্রহণের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। শিক্ষানবিশি বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, পালিয়ে বিবাহ, রাজি-খুশি বিবাহ, সেবা বিবাহ, অনুপ্রবেশ বিবাহ এবং দেখে-শুনে বা সম্বন্ধ বিবাহ। ত্রিপুরার হালাম ও কুকি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একজন যুবক তাঁর পছন্দমতো কোনো যুবতীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করেন যুবতীর অভিভাবকদের অনুমোদন নিয়ে। কয়েক সপ্তাহ বসবাস করার পর তারা যদি পরস্পরকে, বিশেষত, যুবতী যদি পুরুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিবাহে রাজি হয় তবে সামাজিক বিবাহ অনুমোদন করে অভিভাবক ও সমাজপতি 'রায়', 'গাবুর' ও 'গালিম'রা। যুবতী যদি পাত্রকে অযোগ্য বিবেচনা করে তবে অভিভাবকেরা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এই ধরনের বিবাহকে শিক্ষানবিশি বিবাহ বলে।

ছোটোনাগপুর মালভূমির ভূ-সংলগ্ন এলাকা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলাতে ও ময়ূরভঞ্জ, কেঁওনঝোর, সুন্দরগড় জেলাতে 'সিন্দুর ঘষা' রীতির দ্বারা কনে বা তার অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে জোর করে বা বলপূর্বক বিবাহ করার প্রথা আছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুড়মি, খাড়িয়া, বীরহোড়, ভূমিজ, লোহার, বড়াইক, রাওতিয়া ইত্যাদি গোষ্ঠীর মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। এই ভয়ানক কাণ্ডটি

ঘটাতে হয় অবশ্য দিবালোকে, হাটে, বাজারে বা মেলাতে। সংঘর্ষ ও অশান্তি এড়ানোর জন্যে যুবকটি পালিয়ে যায়, পরে আর ওই কন্যার 'বর-লাগে' না বলেই সামাজিকভাবে বিবাহটিকে সিদ্ধ বলে মনে করা হয়। এই বিবাহরীতিকেই 'ট্যানে-বিহা' বা বলপূর্বক বিবাহ বলা হয়।

শক্তি বা বিক্রমের সাহায্যে বিবাহরীতি চালু আছে 'ভীল' সমাজে। কন্যা-পণ বা গোনোঙ্গ দিয়ে বিবাহ করার প্রথা, বিনিময় বিবাহ, সেবা বা শ্রমদানের মাধ্যমে বিবাহ সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুড়মি, ভূমিজ, হো-সহ বংচের, কাইপেঙ্গ, কলই সমাজে প্রচলিত। অবস্থাপন্ন অভিভাবকের বাড়িতে 'বাগাল' বা 'মুনিষ' হিসেবে কাজ করে সম্পদ আহরণ করে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত। ভাবী বধূর কাছে ওই পুরুষ 'গোণ্ড' সমাজে 'লামানাই' এবং 'বাইগা' গোষ্ঠীতে 'লাগ-সেনা' নামে পরিচিত। পালিয়ে বিবাহ বা অপহরণ বিবাহ আদিবাসী সমাজে প্রচলিত। বিবাহ দিতে রাজি না হলে পাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায় পাত্র। দু-তিন মাস একসঙ্গে থাকার পর গ্রামে ফিরে এলে উভয়পক্ষের অভিভাবকরা বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে ভোজ খাইয়ে তাদের স্বামী ও স্ত্রীরূপে বসবাস করার ব্যবস্থা করে।

কোনো যুবতী যখন তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাবার জন্যে, বিবাহে অনিচ্ছুক ওই পুরুষের বাড়িতে জোর করে ঢুকে বা অনুপ্রবেশ করে এবং অত্যাচার, অনাহার সহ্য করেও ওই বাড়িতেই থেকে যায় এবং পরে যুবকটি বিবাহে রাজি হয় তখন তাকে অনুপ্রবেশ বা ঢুকু বিবাহ বলে। বীরহোড়, সাঁওতাল, কুড়মি, হো, মুণ্ডা, ভূমিজদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহের রীতি প্রচলিত। 'রাজি-খুশি' বিবাহ আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত। 'রাজি খুশি' অর্থাৎ ভালোবেসে বিবাহ। সম্বন্ধ বা দেখেশুনে বিবাহ আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। যখন কনে-জোগাড় করার জন্যে 'রায়বার' বা ঘটক মারফত খবর পেয়ে বিবাহযোগ্য যুবকের অভিভাবকরা কন্যার পিতা বা অভিভাবকের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে আনুষ্ঠানিক রীতি মেনে বিবাহ নির্ধারণ করে তখন তাকেই দেখাশুনা বা সম্বন্ধ বিবাহ বলে।

এ ছাড়াও সাঁওতাল কুড়মিসহ অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আরও এক ধরনের বিবাহ আছে যাকে বলে 'বর-কেনা' বিবাহ। কোনো অবিবাহিত কন্যা যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং 'বেজাতে' বা অন্য ধর্মের যুবককে বিবাহ করতে চায় তবে তার জন্যে পাত্র সংগ্রহ করা কন্যার পিতা ও সমাজপতিদের দায়িত্ব। কারণ ভাবী .সন্তানকে পিতৃমর্যাদা ও পিতার গোত্র অবশ্যই পেতে হবে। এ অবস্থাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করে, ভূ-সম্পত্তি দিয়ে পাত্র বা বর-কেনার দায়িত্ব কন্যার পিতার।

সম্পত্তির লোভে পিতৃ-পরিচয় দেবার প্রতিশ্রুতিতে অনেকেই রাজি হয় কন্যাকে বিবাহ করার জন্যে। সাঁওতাল সমাজে এই ধরনের বিবাহকে বলে 'কিরিঞ জাওয়ার বাপলা'। আবার কোনো পাত্র না পাওয়া গেলে কুড়মি সমাজের 'পরগোনোৎ' এবং সাঁওতাল গোষ্ঠীর 'জগমাঝি' নিজের গোত্র ও কুলের পরিচয় দিয়ে শিশুটিকে 'বেজন্মা' অপবাদ থেকে রক্ষা করে।

আচার অনুষ্ঠান

পৃথিবীর সর্বত্র বিবাহের সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁদের নিজ নিজ আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এই আচার অনুষ্ঠানগুলি সৃষ্টির আদি-ইতিহাসের কবে শুরু সেটা জানা আজ লোকসংস্কৃতির ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এক একটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পরিচিতি বা 'পহচান' আজও আচার অনুষ্ঠানের মারফত বাঁচিয়ে রেখেছে। সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াতে এক একটি আচার অনুষ্ঠানের প্রতীককে একটি গোষ্ঠীর মানুষ অত্যন্ত উষ্ণ সজীবতায় তার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আর এর ফলেই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির অস্মিতা বা শনাক্তকরণের ঐতিহ্য প্রবহমান।

কুড়মি কৌমের বিবাহ অনুষ্ঠান, লোকাচার, গান সমস্ত কিছু ধরে বলা হয় কুড়মিদের বিবাহ 'ষোল সগুনের বিহা'। 'রায়বার' বা 'আগুয়াপেছুয়া' (ঘটক) মারফত বিবাহযোগ্য কন্যার খবর নেওয়া হয়। প্রাথমিক কন্যা নির্বাচনের জন্যে বিভিন্নভাবে যাত্রার শুভাশুভ লক্ষ্য করা হয়। এরই জন্যে ভোর রাত্রে বের হন পাত্রপক্ষ। লোকবিশ্বাস অনুসারে বিভিন্ন অশুভ 'সগুন' দেখলে তারা ওই পাত্রী দেখা থেকে বিরত হন। অশুভ 'সগুন'গুলি হল, ক্ষার কাচতে নিয়ে যাওয়া, কাকের মুখে হাড় থাকা, কুকুর বা বেড়াল কাঁদা, গাই বাছুরের জন্যে হামলানো বা ডাকা, শিয়াল বা বেড়াল ডান দিকে রাস্তা কাটা, সাপের বাম দিকে রাস্তা কাটা, সাপের ব্যাঙ ধরার শব্দ শোনা, ছোটো শিশুদের পেট খারাপ হওয়া, গোরু, মোষ, ছাগল মারা যাওয়া ইত্যাদি। 'আড়ে-অ্যালতে' (পাত্রীর বাড়িতে পাত্রীকে না দেখে কোনো নিকট কুটুম্বের বাড়িতে ডেকে এনে) পাত্রী দেখে ফিরে এসে 'সগুন সাতা' বা 'সগুন সত্য' অনুষ্ঠান করে শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কন্যা নিরূপণ করা হয়।

পুরুলিয়ার ঝালদা, বাঘমুণ্ডী থেকে শুরু করে ময়ূরভঞ্জের মুরুডা থানার চিতোড়া মাকুন্দ, পলাশবধা গ্রামে 'সগুন সাতা' অনুষ্ঠান লক্ষ করেছি। খুব ভোরে, কাক ওঠার আগেই ভাবী ননদ বা দেওর 'অমুহা' পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে, গোবর দিয়ে নিড়ানো 'তুলসীথানে' একটি কাঁসার 'ডুঙাতে' রাখেন। 'বুড়ী-বান্দনা'-

র দিন (বাঁন্দনা উৎসবের দুদিন পরে) উপবাসী হয়ে কুড়মি গৃহকর্তা গো-বন্দনা করার জন্যে যে ধানের 'মোড়' প্রস্তুত করে ঘরে টাঙিয়ে রাখে সেই ধানের শীষ থেকে নখ দিয়ে খুঁটে তিনটি চাল বের করা হয় বর, কনে ও ধর্মদেবতার নামে। বরের নামের সঙ্গে যুক্ত চালটিকে কাজল দিয়ে, পাত্রীর নামের সঙ্গে যুক্ত চালটিকে সিন্দুর দিয়ে মাখানো হয়। ধর্মদেবতার নামে চালটিতে কোনো কিছু মেশানো হয় না। এর পরে ওই চালগুলি 'ডুভার' জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। জলের মধ্যে চালগুলি ঘুরছে কেমন তা খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করা হয়। বরের নামে চিহ্নিত চালটি যদি ধর্মকে প্রথমে এবং পরে কন্যার নামে চিহ্নিত চালটির সঙ্গে মিলিত হয় তবে শুভযোটক অনুমান করা হয়। কন্যার নামে চিহ্নিত চালটি প্রথমে ধর্মঠাকুর ও পরে বরের প্রতীকী চালের সঙ্গে মিলিত হয় তবে সেই বিবাহে কন্যা প্রাধান্য লাভ করে। যদি বর ও কনের প্রতীকী চালগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার পর ধর্মঠাকুরের প্রতীক চালটির সঙ্গে মিলিত হয় তবে সেই বিবাহে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যদি প্রতীক চালগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত না হয় বা ডুবে যায় তবে অশুভ এবং বর বা কনের অপমৃত্যুর সম্ভাবনা। সেই জন্য কন্যা পরিত্যক্ত হয়।

কন্যা নির্ধারিত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যাকে আশীর্বাদ বা 'দুয়ারখাঁদা' অনুষ্ঠান করা হয়। কন্যাকে সোনা বা রুপোর অলংকার দিয়ে পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে। কন্যার বউদি হাতে একঘটি জল নিয়ে আমডাল দিয়ে জল ছিটিয়ে অতিথিদের বরণ করে। কন্যা ও কন্যার বউদি অতিথিদের 'খমচ' প্রণাম করে। এরপর পাত্রীপক্ষের লোকেরা বর দেখতে বা পাত্র আশীর্বাদ করতে যায়। 'বন্ধু-কুটুম্ব ভায়দ্দ'সহ কন্যাপক্ষ পাত্রী আশীর্বাদের জন্যে গ্রামে পৌঁছোবার পর সেই গ্রামের 'মাহাতো'-র অনুমতি নেয়। এর পর বরকর্তাকে বর হাজির করতে বলা হয়। বর ও বর বাগাল (জামাইবাবু) এসে সকলকে 'মহুল-কুড়া' জোহার প্রণাম জানান। বরকে ছড়ার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করে— 'কাঁহালে আইলাহি তুঁই, কাঁহা তর ঘার, কন ঝাড়েক বাঁশ তুঁই, কন বাঁশেক শর।' উত্তর দিলে বোঝা যাবে যে বর কঁকা (বোবা) না 'কালা' (কানে কম শোনা)। বর যদি রসিক হয় তবে হাসতে হাসতে জবাব দেয়— 'সুরগুঁজা রতনপুরলে অ্যাইলাহি শিখরভুঁঞে ঘার, হিন্দোয়ার ঝাড়েক বাঁশ ওহে বাঁশেক শর।'

বর দেখার পর, কন্যাপক্ষ কুটুম্বদের সামনে বলে, 'কন্যালে বর হ্যল টেক; অগল দিগল হলে বুঝবেক কে?' গাঁয়ের 'মাহাতো' তখন জিজ্ঞাসা করে— উমেদার কে? বরের বাপ-দাদা, স্বজন কুটুম্ব দায়িত্ব নিয়ে বলে 'হামরা বহুর সবু ভারাভার লিলি'। অর্থাৎ কনের দায়িত্ব সকলের, একা বরের নয়।

এরপর বিবাহের দিন ধার্য হয়। 'পণবসা' টাকাসহ হলুদ, দুর্বাঘাস, আতপ

চালসহ কন্যার বাড়িতে 'লগন' পাঠানো হয়। 'লগ্ন' যাবার পর ডোম, ঘাসী, কামার, কুমোর, নাপিত, তাঁতি, ধোপাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বিবাহের বাজনা বাজাবার জন্যে ডোম, ঘাসী, কাজললতা ও যাঁতির জন্য কামার (লোহার) ; নূতন সার-ভার হাঁড়ি, নূতন চুকার জন্যে কুমোর, আলতা পরানো ও নখ কাটার জন্যে নাপিত, আম্ল-খাওয়া সুতোর জন্যে তাঁতি, ক্ষার-শুদ্ধির জন্যে ধোপাকে নিমন্ত্রণ জানানো হয় সুপুরি মারফত। আত্মীয়-স্বজনদের সুপুরি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। গ্রামের লায়া/দেহরী গ্রামথান থেকে সিন্দুর এনে বরের বিবাহের সময় পরার ধুতিতে লাগিয়ে দেয়। ক্ষার-ছাড়া করার পর 'মাড়ুয়া' পূজা করা হয় মুরগি বা পাঁঠা বলি দিয়ে। সেই মাংস খেয়ে 'বর‍্যাত সঁপড়া' বা বরযাত্রীরা প্রস্তুত হয়।

এরপর মেয়েরা 'সজনী-সাজা' ও 'সার-ভার' সাজায়। সুদৃশ্য পাঁচটি বড়ো হাঁড়িতে, দুটিতে একশত ছ্যাকা পিঠা, চারকুড়িয়া বা ৮০টি পিঠে দিয়ে দুটো হাঁড়ি এবং গ্রামের মাহাতোর সম্মানে একুশটি পিঠে একটি হাঁড়িতে এবং সঙ্গে মাড়ুয়া পূজার পাঁঠাটির একটি ফিচে (পাছা)-সহ প্রস্তুত হয় বরযাত্রীরা। 'সার-ভার' ও 'সজনী সাজাতে' থাকে একটি ভেঁড়রা কাঠের মশাল যা পরে জ্বালানো হয়, একটি চুকাতে মাছ ও মাছের জল, একটিতে গাইয়ের দুধ, দু-চুকা তেল, দুটো ছোটো টুপাতে হলুদ, দু-টুপা চুণি বা আতপ চাল, সিন্দুর দানের হলুদ মাখানো শাড়ি সিন্দুর, পাতখাড়ু, পিতলের খাড়ু, জারা-বারা, কলাই, পান, সুপারি, ঘি মাখানো সলতে, আতপ চাল, সিনই (বরের নখের পাশ থেকে রক্ত বের করে নাপিত সামান্য তুলোতে মাখিয়ে দেন) সহ তিরের ফলা, ছাগল ও ইন্দুর লাদড়ি বা পায়খানা ইত্যাদি নিয়ে যেতে হয়। কন্যার জন্মের সময় তিরের ফলা দিয়ে নাড়ি কেটেছিল ধাই মা, নাড়ি শুকিয়ে ছিল ইন্দুর ও ছাগল লাদড়ি পুড়িয়ে, নরতার সময় শুদ্ধি অনুষ্ঠানের জন্যে গ্রামবাসীকে তেল দিতে হয়েছিল এক কিলো, গ্রামের মেয়েরা হলুদ মেখেছিল, সমস্ত কিছু ফেরত দেবার রীতি কুড়মিদের মধ্যে প্রচলিত।

মা, পিসি, কাকি, মামি, ধাইমা ও ঠাকুরমার জন্যে নতুন শাড়ি নিয়ে বরযাত্রীকে প্রস্তুত হতে হয়। বিবাহের জন্যে যাত্রার পূর্বে পাত্রকে 'আম-বিহা' অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সময় আমপাতা দিয়ে বরের জামাইবাবু 'কাঁকনা' বাঁধেন বরের হাতে। আম অমৃতফল। আমের 'কুশী' পুরুষের যৌবনের প্রতীক। উপবাসী বরের মা, পিসি, মামিরা আমগাছের নিচে অত্যন্ত আদর করে বরকে কোলে বসিয়ে শেষবারের মতো বরের এঁটো খান আমভেপুর ও গুড়ের সাহায্যে উপবাসী হয়ে। অম্ল বা আমল খাওয়া অনুষ্ঠানের জন্যে মাতৃসমা আত্মীয়রা নিরুম্বু উপবাস করে। মায়ের স্তন শেষবারের মতো খেয়ে বর বিবাহের উদ্দেশে রওনা হয়। এই

সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'দুধের ধার' শোধ অনুষ্ঠান। কিন্তু মায়ের দুধের ঋণ কি শোধ করা যায়? মা-পিসিরা অধীর আগ্রহে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে।

দশ মাস দশদিন পুতা উদরে ধরিলি
পুতারে রোদকে করলঁঞ ছাঁহির।
যেত দিনে রে পুতা তহর জনমরে
পুতারে বড়ি দুঃখে ক্ষেপলঁঞ র‍্যাত।
পুতারে হাঁঠু মাড়ি ক্ষেপলঁঞ র‍্যাত
বৈঠা জ্বলাঁঞে অগঠি লাগাঁঞেরে
পুতারে ধাই মায়ে করল উদ্ধার
তহি যে যাবে পুতা আপনা শ্বশুরাঘার
পুতারে দিঁঞে রাখ দুধেকরি ধার।
কিয়া যে দেবঞ মায়গো, দুধেকেরি ধারগো,
ম্যায়গো হামি দেবঞ জনমেক কামিনী।
সেহ কামিনী পুতা রুথা কথা নেঁহি মানেরে,
পুতারে এড়ি ধমসাঁঞ চলি যাঞ,
পুতারে বাঁহি মলক্যাঁঞ চলি যাঁঞ।
যাহুক যাহুক মাইগো, বাহুক দিনা চারিগো,
ম্যাইগো ধুলা গাইড়ে আনবৌ ঘুরাঁঞ।
সেহ কামিনী মাইগো বিব্রি পিসিবেকগো,
ম্যাইগো পিঁড়েবসি করবে উদ্ধার।

বর চৌড়লে/পাল্কিতে এবার চেপে গ্রামের দেবতাদের স্থানে গিয়ে প্রণাম করে বিবাহ করতে বেরিয়ে পড়ে। বাজ-বাজনা, নাটুয়া, নাচনী নাচ নিয়ে বর-পৌছোলে, 'মাড়লা হাঁড়ি' 'মাহাত' ঘরে পাঠানো হয়। গ্রামের প্রান্তে পৌছোলে কন্যার বাবা দই ও মাছ দিয়ে বরের কপাল ছুঁয়ে বরকে স্বাগত জানায়। 'হরিবোল' ধ্বনি দেওয়া হয় পাঁচবার। এবার বর ও বরযাত্রীকে বরডেরা-তে জায়গা দেওয়া হয়। 'বরডেরা' কনের বাড়ি থেকে দূরে এমন স্থানে করা হয় যে বর যেন কনের মুখ দেখতে না পায়। 'সার-ভয়' বয়ে নিয়ে যেত দেশওয়ালি মাঝি বা গোষ্ঠীর লোকেরা।

এরপর 'ডুভাবদল' বা 'বেহাই বজড়' অনুষ্ঠান। কন্যার কাকা লগ্ন বাঁধা চাল নিয়ে এসে বরের কাকা বা বাবার সঙ্গে 'ডুভা' বদল অনুষ্ঠান করে। এরপর থেকেই বরকে সর্বক্ষণ পাহারা দেবে বরের 'বাগাল' বা জামাইবাবু। সজনী ডালা থেকে কনের জন্যে আনা জিনিসপত্র সব কনের বউদির হাতে তুলে দেবে বরকর্তা। বরের সঙ্গে আসা ডোমেরা কনেকে নিয়ে বাজাতে বাজাতে 'মহুল বিহা' করতে যাবে

মহুয়া গাছের কাছে। মহুয়া গাছের মহুয়া ফুল দিয়ে শুধুমাত্র মদই তৈরি হয় না, শুকনো মহুয়া ফুল অসময়ের খাদ্যও। এই মহুয়া গাছের কচড়া ফলের বীজ দিয়ে যে কচড়া তেল হয় তা কুড়মিদের রান্না মাখা-সহ সমস্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। একটি মহুয়ার 'খঁচে' কম করেও পাঁচটি মহুয়া ফুল ধরে রাখে। মহুয়া গাছের ফুল ও ফল মানুষকে যেমন সেবা করে, নারীও সেইরকম সেবা ও ত্যাগ করে একটি 'খঁচে'-র মতো পরিবারকে যেন ধরে রাখে। এই ভাবনাচিন্তা কুড়মি সমাজে 'মহুয়া বিবাহ' বা 'মহুল-বিহার'-এর প্রতীক।

এরপর গ্রামের দুটি ছেলে একটি পাত্রে জল নিয়ে আমপত্রে জলের ছিঁটে দেয়। একে বলে 'ছামানি'। এরপর কনের পিসি 'চ্যাঁক পুরা' বা বিবাহবেদীতে আলপনা দেবার জন্যে পাওনা দাবি করে। বর ও কনের ভাই এরপর 'শালা-ধূতি' অর্থাৎ শালার সঙ্গে ধুতি বিনিময় করেন। বিয়ের পিঁড়িতে বসে অনুষ্ঠিত হয় 'সিনই বদল' অনুষ্ঠান। এরপর কন্যাকে বসিয়ে আনা হয় একটি বাঁশের ডালাতে। এই সময় হলুদ মাখানো শাড়ি পরিয়ে আনা হয় পাত্রীকে। পাত্র এবার সকলের অনুমতি ও আদেশ নিয়ে কন্যার সিঁথিতে পাটের বা শনের সঙ্গে সিন্দুর মিশিয়ে সিন্দুর ঘষে দেন। সকলেই সমস্বরে 'হরিবোল ভাই হরিবোল' ধ্বনি দিতে থাকে, সিন্দুর ঘষবার সঙ্গে সঙ্গে মোট তিনবার। এরপর বর বাঁহাতে পাত্রীকে ধরে তার বামপার্শ্বে দাঁড় করায়, তখন কনের বউদি বরের চাদরের সঙ্গে কনের শাড়ির খুঁট বেঁধে দেয়। 'সিন্দরাদান' অনুষ্ঠানের পর বরকে বরের জামাইবাবু ও কনেকে কনের বউদি কোলে নিয়ে ভিতর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। বিবাহ অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। এর পরদিন 'মর্যাদা' রাখা হয় ওই দিনেই রাতে 'বান্দাপণ' বা 'চুমানি' অনুষ্ঠান হয়।

কনের আত্মীস্বজন থালা, বাটি, ঘটি, ডুভা, গাগরা বালতি দিয়ে এবং টাকা দিয়ে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে। এই সময় পাত্রীর বাড়ি থেকে যা কিছু 'যৌতুক' দেবার কথা তা দেওয়া হয়। এবার বর-কনেকে নিয়ে যাওয়া হয় ভিতর ঘরে। সেখানে বরকে খেতে দেওয়া হয়। এই সময় 'রুসানী' বা বর 'রুষ্ট' হবার কথা ঘোষণা করে। বরকে তুষ্ট করার জন্যে হাতঘড়ি, সাইকেল বা অন্যকিছু দেওয়া হয়। এরপর বিদায়। বিদায়ের আগে কনে তার মা বাবার 'ঘর ভরবে' উল্টোমুখে ধান ছুঁড়ে। 'ঘর ভরা' অনুষ্ঠানের সময় বিদায়ের গান যে কোনো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে।

লাল টুপাই গুড় মুড়ি
আর কি মা খাবো
তর ঘারে আর কিগো ম্যাঁঞ
বিটি জনম লিব।

বিদায়ের বাজনা বেজে উঠেছে। কনের বাড়িতে কান্নার রোল। কনে থমকে দাঁড়িয়ে বুকফাটা কান্নাতে ভেঙে পড়া মায়ের দিকে তাকিয়ে পাল্কিতে উঠতে যাচ্ছে, মেয়েরা গান ধরে।

মা কান্দেন মাঝ ঘরে ম্যাঞ গো
ফঁফাঞে ফঁফাঞে
দাঁড়া নরে বাজনদ্যারা ভাইরা,
ম্যাঁঞকে ম'র বোধ দিঁয়ে রাখি।

কুড়মিদের যোল সগুনের বিবাহে যোল 'রেগ' বা রাগের গান গাওয়া পরম্পরাগত ঐতিহ্য। বাজনাদার ডোমেদের বাজনার তাল বোল সবই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় আলাদা আলাদা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত জনৈক কুড়মি যুবক বিবাহ করতে গেলে গালাগালি খেয়েছিলেন এক আনন্দ-উল্লাসের বাতাবরণে...

ত'কে যে দেখে ছিলি টুটুল শুয়র বাগালি।
শুয়র টুয়র ছ্যাড়ে টুটুল বর সাজে আলি।

ঝাড়খণ্ড গোষ্ঠী-সত্তার বিকাশ

ভারতে বহুভাষা-ভাষী বহু গোষ্ঠীর বসবাস, দেশজ মানুষজনদের পাশাপাশি, হাজার হাজার বছর ধরে শক, হুন, পাঠান, মোগলদের শক্তিশালী মানুষজন যেমন এসে মিশেছেন, তেমনি ভোট-চীনা, কিরাত, মেচ গোষ্ঠীর মানুষরা ভূমি ও ঝুমচাষের উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে এসে পড়েছেন। সমুদ্রপথ ধরে পর্তুগিজ, আফ্রিকান, মগ মানুষজন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে এখানে এসেছেন বহু বছর আগে। সব মিলিয়ে ভারত এক মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের গোষ্ঠী ইতিহাসের ছাত্র, যাঁরা ভারতের নরপ্রবাহের আলোকিত ও অন্ধকার দিকগুলির চুলচেরা বিচার করেছেন, তাঁরা জানেন যে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 'আর্য-ভারত' ও 'অনার্য ভারত'-এর মিলন-সংঘর্ষ, যৌন ব্যভিচার, নারীহরণ, রক্তপাতের মধ্যেই উদ্ভব ঘটেছে। যার ফলে 'প্রভু' ও 'দাস' সম্পর্কের ভেদাভেদ পুষ্ট লেনদেনে জন্ম হয়েছে স্তরবিন্যস্ত জাতিবর্গ ব্যবস্থা।

এই সম্পর্কের খুবই সরলতম প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল ভারতীয় জনপদ সমাজগুলির আর্থ-রাজনৈতিক চরিত্রে। 'বর্ণ' বা গায়ের রং নিয়ে অর্থাৎ নিজেদের ফর্সা শারীরিক গঠন, লম্বা, নাক, ঋজু দেহ সম্পর্কে একদল মানুষ সচেতন হয়ে অন্যান্য কালো, তুলনামূলক ক্ষুদ্রাকৃতি, কিংবা নাক-চাপা, চোখ-ছোটো, বেঁটে, গোড়ালিমোটা অন্য আরেকদল মানুষ সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য শুরু করলেন। পরিশ্রমমুখী, উৎপাদনমুখী, নারী-পুরুষ এঁদের 'দাস'-এ পরিণত হয়েছিল। যার ফলে যজ্ঞ, পূজা, দেবতার নামে অর্ঘ্য প্রদানকারী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের জন্যে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় উঁচু স্থান করে নেন। 'দাস' 'দস্যু'দের স্থান হল সব নিম্নে। কালো মানুষজন যাঁরা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার শিকলে আবদ্ধ হলেন না, তাঁরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শাস্ত্রীয় বিধানে উল্লিখিত হলেন— 'নিষাদ' (যার অর্থ কালো, নিশি, রাত্রির মতোই যাঁদের রং), শবর-শবরী, (কালো নারী-পুরুষের জুটি), কোল (শূকরের মতো কালো বা শূকর থেকে যাঁদের উৎপত্তি) ইত্যাদি নামে।

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

> 'বাংলা দেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের

> বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মূলগত ঐক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সমুদয় জাতিই একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বংশধর। এই মানবগোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' অথবা 'অস্ট্রিক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে 'নিষাদ-জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন।" (বাংলা দেশের ইতিহাস ; পৃষ্ঠা ১১, ১৩৭৭)।

অন্যদিকে অমলেন্দু মিত্র (রাঢ়ের সংস্কৃতি, ১, ১৯৭২) দেখিয়েছেন প্রাচীনকালে হিন্দু-বৈদিক সংস্কৃতির মানুষরা প্রাচীন বাংলা দেশ সম্বন্ধে কী ভাবতেন। তিনি লিখেছেন,

> 'রাঢ়ভূমি তথা পশ্চিমবঙ্গ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বসতি ছিল এবং সভ্যতার গর্বে গর্বিত আর্যরা যখন তাদের সভ্যতা বিস্তার করে চলেছেন তখন এই অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। লিখিত তেমন কোনো সাক্ষ্য আমরা পাইনে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস আমাদের নেই। ক্ষিতিমোহন সেন এই সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন বৈদিক যুগে বাংলাদেশের ভাষাকে ও বাংলার সংস্কৃতিকে ছোট করিয়া দেখানো হইয়াছে। বাংলাদেশের লোককে এবং সেখানকার রচনাকে পাখির কচকচির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বেদোত্তর যুগে বাংলাদেশকে অযজ্ঞীয় বলা হইয়াছে। তীর্থযাত্রা বিনা সে-দেশে গেলে মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সংস্কৃত সাহিত্যে এজন্য বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক গ্লানিকর কথা আছে।' (চিন্ময় বঙ্গ ; পৃষ্ঠা ৬)।

অমলেন্দু মিত্র আরও বলেছেন, "আর্যদের এই আত্মম্ভরিতা আজ সহজেই চূর্ণ করে দেওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা বহু চেষ্টা করেছেন আর্যেতর প্রভাব মুছে ফেলার জন্য ; কিন্তু সফলকাম হন নি। রাঢ় অঞ্চল সেকালে আর্যেতর (সাঁওতাল, শবর, ওরাঁও যাদের বংশধর) অস্ট্রিক জাতি অধ্যুষিত ছিল।"

জাতি বর্ণের উদ্ভব

ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালির ইতিহাস' (আদি পর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন,

> "গঙ্গা-করতোয়া-লৌহিত্য-বিধৌত, সাগর, পর্বতধৃত, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্জনপদ সম্বন্ধে বাংলাদেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত

ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং একে একে ধীরে ধীরে কোথায়, কে কীভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সঠিক হিসাব রাখে নাই। সজাগ চিত্তের ও ক্রিয়াশীল মননের রচিত কোনো ইতিহাসে তাহার হিসাব নাই একথা সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার রক্ত ও দেহগঠনে ভাষায় ও সভ্যতার বাস্তব উপাদানে এবং মানসিক সংস্কৃতিতে তাহা গোপন করিতে পারে নাই।"

কিন্তু 'পবিত্র রক্তধারা' 'গায়ের রংসহ চেহারার সুঠামতা', 'বুদ্ধিমেধা, চিন্তন-মনন' প্রভৃতি যে সমস্ত মনোবৈজ্ঞানিক স্থিতি থেকে তৎকালীন 'আর্য' (কোশাম্বী ও রোমিলা থাপার-এর মতানুসারে যার অর্থ 'ভদ্রজাত', 'সদ্বংশজাত', 'সম্মাননীয়') মানুষজন যে 'জাতি-গর্বে' (Race Pride) গর্বিত হয়ে সমস্ত রকম কায়িক পরিশ্রমকারী মানুষজনদের নিচে দাবিয়ে রেখে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য। গোষ্ঠী ও জাতি-গর্বে চীনের সুবৃহৎ গোষ্ঠী 'হান', ইউরোপের 'রোমান', গ্রিক, 'কেল্টিক', 'নরডিক', রাশিয়ার বৃহৎ 'রুশ' গোষ্ঠী অনুরূপভাবে গর্বিত হলেও ভারতের মতো উঁচু-নিচু স্তরভেদে, ছোটো বা বড়ো সামাজিক মর্যাদাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, অন্য গোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করার সামাজিক কাঠামো তৈরি সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভারতে সেই পরিস্থিতিকে অতি দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগালেন তৎকালীন 'বর্ণাশ্রম' থেকে উদ্ভূত উচ্চবর্ণের মানুষ। আর তাঁরা তাঁদের 'দাস' ও দাসত্ব-না-মানা 'দস্যুদের' শূদ্র বা শূদ্রেরও অধম আখ্যা দিলেন এবং দেশজ ইন্ডিজেনাস গোষ্ঠীগুলিকে প্রথম থেকেই শাস্ত্রীর জ্ঞানের বিধানে কোণঠাসা করলেন।

সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩ ; ১৩৫৫) লিখেছেন, 'কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্ববাহু মহামনু, হ্রস্বপাণি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ তাম্রমূর্ধজ'—ভাগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সব দিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন। বলা বাহুল্য এ ধরনের উক্তি সেই প্রাচীনকালের আর্য ভারতীয়ের জাতি-গর্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গাত্রবর্ণের গর্ব অথবা শোণিতের ঔদ্ধত্য পৃথিবীর সভ্যতাকে বহুভাবে বিড়ম্বিত করেছে।... মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষকে প্রবল করবার একটা বড়ো উপায় এই জাতি-গর্ববাদ। 'বর্ণ-জাতি' সামাজিক স্তরভেদের প্রবক্তা গোষ্ঠীগুলির নৈতিক আধার তৈরি করেছিল ঋক্‌বেদ। কিন্তু ঋক্‌বেদ পুরোপুরি ছিল শ্রুতি। সংস্কৃত, ব্রাহ্মী বা কোনো লিপিই তখন আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং পশ্চিম ভারতের ও উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা যাঁরা শ্রুতি থেকে ঋক্‌বেদকে উদ্ধার করে লিপিভুক্ত করলেন তাঁরা একটি শ্লোক ঢোকালেন অতি চতুরতার সঙ্গে। পুরুষসূক্তে আছে :

"দেবগণ এক আশ্চর্য প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষকে যজ্ঞে বলিদান করেছিলেন। সেই

পুরুষের অঙ্গ থেকে জগতের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হল।" শ্রীযতীন বাগচীর মতে (জাতি-ধর্ম, ও সমাজ বিবর্তন, পৃষ্ঠা ৯ ; ১৯৮৬) পরে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে আরও একটি শ্লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাদীরা, যার অর্থ "ইহার মুখই ব্রাহ্মণ হল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়রূপে পরিগণিত হল ; বৈশ্য তার উরু এবং পদদ্বয় থেকে উৎপন্ন হল শূদ্র।" এই সূক্তটির উক্তি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "ঋগ্‌বেদ রচনাকালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনো অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উল্লেখ নাই। ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও আধুনিক সংস্কৃত। উক্ত সূক্তটির ভাষা দেখলেই মনে হয়, উহা আধুনিক সংস্কৃতের মতো। ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রগুলির ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের মতো নহে : তাহা অতিশয় কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র। শুধু ব্যাকরণ বিভিন্ন নহে, ছন্দও আবার অন্যরূপ।"

মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদের প্রয়োজনে দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়েছিলেন প্রজা-বিদ্রোহের রোষানল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে। প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপে হিন্দু বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ব্যবস্থা একেবারে নড়বড়ে হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির চাপে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উপরিসৌধ আন্দোলিত হতে থাকে। যতীন বাগচী (পৃষ্ঠা ২ ; ১৯৮৬) লিখেছেন "খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোর বা নিষ্ঠুর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় নাই। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সাধারণ মানুষের আগ্রহ, উৎসাহকে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে হিন্দু ধর্মে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার যেমন প্রবল হয়ে উঠেছে, তেমনি অশুদ্ধ খাদ্য, অপবিত্র বৃত্তি, অসবর্ণ বিবাহ, ভিন্ন জাতির সঙ্গে পানাহার বর্জনের নির্দেশ জারি হয়েছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যখন ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মের সমর্থক হয়ে উঠেছে, তখন স্মৃতি ও পুরাণকাররা হিন্দুধর্মকে সরলীকৃত বা সহজ সাধনযোগ্য না করে অধিকতর কঠোর বিধিনিষেধে কণ্টকিত করে তুললেন।" প্রকৃতপক্ষে বর্ণ-জাতি সংস্কারবাদী চিন্তা বড়ো রকম হোঁচট খেল এই সময়। 'দ্বিজ' মানুষজনরা সমাজের ও রাষ্ট্রের নিয়ামক থাকতে পারলেন না। কিন্তু দ্বিজত্ব আরোপিত হয়েছে তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপর।

কোকা আন্তোলভা, গ্রিগোরি বোনসার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি কতোভস্কি (ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৪ ; ১৯৮৬) লিখেছেন,

> 'ভারতে এই বর্ণ বা জাতিভেদের (অর্থাৎ কড়াকড়িভাবে একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখা, এবং সীমাবদ্ধ কয়েকটি ও বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা পেশার বৈশিষ্ট্যসূচক সুনির্দিষ্ট কয়েকটি সামাজিক

> গোষ্ঠীর মধ্যে তারতম্যকরণের এই ব্যবস্থাটির) উৎপত্তির প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতমহলে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠতে দেখা গেছে।'

তাঁরা আরও লিখলেন, (পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭) "পদমর্যাদায় পার্থক্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও ও ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন সবচেয়ে সুবিধাভোগী ও ধনী সম্প্রদায়। শ্রমজীবী জনসাধারণ ও ক্রীতদাসদের উপরে প্রভুত্ব করতেন তাঁরা।...

বর্ণভেদের সাহায্যেই আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, তাঁদের জাতিগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ এবং কৃষ্ণকায় স্থানীয় অধিবাসীদের নিম্নবর্ণের স্তরে অধঃপতিত করে রেখে তাঁদের দমন করার উপায় ঠাউরে ছিলেন আর্যরা।... বৈদিক যুগের শেষাংশে 'বর্ণ'গুলির মধ্যেই আবার পেশাভিত্তিক আরও ছোটো ছোটো নানা ভেদ ও বিভাগ দেখা দিল। বৃহত্তর 'বর্ণ'গুলি সহ এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিভাগও পরে দেখা দিল অনড় ও অনমনীয় নানা 'জাতি' রূপে। 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কৌটিল্য ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপারটি নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন। সারা জীবনব্যাপী ক্রীতদাস এবং অস্থায়ী বা সাময়িক ক্রীতদাসদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তিনি নানা ধরনের ঘটনার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন স্বাধীন আর্যদের দাস দশায় পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় কীভাবে। অর্থশাস্ত্রের বিধান অনুসারে ক্রীতদাসদের রাজকীয় খাসমহলগুলিতে বীজ বোনার কাজটি নির্দিষ্ট থাকত। এ ছাড়া ব্যক্তি ও মঠ-মন্দির কেন্দ্রিক বড়ো বড়ো খামারের কাজের জন্যেও নির্দিষ্ট থাকত ক্রীতদাস কিংবা ঠিকা-মজুর এবং 'অর্থদণ্ডের টাকা গতরে খেটে উশুল করার জন্যে' নিযুক্ত লোকজনেরা।... জাতক গ্রন্থগুলিতে সেইসব ক্রীতদাসের উল্লেখ আছে যাঁরা ঠিকা-মজুরদের সঙ্গে একত্রে গাছ কেটে বীজ বোনার জন্যে জমি সাফ করতেন।

মগধ এবং মৌর্য যুগগুলিতে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার শুধু যে উদ্ভব ঘটেছিল তা নয়, সমাজ কাঠামোর মধ্যে তা এক প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জন্মকৌলীন্য, বিষয়সম্পত্তি, অর্থ, খ্যাতি ও মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।... প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের সপক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা লিখলেন যে ক্ষত্রিয়দের শক্তি ব্রাহ্মণদের মন্ত্রণায় চালিত হলে তা অজেয় হয়ে উঠবে এবং চিরকাল অজেয় থেকে যাবে। তৎকালীন বহুবিধ লিখিত সূত্রে প্রতিতুলনায় উচ্চতর দুই বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে নিম্নতর দুই বর্ণের থেকে।... অপেক্ষাকৃত ঐশ্বর্যশালী বৈশ্যদের সঙ্গে উচ্চতর বর্ণের মানুষের অনেক ব্যাপারেই মিল দেখা যাচ্ছিল আর দারিদ্র্যদশায় পতিত বৈশ্যরা কার্যত পরিণত হচ্ছিলেন শূদ্রে।"

অন্ধকার যুগ

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে বর্ণব্যবস্থার সামাজিক স্তরবিন্যাস অব্যাহত গতিতে চললেও সম্পর্কভিত্তিক মর্যাদাবোধ দানা বাঁধতে লাগল। বৌদ্ধ ও জৈনদের দাপটে ক্ষত্রিয়রা বহুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। ফলে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের একাংশ দরিদ্র হয়ে বিভিন্ন পেশাতে যুক্ত হলেন। সেনাবাহিনীতেও ভাড়াটে সৈন্যরা আসতে লাগলেন। ফলে পেশাগত ক্ষেত্রে এক দারুণ পরিবর্তন হল গুপ্ত ও কুষাণ যুগে। আর এই পেশাগত পরিবর্তনকে ব্রাহ্মণ্য মৌলবাদীরা হল গুপ্ত ও কুষাণ যুগে। আর এই পেশাগত পরিবর্তনকে ব্রাহ্মণমৌলবাদীরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন বর্ণ বা জাতি সমূহের মধ্যে পরস্পর যৌন মিশ্রণের যুক্তি দেখিয়ে। ব্যবসায়ী, চাষি, সৈনিক, বণিক শ্রেণি, কারিগর, কবি, গায়ক প্রভৃতি বিদ্যায় ও নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষরা বারে বারে বিভিন্ন পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ার মধ্যে বিবর্তিত হতে লাগল এবং এই বিবর্তনকে ঘোরতর অসামাজিক ও 'মাৎস্যন্যায়' বলে মনে করে এই 'অন্ধকারময় যুগ' থেকে 'আলোকের পথে' নিয়ে যাবার জন্যে 'বেদান্ত' দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আবির্ভূত হলেন অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য।

মৌলবাদীরা এবং চরম রক্ষণশীল হিন্দু-ব্রাহ্মণবাদীরা তাঁর মতামতকে গ্রহণ করে নিল নিজস্ব আনুষ্ঠানিক মতাদর্শ রক্ষার জন্যে। তথাকথিত 'সনাতন' ধর্ম এইভাবে রক্ষা করলেন শঙ্করাচার্য। অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সারা ভারতের জৈন ও বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ, চৈত্য, জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করা হল নির্মমভাবে। আর যাঁরা উক্ত মতবাদগুলির প্রচারক ছিলেন, রাজাদের ও ব্রাহ্মণ শাসকের আদেশে তাঁদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হল। বহু মানুষজনকে হত্যা করা হল। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তাঁরা ব্রাত্য বলে চিহ্নিত হলেন। ফলে এই মধ্যযুগ যাকে ঐতিহাসিকরা 'স্বর্ণযুগ' বলেন, ভারতের পরিশ্রমমুখী, উৎপাদকমুখী, সমাজমুখী মানুষজনদের ইতিহাস অনুসারে পুরোপুরি অন্ধকার যুগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কঠোর ও নির্মমভাবে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা শিকড় গেড়ে বসল— শুচি-অশুচি, জলচল, অস্পৃশ্য ভেদরেখাতে ভারত দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে পড়ল। আর এই হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে ভারতের মূলধারা বলে ব্রাহ্মণ্য মৌলবাদীদের বিজয় পতাকাকে উড্ডীয়মান করে লক্ষ লক্ষ তাত্ত্বিক, পণ্ডিত হিন্দু সমাজের গড়ন নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থাটিকে ভারতভূমিতে অজেয় ও অমর করে রাখলেন।

পরবর্তীকালে নিষ্পেষিত, অবহেলিত মানুষরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলাম ও খ্রিস্টান হতে আরম্ভ করলে, হিন্দু ধর্মের কঠোরতাকে শিথিল করে ষোড়শ শতাব্দী

থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে 'নবশাখ' বলে একদল বৃত্তিধারী শূদ্রকে জল-চল করে উপরে তুলে আনা হল। অন্যদিকে 'রামানন্দী', 'মাধবাচারী', 'চৈতন্যদেব' প্রমুখ প্রচারক বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করে মানুষের জয় ঘোষণা করে বললেন, 'শুনহ মানুষভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। ভক্তিবাদী কবি সাহিত্যিকরা সুফি-দরবেশ, ফকিরদের উদারপন্থী মতবাদ নিয়ে দরবেশ, আউল, বাউল, বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করলেও ব্রাহ্মণ্য আধারের মোহবাদী চিন্তা ও স্তরবিন্যাসের ঘেরাটোপ বাদ দিতে পারলেন না। বৈষ্ণববাদী, শাক্ত ও শৈববাদী মানুষজন ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-জাতি ব্যবস্থাতে ঢোকার জন্যে ওই মতবাদগুলিকে সিঁড়ি বা মই হিসেবে ব্যবহার করে, সদর দরজা দিয়ে ব্রাহ্মণ্য জাতিবর্ণ ব্যবস্থার গলিতে না ঢুকে খিড়কি দিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা করলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু মৌলবাদীরা নিজেদের স্বার্থেই এই খেলাগুলো খেলেছিলেন।

ভারতীয় নিপীড়িত জাতিসত্তার মানুষের স্বার্থে লড়াইকে তীব্র না করে তাঁদের শক্তি, বল, পরাক্রম, তেজকে ভোঁতা করার অভিনব পথ বের করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্রাহ্মণ্যবাদকেই বারে বারে জয়ী করলেন। এই প্রক্রিয়া যে কত শক্তিশালী তা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার শতাধিক ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের রমরমা ব্যবসা দেখলেই আজ স্পষ্ট হয়। দেওঘর, সুখচর, কলিকাতা, পুপুনকি, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানে নিম্নবর্ণের মানুষজনের মুক্তির উপায় খোঁজার জন্যে দাদা, বড়দা, বড়মাদের নামে, মনি-অর্ডার পাঠানোর বহর পোস্ট অফিসগুলিতে গেলেই বুঝতে পারা যায়। আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদ কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতীয় চিন্তা, মনন, মনস্তত্ত্বকে কীভাবে সাংস্কৃতিক দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছে তা আজও আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবকরা বুঝতে চাইছেন না। তার কারণ এই রাজনৈতিক অভিভাবকরা সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তারই বাহক, এবং নিজেরাও উচ্চবর্ণ ও জাতির লোক।

দেশান্তর ও ভেদাভেদ

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যাঁরা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতি-বর্ণের শিকল পরল না নিজেদের কৌমের বা গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখার জন্যে, তাঁরা কী করলেন? তাঁদের মূল্য দিতে হল অনেক। হাজার হাজার বছর ধরে আগ্রাসী 'আর্যয়ানার' বিরুদ্ধে তাঁরা লড়লেন পাহাড়ে, জঙ্গলে, উপত্যকাতে কিংবা মালভূমিতে বসবাস করে। যখনই তাঁরা বুঝতে পারলেন, 'আর্যয়ানা'-র সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল এগিয়ে আসছে, তখনই তারা সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যস্থানে চলে গেলেন। তাই যাঁরা মহেঞ্জোদারো-

হরপ্পা সংস্কৃতির জন্মদাতা, যাঁরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী, তাঁরা নানা কারণেই সেই স্থান ত্যাগ করলেন। কৃষিজীবীরা আবার পরিণত হলেন খাদ্য আহরণকারীতে এবং শিকারজীবী মানুষ আবার কৃষিজীবীতে উত্তরণের পর আগ্রাসী সামন্তদের দাপটে পুনরায় খাদ্য আহরণকারী ও শিকারজীবী গোষ্ঠীতে পরিণত হলেন।

এই প্রক্রিয়া চলতে লাগল হাজার হাজার বছর ধরে। মোঘল ও ইংরেজ রাজত্বে কেন্দ্রীয় শাসনের জন্যে এবং পুরোপুরি জমিদার, বণিক, পুঁজিপতিদের স্বার্থে তাঁরা বারে বারে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকে পরিণত হলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকের মজুত ভাণ্ডার হিসেবে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল চিহ্নিত হল। কিন্তু মহেঞ্জোদরো-হরপ্পা সভ্যতার সৃষ্টিকারী মানুষজন দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির চিহ্নগুলো ভুলতে পারলেন না।

ঝাড়খণ্ড ও চর্যাগান

আজও ঝাড়খণ্ডে একটি প্রবাদ খুবই প্রচলিত এবং তা সুপরিচিতও বটে। 'কোল, কুড়মি, কোড়া বেদ শাস্ত্র ছাড়া।' অর্থাৎ বেদ-শাস্ত্রের বিধান না মেনে যাঁরা জীবনযাপন করেন তাঁরা হলেন কোল গোষ্ঠী (মুণ্ডা, সাঁওতাল), কুড়মি এবং কোড়া (ওরাঁও, মুদি) গোষ্ঠীগুলি। বাংলা সাহিত্যে এঁদের চিত্রিত করা হয়েছে নীচজাতীয় শূদ্র হিসেবে। 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'-এ রয়েছে :

আগুরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী চাযাধোপাকৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতোর নুড়ী ধোপা হেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল, বাগদী, হাড়ী, ডোম, মুচি শুঁড়ি॥
কুর্মী, কোরাঙ্গা, পোদ কপালী তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ, বেদে, মালী, বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবী যতেক।
ভাবুক ভাক্তয়া, ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥

(শঙ্কর সেনগুপ্ত : ১৭৭ : ১৯৭৪, 'বাঙালি জীবনে বিবাহ', ইন্ডিয়ান পাব্‌লিকেশনস্‌ কলিকাতা)

চর্যাগানের সমকালীন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণরা কেমন ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার (চর্যাপদ, ২৭ : ১৩৮৮) বলেছেন :

> 'এই সময় থেকেই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র স্তর উপস্তর, বিভাগের

> সীমা, উপসীমা প্রত্যেকের পারস্পরিক আহার, বিহার, বিবাহ ব্যাপারে নানা বাধা নিষেধ, দন্তধাবন, শৌচ আচমন, স্নান, সন্ধ্যা-তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ পূজানুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ কাল বিচার ; অশৌচ আচার প্রায়শ্চিত্ত ; বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তি ; তপস্যা ; গর্ভাধান, পুংসবন থেকে আরম্ভ করে উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন সম্পত্তি বিভাগ ; বিচিত্র আহারের বিধিনিষেধ, বিচিত্র দানের বিবৃতি ; দানকর্মের বিচিত্রতর বিধিনিষেধ, তিথি নক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব বিচিত্র উৎপাত ; লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয় বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের নিয়ম ও কাল— এক কথায় সমাজ জীবনে ও ব্যক্তি জীবনের সমস্ত দিকে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বজ্রকঠিন প্রভাব সুবিস্তৃত ও সুগভীর ছিল।'

আর ব্রাহ্মণ্য বর্ণও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল কুলীন, শাসন, বৈদিক গ্রহবিদ্র (জ্যোতিষ) থেকে শুরু করে এঁদের একটি শাখা অগ্রদানী, যাঁরা শূদ্রের দান গ্রহণ করেন শ্রাদ্ধের পর, ভট্টব্রাহ্মণ ইত্যাদি। উত্তম শংকর ছাড়া অন্য কেউ পুরোহিতের কাজ করলে তাঁরা যজমানের বর্ণ ও উপবর্ণ প্রাপ্ত হতেন। এই ছিল বিধান। 'কিন্তু ব্রাহ্মণ যারা নয়, সমাজে উচ্চতম সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা যারা নিতান্তই জন্মসূত্রের জন্যই অর্জন করতে পারেনি তারা তখন কি অবস্থায় থাকত ? সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে যারা অধমসংকর বা অন্ত্যজ নাম নিয়ে বসবাস করত— সেই মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড় (বাউরী), তক্ষণকার, চর্মকার, ঘটজাবী (পাটনী), ডোলাবাহী (দুলে ?), মল্ল (মালো) এবং আরও নিচের স্তরের অধিবাসী পুককস, পুলিন্দ, ঘস, ঘর, কম্বোজ, যবন, সূক্ষ, শবর— এদের জীবন ছিল চূড়ান্ত অভাব, যন্ত্রণা, বেদনা, নিঃস্বতা, শোষণ ও নিগ্রহের জীবন্ত ইতিহাস। রজক, কর্মকার, নর্দ, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ (মেচ), ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কস, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণশিল্পী, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক প্রমুখের অন্নগ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ। শূদ্রের অন্নগ্রহণও ব্রাহ্মণরা কিছুতেই করতে পারবেন না এইরকম নির্দেশ ছিল। নির্দেশ অমান্য করলে প্রায়শ্চিত্ত, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য বিপদে পড়লে শূদ্রের হাতে তৈলপক্ক ভর্জিত দ্রব্য, পায়স ইত্যাদি খেতে ব্রাহ্মণদের নিষেধ ছিল না।' (অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, ৩০ ; ১৩৮৮)

"...চতুর্বর্ণের সর্বশেষ স্তর শূদ্র বলে ঢালাও ফতোয়া দিলেও চণ্ডাল, শবর, মেদ, কপালী, ব্যাধ প্রভৃতি যে অসংখ্য জন, কোম এবং গোষ্ঠী ভারতের সর্বত্র নানাভাবে বিদ্যমান ছিল তাদেরকে কীভাবে মনু যাজ্ঞবল্ক্য থেকে পরবর্তীকালে রঘুনন্দন পর্যন্ত এক গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারেন বোঝা দুষ্কর। শুধু এই নয়। উচ্চবর্ণ

এবং অন্ত্যজ শ্রেণির মিলনে জাত যে বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ এবং আরও বিচিত্র সংকর বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল, কোন যুক্তি-পদ্ধতি দিয়ে তাকে একটা গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যাবে"— বলে মন্তব্য করেছেন অতীন্দ্র মজুমদার চর্যাগানের সমকালীন বাংলা দেশের প্রেক্ষাপটে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সগৌরবে প্রচার চালালেন যে, চর্যাপদের ভাষা ভারতীয় বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার আদি রূপ। কিন্তু ঝাড়খণ্ডী জাতিসত্তার মানুষদের কাছে ঝাড়খণ্ডী ভাষার (কুর্মালি, নাগপুরিয়া, সাদরী, খোরটা, পাঁচপরগনিয়া প্রভৃতি কথ্যভাষার সম্মিলিত রূপ অনুসারে) আজও অত্যন্ত নিকটতম আত্মীয় চর্যাপদের ভাষা। যেমন— 'যে যেবাটে গলা' যেন ঝাড়খণ্ডীরা প্রতিদিন শুনছেন এবং বলছেন। গোন্ড ও অন্যান্য শক্তিশালী কৃষক গোষ্ঠী দ্বারা উৎপাটিত হয়ে কুড়মিরা আরাবল্লী পাহাড় ধরে কৈমুর পর্বতশ্রেণি পার হয়ে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের 'সুরগুঁজা রতনপুর' এলাকাতে এসে পৌছোন। সূর্য উপাসক এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ওরাঁও অসুর, আগারিয়া গোষ্ঠীর ওই অঞ্চলেই সাক্ষাৎ হয় এবং পারস্পরিক লেনদেন অব্যাহত থাকে। তখন ওই অঞ্চলে কৃষিকার্য করার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ফলে তাঁরা 'ঝুমচাষ' বা 'ডাহি চাষ' করতেন। কুড়মিদের বিবাহগীতে পর পর বলা হয়েছে।

সুরগুঁজা রতনপুরের বর‍্যাত আসেছে
সেহ দেখি কন্যার মাঁঞ গো কাঁন্দতে বসেছে।

আর করমগীতে আছে :

আজরে করম— গুসাই ঘারে দুয়ারে
ক্যালরে করম রাজা শাঁখ নদীক পারে।

শাঁখ অর্থাৎ শঙ্খ নদীর অববাহিকাতে চাষবাসে লিপ্ত হয়ে কুড়মিগাড় তৈরি করেন তাঁরা। কিন্তু ক্ষমতাশালী গোণ্ড ও চেরো রাজাদের আক্রমণে তাঁরা এবার সরে এলেন পালামৌ জেলার দামোদর নদীর অববাহিকাতে। পরে হাজারীবাগ জেলার দামোদর অববাহিকাতে উৎকৃষ্ট জমির সন্ধানে তাঁরা এগুতে থাকেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই অভিযান শুরু হল। এবং সাঁওতাল গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁরা 'হলদিগড়'-এ সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ হলেন। দামোদরের উচ্চ অববাহিকাতে অবস্থিত 'হলদিগড়' 'মেহদিগড়' নামে এই জায়গাতে প্রভাবশালী মুণ্ডা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ রোধের জন্যে তাঁরা যুদ্ধ-মিত্র হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলান। এই যুদ্ধ-মিত্রতাকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টাও চলে। সমন্বয় করার জন্যে বৈবাহিক লেনদেনও

আরম্ভ হয়। সাঁওতাল গোষ্ঠীর রমণীরা যে কুড়মিদের বাড়িতে রান্না করা খাবার খান, তার কারণ ওই মিত্রতা। সাঁওতাল গোষ্ঠীর কোনো যুবক যদি কুড়মি যুবতীকে বিবাহ করেন তবে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের বাড়ির সমস্ত দেবতা (বোঙ্গা) আনন্দে নেচে ওঠেন।

ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল গোষ্ঠী করমা উৎসব পালন করলেও 'জাওয়া' বা শস্যাঙ্কুরকে পুজো করেন না। কাজেই 'জাওয়া' বা শস্যাঙ্কুর উৎসব কুড়মিদের নিজস্ব। জ্যৈষ্ঠমাসের তেরো দিনে যে 'রোহিন' মাটি খেতে দেওয়া হয় তার কারণ কোনো এক সুদূর অতীতে রোহিনী নামের কোনো কুড়মি মহিলা প্রথম শস্যের দানা থেকে শস্যাঙ্কুর বের করেন। অন্যদিকে, সাঁওতাল গোষ্ঠীর 'সোহরাই' বা 'বাঁদনা' উৎসবে কুড়মিদের কুড়মালি ভাষায় রচিত বাঁদনা-গীতিগুলিও গাওয়া হয়। শুধুমাত্র রাত্রিতে মেয়ে-পুরুষের যৌথ নৃত্য-গীতির সময় তাঁরা সাঁওতালি ভাষাতে 'সোহরাই' গীতি করে থাকেন—

ভিত পিণ্ডা অড়া দুয়ার
দেলাং পুতা লগন লগন
হাথী লেকান সোহরাই দায়না
সেটে রেনারে।

(ঘর-বাড়ি আঙিনা সাজাও, সুবিশাল উৎসব 'সোহরাই' আসতে আর দেরি নাই।) অন্যদিকে, বাঁদনা পরবের রাত্রে গো-জাগরণের সময় তাঁরা গান করেন—

বলে অহিরে আশ্বিন বাহারাতে
কার্তিক সামাতে বাবুহো
পড়ি গেলা অমাবস্যাক রাতিরে—

গোঠপূজা, বাঁদনা ডিম ফাটানো, নায়কি বা লায়ার ঘরে যাওয়া, শ্রী-বলদ ও শ্রী-গাভীর জন্যে ধানের মোড় বানানো এবং গোয়াল-পূজা, শূকর বলি দেওয়া, গোরোয়া পূজা, হাল-ফাল, জুয়াল, মই, কোদাল, গাঁইতিসহ সমস্ত কিছুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, বাঁদনা পরবের অঙ্গ। সম্প্রতি ভিলাই-এ অনুষ্ঠিত 'চিনহারী' উৎসবে এই 'ধানের মোড়' ছিল প্রতীক। সমগ্র মধ্য ভারত থেকে শুরু করে সুদূর বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জসহ সমগ্র ঝাড়খণ্ডের 'হড়-মিতান' মানুষরা এই 'ধানের মোড়' তৈরি করেন সোহরাই বা বাঁদনা উৎসবের সময়। এই উৎসবে গোঠ পূজার সময় যে চ্যখ পুরা এবং গরু ডেগা অনুষ্ঠান করা হয় এবং ঘর-দুয়ার পরিষ্কারভাবে যে নিড়ানো হয়—

তা কুড়মি সাঁওতালসহ হড়-মিতানদের গোষ্ঠীর নিজস্ব। সাঁওতাল ও কুড়মী গোষ্ঠীর এই মিলন অব্যাহত ছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই স্থানীয় অধিবাসী সামন্তরা নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় দিয়ে উৎকল, রাঢ়ি, মৈথিলী, ব্রাহ্মণ আনিয়ে প্রচুর জমিদান করে ক্ষত্রিয় বংশাবলী তৈরি করতে লাগলেন। রামগড়, পদুমার রাজাদের মোঘল বশ্যতা স্বীকার করা, ছোটোনাগপুর, রাতুর রাজা কর্তৃক মোগল বাদশাকে হাতি ও কর প্রদানের চুক্তি, পঞ্চকোট গড়ের রাজাদের মোগল বাদশাহের সঙ্গে চুক্তিসহ ছোটো ছোটো সামন্ত যেমন পোড়হাট, সেরাইকেলা, বোনাই, বামরাসহ অন্যান্য সামন্তরা যেমন সিল্লী, বেগুনকোদর, কাতরাস, বাঘমারা, ঝালদা ইত্যাদির জমিদাররা সকলেই নিজেদের ক্ষত্রিয় বা ছত্রি হিসেবে রাজপুত হবার বাসনাকে চাঙ্গা করে তুলল। এর ফলে কুড়মি, ভূমিজ, ইত্যাদি গোষ্ঠীর মধ্যে সামন্ত বড়চাষি মনোভাব গেঁড়ে বসল যদিও এঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজপতি, দেশমণ্ডল, পোরগোণাৎ, পোটলইদের দাপটে যাঁদের নানা কারণে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল, যাঁদের পতিত ঘোষণা করে জল, ঘটিবন্ধ, আগুনবন্ধ, বিবাহ-শাদি, আত্মীয়তার লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হল তাঁরা বেদিয়াকুড়মি বা বেদিয়া বা ছোটো কুড়মি হিসেবে চিহ্নিত হলেন। এই সময় চাষি কুড়মি ও চাষি সাঁওতালদের আকাঙ্ক্ষা ছিল 'খেয়ে পরে বাঁচার' চাইতে উদ্‌বৃত্ত নিয়ন্ত্রণকারী বা উৎপাদনকারী হওয়া। তাই হাজারীবাগের দামোদর উপত্যকায় জমি যখন কুলালো না তখন অতি দ্রুত গতিতে সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাঁরা ঢুকে পড়লেন মানভূম, সিংভূম, রাঁচী অঞ্চলের কংসাবতী ও সুবর্ণরেখার উপত্যকাতে। ভূমিজ মানকী-সর্দার জমিদারদের অধীনতা নিয়ে, নিজস্ব উদ্যম ও পরিশ্রমে দক্ষতা ও কৃপণতা নিয়ে চাষি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে বাঁধ, বাগান করলেন। দেশজ পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা করে, মাটি কেটে, জঙ্গল হাসিল করে তৈরি করলেন উৎকৃষ্ট 'বহাল', 'কানালী' জমি। দু-এক বছর পুরোনো চাল খাবার লোভ ও ভাদ্র মাসে অভাবজনিত শ্রমশক্তি কিনে আরও উৎকৃষ্ট জমি হাসিল করার মানসিকতা কুড়মি ও সাঁওতালদের গেঁড়ে বসল।

এই সময় দেশীয় বণিক, তাম্বুলী, বেনে, তেলী, সোনারবেনে, শুঁড়ি গোষ্ঠীর লোকরাও ঢুকতে লাগলেন বাঁকুড়া বর্ধমান থেকে। এরা 'বাঙালি' জাতিসত্তার মানুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মারাঠা আক্রমণকারীরা ছোটোনাগপুর ও মানভূম বার বার আক্রমণ করলেন। প্রথমবার শঙ্খ নদী পার হয়ে আর দ্বিতীয়বার অম্বিকানগর সুরগুঁজা হয়ে, তৃতীয়বার উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ হয়ে। তাঁরা লুঠপাট তো

করলেনই কিন্তু রেখে গেলেন একদল বণিকশ্রেণি। যাঁরা বৈশ্য বলে পরিচিত। কালক্রমে এরা মিশে গেলেন এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে। এই অঞ্চলের কামার, কুমোর, নাপিত, ধোপা এবং জেলেদের বাঙালি জাতিসত্তার কামার, কুমোর, নাপিত, জেলেরা নিজেদের গর্বিত জাতিসত্তার দরুণ হেয় প্রতিপন্ন করে মঘয়াকুমার, মঘয়ানাপিত, মঘয়াতেলী, মঘয়াকামার, চাপুয়া-কামার, ঘুন্যা ইত্যাদি নামে অভিহিত করলেন। জাতি-বর্ণ স্তর বিন্যাস, ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ, খাদ্যাখাদ্যের শুচি-অশুচি, পেশাগত পবিত্রতার যাবতীয় কু-প্রতীকগুলো, রাজা, জমিদার, মান্‌কি ; দেশমণ্ডলদের সাহায্যে স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির উপর চেপে বসতে লাগল। জমি ও জমির উৎপাদন পরিণত হল মর্যাদারূপে। এবং তারপরই এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে ছোটো বা বড়ো, এই চিন্তা প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই যাবতীয় সমানুপাতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হল। শুরু হল 'জাতি-গর্ব' খোঁজার যাবতীয় পদ্ধতি।

বিদ্রোহ

এ ছাড়াও কতকগুলো বিশেষ কারণ ঘটল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রজা বিদ্রোহ শুরু হল। সেই বিদ্রোহগুলির মধ্যে বিশেষত চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহগুলিতে সাধারণ প্রজারা গোষ্ঠীপতিদের নির্দেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিল। ভূমিজ মুণ্ডা, কুড়মি, মানুষরা একত্রিত হয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করলেন। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল থেকে এর শুরু, কিন্তু শ্যামগঞ্জাম, সুবল সিং, লাল সিং, রঘুনাথ সিং মাহাতো, প্রমুখ অসংখ্য মানুষ শহিদ হলেন। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। ইংরেজদের অপ্রতিহত গতি ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে এসে রুদ্ধ হল। এবার ইংরেজরা বার বার এলাকার পুনর্বিন্যাস করলেন। পুলিশ, দারোগা ব্যবস্থা যেমন জোরদার হল, তেমনি প্রজা উচ্ছেদ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী চাষি, ব্যবসায়ী, পুরোহিতরা অবাধ গতিতে এলাকাতে বসবাস শুরু করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ বহু বাঙালি জাতিসত্তার মানুষ নূতন নূতন জমিদারি কিনে প্রজাবসতি ও প্রজা উচ্ছেদ চালাতে লাগলেন। এরপর শুরু হল ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের পালা। দীর্ঘ ১০ থেকে ১২ বছর ধরে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি চলতে থাকলে চাষিরা জঙ্গলকেন্দ্রিক জীবনে আবার ফিরে যায়। সিংভূম, ঝাড়গ্রাম, বগড়ি, মনোহরপুর, রাউরকেল্লা, বোনাই, বামরা, ময়ুরভঞ্জ, কেঁওনঝোর অঞ্চলে তাঁরা প্রবেশ করেন।

১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ আরও একটি নব আলেখ্য। মানভূম, সিংভূম, হাজারীবাগ এবং সাঁওতাল পরগনার দামিনি-ই-কোতে বসবাসকারী হড়-

মিতান কুড়মি, সাঁওতাল, কোল, কামার গোষ্ঠী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিধু-কানু, চাঁদ, ভৈরবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করলে সমস্ত খেটে খাওয়া 'হড়-মিতান' মানুষ জমিদার, মহাজন ও ইংরজেদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহে যোগ দেন। জনশ্রুতি যে বড়হেটের প্রতিরোধের সময় প্রথম শহিদ হন একজন কুড়মি, নাম তার চানকু মাহাতো। ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী স্তম্ভিত হন এমন অসাধারণ গণমৃত্যুবরণ (গণ শহিদ) দেখে। তাই নূতন করে ব্যাখ্যা শুরু করেন তাঁরা। সাঁওতালি 'ঠার' ভাষাতে যারা কথা বলতেন তাঁদের 'ঠারওয়া' সাঁওতাল নাম দিয়ে পুলিশ, দারোগার সাহায্যে প্রজা উচ্ছেদ করতে লাগলেন। সুদীর্ঘ কয়েক দশকে তাঁদের খেদিয়ে বেড়ানো হল। ফলে এই 'ঠারওয়া' সাঁওতাল গোষ্ঠীকে 'হসটাইল' তকমা পরিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে এবং পালাতে বাধ্য করল। সমস্ত সাঁওতাল, কুড়মি, কোল, কামার ইত্যাদি মানুষ যাঁরা দুমকা থেকে পথ চলতে চলতে বালেশ্বর পৌছোলেন তাঁরা দেখলেন জায়গাগুলো সবই অন্যদের দখলে।

ফলে ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই দেশীয় পুঁজিপতি, জমিদার, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পুরো ঝাড়খণ্ড এলাকা সস্তা শ্রমিকদের খোলাবাজারে পরিণত হল। কৃষক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া অতি দ্রুত গতিতে চলল যেমন একদিকে, অন্যদিকে বাঙালি, উড়িয়া, বিহারের প্রতিষ্ঠিত মানুষ জমিদারি, ব্যবসা, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষিত কেরানি, পুরোহিত হয়ে ঢুকতে লাগলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পুরো ঝাড়খণ্ড এলাকা পরিণত হল তাঁদের খাস তালুকে। আর খাস তালুকের প্রজারা হল তাঁদের দাসানুদাস। ফলে মালিক-চাকর বা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক যত জোরদার হল ঝাড়খণ্ডের প্রাচীনতম বা পরবর্তী বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলির জমিদার, সামন্তদের প্রভাবে তাঁরাও গোষ্ঠীগতভাবে একে অপরকে হেয় করতে লাগলেন, আর এই কাজে সাহায্য করল ব্রাহ্মণ্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও ইংরেজ শাসককুল। 'ঝাড়খণ্ড' সাংস্কৃতিক সীমানা বাঁটোয়ারা করে দারোগা পুলিশদের ক্ষমতা বাড়ানো হল। কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) ১৭৯৩ সালে গভর্নর জেনারেলের ২৭ অক্টোবরের আদেশে ২৫০টি গ্রাম মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভূমে আনা হল।

(খ) ২৭ ডিসেম্বর, ১৭৯৩ : বর্ধমান জেলার অধীন ছয়টি জঙ্গল মহলকে যেমন রায়পুর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহি, শ্যামসুন্দরপুর, খুরশাল, ফুলকুসমাকে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল। গভর্নর জেনারেলের আদেশে বলা হল সরকারি প্রশাসনিক কাজের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে এসব প্রয়োজন।

(গ) ১৭৯৯ সালে পাঞ্চেত ও ঝালদা রামগড় জেলা থেকে বদল করে বীরভূম জেলাতে আনা হল। কারণ হিসেবে বলা হল— পুরাতন জমিদারদের অবাধ্যতা

এবং চুয়াড়দের ক্রমাগত আক্রমণ (১৭৯৫-১৭৯৮)— সরকারি ফরমান জারি হল ১০ অক্টোবর, ১৭৯৯ এবং ৩১ অক্টোবর, ১৭৯৯।

(ঘ) বর্ধমান জেলার বগড়ী পরগনাকে আর্থিক ও রাজস্ব দিক থেকে প্রচণ্ড কাজের চাপের জন্যে ১৭৯৫ সালের ৩৬ ধারা অনুসারে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮০১, মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যোগ করা হল।

(ঙ) সেনপাহাড়ি, শেরগড়, বিষণপুর (কোদালপুর ও বালমে থানা বাদে) পরগনাগুলি মেদিনীপুর জেলা থেকে কেটে জঙ্গলমহল জেলাতে ঢোকানো হল। তার কারণ আদিবাসী বিদ্রোহ।

(চ) ১৮০৫ সালে জঙ্গল মহলের ষোলটি পরগনা (পাঞ্চেত, বাঘমুণ্ডি, বেগুনকোদর, তরফ, বাহাপুর, কাতরাস, হবিলা, ঝালদা, ঝরিয়া, কিসমত, নওয়াগড়, কিসমদচাউন্টালি (চাণ্ডিল), তোড়াং, টঙ্গ, নগরকিয়ারী ও পাতকুম নিয়ে তৈরি হল জঙ্গলমহল জেলা। সরকারি রেগুলেশন ১৭,১৮০৫। কারণ চুয়াড় বিদ্রোহীদের ভয়ংকর আক্রমণ।

(ছ) ছাতনা, বরাভূম, মানভূম সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা ১৮০৫ সালের ১৭ জানুয়ারি জঙ্গলমহল জেলাতে আনা হয়েছিল।

(জ) ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মানভূম দ্বিখণ্ডিত হল। কাশীপুর, বরাবাজার, বলরামপুর, আড়শা, পুঞ্চা ইত্যাদি এলাকা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু কী কারণে ইচাগড়, চাণ্ডিল, পটমদা থানা এলাকাগুলি সিংহভূমে যোগ করা হল, তার কোনো হদিশ নেই। কোনো ব্যাখ্যা নেই। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে খুশি করার জন্যে ডা. বিধানচন্দ্র রায় বিহারকে এবং টাটা কোম্পানিকে উপঢৌকন দিলেন ওই এলাকাগুলি।

কৃষক উচ্ছেদ

উপরোক্ত তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহের অসন্তোষ তীব্রতর হয়েছিল, কারণ ইংরেজদের নূতন করে জমিদার তোষণের ফলে বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে থেকেই প্রজা উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর চাষি মানুষজন সর্বস্তরে চাষাবাদ করে পাকাপাকিভাবে বসবাস করার চেষ্টা চালিয়ে যাবার পন্থা নিয়েছিলেন। কারণ সুবর্ণরেখার সোনার সন্ধানে, 'ছ্যালার বলদ' নিয়ে নুন-মশলা, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে কামিল্যা-ব্যবসায়ীর দল বহড়াগোড়া অঞ্চলে, তামাড় ও ইচাগড় অঞ্চলে বসবাস শুরু করে দিয়েছিলেন। উৎকল ব্রাহ্মণ, বেনে, তাম্বুলি, শুঁড়ি প্রভৃতি ধান-চালের মহাজনী শুরু করে প্রচুর জমিজমার মালিক হয়ে নূতন নূতন কায়দাতে প্রজা উচ্ছেদ শুরু করে নূতন প্রজা বসবাসের ফন্দীফিকিরে

অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ঝাড়খণ্ডের কুড়মি গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ দেখা দিতে থাকে জমি, ভূমি ও শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই। রাধাগোবিন্দ মাহাতো কুড়মিদের আকাঙ্ক্ষা কী কী ছিল এবং তার জন্যে যে প্রবাদগুলি ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত তার কয়েকটি নমুনা তাঁর গ্রন্থ— 'ঝাড়খণ্ডের কুড়মি' (পৃ. ১০৩)-তে দিয়েছেন—

(১) ভূমিজ গেল রাগে, কুড়মি গেল ভাগে,
(২) কুড়মির মাড় আর ভূমিজের কাঁড়,
(৩) কুড়মি, আরজ চিনি খায় পানি,
(৪) ধানে কুড়মি আবাদে কুইরি,
(৫) বহুত কাঠে মহুল সিঝে আর বহুত কথায় কুড়মি বুঝে,
(৬) ভূমিজ চাষা বতর নাশা আর কুড়মি চিনহায় অ্যাড়ে,
(৭) ভূমিজ চাষা বতর নাশা আর কুড়মি চাষা গতরনাশা,
(৮) জঁদে জঁদেপানিক যঁত, তঁদে তঁদে কুড়মিক জট,

সুতরাং জমিকেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে মর্যাদাবোধের যে চিহ্নগুলি এল কুড়মি সমাজে তা হল (১) বাঁধ, (২) বাগান, (৩) বেড়, (৪) বহাল, (৫) বাঁধাড়, (৬) বাগাল, (৭) বন্দুক। এই মর্যাদাবোধের প্রতীকগুলো অর্জন করার জন্যে কৃপণতার চরম নিদর্শন দেখাতেও তাঁরা বিচলিত ছিলেন না, নারী-পুরুষ রাতদিন পরিশ্রম করে, আহারে, শয়নে বা অন্যান্য বিলাসিতার জন্য যত কম খরচ করা যায় তাই করতেন। বৎসরান্তে ধান বা টাকার সঞ্চয় দিয়ে নূতন করে গোড়া জমি কাটতেন, জঙ্গল হাসিল করতেন।

কিন্তু 'বাঙ্গালি', 'ওড়িয়া' ও 'বিহারী' জাতিসত্তার মানুষ যাঁরা আদিবাসীদের কাছে 'দিকু' বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা ইংরাজদের সাহায্যে লাঠি ও পাইকদের সাহায্যে নানা অছিলাতে কৃষক উচ্ছেদ করলেন। এই প্রজা উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি মতাদর্শ বা জীবনবোধও ধ্বংস করা হল— আদিবাসীদের জমির মালিকানা বর্তাতো একটি গোষ্ঠীর (lineage) সদস্যদের, তা ক্রমশ হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ছোটো-বড়ো স্তরভেদ-পুষ্ট ব্যক্তি মালিকানার দিকে সরে যেতে লাগল। খাজনাবৃদ্ধি ও খাজনা আদায়ের তীব্রতার ফলে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে মামলার পাহাড় জমা হতে লাগল, দুর্বল কৃষকরা দেশ ছেড়ে পালালেন। Schwerin তাঁর প্রবন্ধে— ("Mines, Zamindars and Peasants," Edited by Rothaimond and Wadha, p-14, 1978) লিখেছেন—

Normally that amount of rent was determind by this kind of the coercion which the landlord could bring to bear upon his tenant but he increasingly tried to exploit this British legal system for his own

purposes. This was specially true of Ranchi and Manbhum, where during the 1880 and 1890 the average number of rent suits per year increased by 117% and 79% respsctively. These two districts experienced a significantly higher level of rent litigation than the rest of Chhotanagpur. This is clearly reflected by the following average numbers of rent suits per annum.

	Ranchi	Palamau	Hazaribagh	Singh-bhum	Man-bhum
1881-1884	713	49	693	19	1832
1885-1889	1100	45	890	47	2450
1893-1897	1276	134	915	173	2535
1898 1902	1550	159	918	310	3275

Less litigation, however, cannot be interpreted as an indication of reduced degree of tension, but comparatively more powerful position of the landlords in Palamau and Hazaribagh, which made their net result, in eviction of the Rayats or tenants."

কুড়মি গোষ্ঠীর বিকাশ

সুতরাং কৃষক উচ্ছেদের এই প্রক্রিয়াতে কুড়মিদের একটি বড়ো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, স্থানীয় ভূস্বামী, সামন্ত, রাজা, জমিদার, মালিকদের আশীর্বাদ-পুষ্ট বড়ো চাষি কুড়মিদের একটি অংশ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া, ইংরেজ আইন, পুলিশ-দারোগা ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে নিজেদের 'বুনিয়াদি' আখ্যা দিলেন ; বুনিয়াদ বা বনেদি শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত। এবং এরাই ব্রাহ্মণ্যবাদের জাতি-বর্ণাশ্রমের শিকার হলেন। মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগের কিছু মৌজাদার কুড়মি পরিবার জেলা সদরে উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, দারোগা, কেরানি, পিয়ন, পেয়াদাদের অসীম ক্ষমতাশালী ভাবলেন। কিন্তু কোনো পরিবার তাদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করবার সাহস পেলেন না।

১৯১৯ সালে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার ডাবর গ্রামের মদনমোহন মাহাতো এবং বাঘমুণ্ডি থানার ডাভা তোড়াং-এর রাজকিশোর মাহাতো ম্যাট্রিক পাশ করেন। ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এর মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নিয়ে ভঞ্জুকিয়া গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক নিরঞ্জন মাহাতো যে আন্দোলন শুরু করে নিজেদের কুর্মি-ক্ষত্রিয় বলার চেষ্টা করতে থাকেন তাতে উদ্‌বৃত্ত নিয়ন্ত্রণকারী মৌজাদার, সমাজপতি

কুড়মিরা যোগ দেন। সাইমন কমিশনের সুপারিশে নির্বাচনের কথা বলা হয়, যাতে হিন্দুদের জন্য, মুসলমানদের জন্যে, রাজা-জমিদারদের জন্যে, আদিবাসীদের জন্যে পৃথক নির্বাচনী আসন সংরক্ষিত হয়। পঞ্চকোটের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহদেব কুড়মিদের ঘাঘরজুড়ির সভাতে গেলেন ভোটের কথা মনে করে— তিনি যে কুড়মি সেটা স্বীকার করা তো দূরের কথা, গুগুই গ্রামের লহবত মাহাতোকে 'পরগণাইৎ' নিযুক্ত করে প্রমাণ করলেন যে কুড়মি গোষ্ঠী হিন্দু বর্ণাশ্রমবাদকে মেনে নিয়েছে এবং তারই ফলস্বরূপ ১৯৩১ সালে মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার টানাপোড়েনে হিন্দু মহাসভা, আর্য সমাজ, রাজাদের চাপ, টাটা কোম্পানি এবং ধানবাদের ও হাজারিবাগ জেলার কয়লা খনি মালিকদের চাপে এবং জেলা শহরগুলিতে বসবাসকারী 'বাঙ্গালি' 'উড়িয়া', 'বিহারী' বুদ্ধিজীবীদের চাপে ১৯৩১ সালে কুড়মিরা সরকারি আদিবাসী তালিকা থেকে বাদ পড়লেন।

অথচ চাকুরি, ব্যবসা, পেশাগত যোগ্যতা কোনোটাতেই কুড়মিরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার উচ্চবর্ণ জাতি গোষ্ঠীর লোকদের সমকক্ষ তো নয়ই বরং বলা চলে মদমত্ত ষাঁড় ও দুগ্ধপোষ্য বাছুরের সঙ্গে তুলনীয় অবস্থা। তবুও ইংরেজরা তাঁদের আদিবাসী তালিকা থেকে বাদ দিল কেন? কারণ ঝালদা সত্য মেলাতে আদিবাসী কুড়মি গোষ্ঠীর গোকুল মাহাতো, মোহন মাহাতো, শীতল মাহাতো, সহদেব মাহাতো, গণেশ মাহাতো ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য গুলি খেয়ে শহিদ হলেন। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের ভয়াবহতার সঙ্গে একে তুলনা করে ইংরেজরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিলেন। ১৯১৯ সালের মেড়ি আন্দোলনের ফলে ময়ূরভঞ্জে ৪ জনের ফাঁসি, ৩৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৯৩৩ জনের জেল হয়। অর্থাৎ কুড়মিদের হড়-মিতান জাতিসত্তা থেকে বাইরে বের করে আনতে না পারলে সমূহ বিপদ বলে তাঁরা মনে করলেন। ওকালতনামাতে কুড়মিদের নামের পাশে ধর্ম 'হিন্দু' লেখা হতে লাগল। কারণ এটা করলে কুড়মিদের জমি কিনতে সুবিধে, জেলা সমাহর্তার অনুমতি লাগবে না। কাজেই শিবাজীর বংশধর, বিভিন্ন রাজা মহারাজা কুড়মি কুলোদ্ভব ইত্যাদি Race Pride প্রতীক ঢোকানো হল।

বাঙালি, উড়িষ্যা, বিহারী জাতিসত্তার মানুষ এর ফলে জামশেদপুর, পুরুলিয়া, বারিপাদা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ধানবাদ, হাজারিবাগ ইত্যাদি শহরগুলির কুড়মিদের জমি কিনতে পারলেন বা দখল করলেন। অন্যদিকে, 'হিন্দু মিশন', 'হিন্দু মহাসভা', 'আর্য সমাজ' এদের হিন্দু দেখিয়ে মুসলমান জনসংখ্যা বেঙ্গল, বিহারে মেজরিটি নয়, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এছাড়াও মুসলমান বাদশাহের

সুন্দরী কুড়মী তরুণীর উপর অত্যাচার ইত্যাদির গল্প ফাঁদা হল। মোটকথা যে জালটা বিছানো হয়েছিল তাতে অতি সহজেই পা দিলেন কুড়মিরা। কিন্তু তৎকালীন চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদি ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং কোন কোন জাতি গোষ্ঠী কত মজবুত ছিলেন তা জানা দরকার। ১৯৩১ সালের সরকারি হিসাব মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের তুলনায় গোয়ালা, কামার, কুমোররা বহু পিছিয়ে ; শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা, নৌবাহিনী, পুলিশ, আইন, ডাক্তারিসহ সরকারি অফিসারদের হিসাব অনুসারে তৎকালীন বেঙ্গল-এর মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলাতে কুড়মিদের অবস্থা কি ?

ব্রজকিশোর মাহাতো নামে এক যুবক বি. এ. পাশ করে ১৯২৯ সালে রাঁচিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। পরে অবশ্য তিনি পুরুলিয়াতে পোস্টিং পেলে পুরুলিয়ার তৎকালীন উচ্চবর্ণের উকিল, মোক্তাররা তাঁর এজলাশ বয়কট করেন। তাঁর অপরাধ তিনি কুড়মি। ১৯৩১ সালে মহেন্দ্রনাথ মাহাতো নামে ঝাড়গ্রামের এক যুবক এম. এস. সি পাশ করেন এবং মেদিনীপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। সমগ্র ছোটনাগপুরের মধ্যে পুরুলিয়াতে ১৯২৫ সালে রাজকিশোর মাহাতো মোক্তার হন এবং মদনমোহন মাহাতো পুরুলিয়া জেলাধীশের অফিসে করণিক হন। ১৯৩০-৩১ সালে করমসিং মাহাতো রাঁচিতে উকিল এবং সিংভূমের মধুসূদন মাহতো বি. এ. পাশ করে টাটা কোম্পানির চাকুরি নেন। ময়ূরভঞ্জের, কেঁওঞ্জোরের, হাজারীবাগের কোনো কুড়মি তখনো গ্রাজুয়েট হন নি।

সেদিন কুড়মিদের প্রাথমিক/মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ সামন্ত চৌধুরীরা অর্থাৎ গ্রামের মাহাতো, দেশমণ্ডল ও পরগোনেইতরা প্রাণপণে চেষ্টা করে ডিড-রাইটার, উকিলের মুহুরী, দারোগা, পুলিশের টাউট, রাজনৈতিক দলের গ্রামীণ নেতা হয়ে বাঁচাটাকে ঢের বেশি সম্মানের মনে করলেন ; পরবর্তীকালে টাটা কোম্পানির খালাসি, কেরানি, রেলওয়ে গুডসম্যান, প্রাথমিক শিক্ষক, কয়লা খাদানের মেট ইত্যাদি কাজকে মেনে নিলেন সাধারণ মানুষেরা। সুতরাং গ্রামের এরাই হলেন সবজান্তা মোড়ল। অন্যদিকে, উনবিংশ শতাব্দী ধরে এই মাহাত, দেশমণ্ডল, পরগোনাইতরা বেয়াড়া ও বিদ্রোহী কুড়মিদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করার ফরমান জারি করলেন। কোনো সময় ডাইনি আখ্যা দিয়ে জমির লোভে, কোনো সময় সুন্দরী মেয়েদের লোভে, আবার কোনো সময় সম্মান, মর্যাদাবোধ ও ক্ষমতা দেখানোর লোভে, সামান্য দোষে বা বিনাদোষে পতিত করলেন বহু গরিব কুড়মিকে।

'সমাজ পতিত' হওয়ার ভয়ে গ্রামীণ মাহাতো, দেশমণ্ডল, পরগোণেইতকে অর্থের উৎকোচসহ জমি-বাড়ি বন্ধক বা বিক্রি করেও অনেকেই রেহাই পাননি। হয়তো কোনো কুড়মি মেয়ে সাঁওতাল, কিংবা ভূমিজ, কিংবা মুণ্ডা ছেলেকে বিয়ে করেছিল, কেউবা ফুল বাপের কোলে বসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল, কেউ বা হয়তো ফুল ঘরে রাত কাটিয়েছিল, কেউবা মদ হাঁড়িয়া মাথায় করে নিয়ে গিয়েছিল কুটুম্ব বাড়ি ইত্যাদি দোষ। যাঁরা পতিত হয়ে ভোজ, টাকা দিয়ে 'উদ্ধার' হলেন তাঁরা তো বাঁচলেন কুড়মি সদস্য হিসাবে, কিন্তু জমি-জায়গা সব মহাজনের হাতে চলে গেল। যাঁরা উদ্ধার হতে পারলেন না তাঁরা 'বেদিয়া', 'ছোট কুড়মি', 'আধকুড়মি' নামে পরিচিত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে, জমি, পুকুর ত্যাগ করে গৃহত্যাগী হলেন। আসাম, সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গে এরাই গেলেন বেশি।

যা বলতে চেয়েছিলাম তা হল, ইংরাজ রাজশক্তি ব্যবসা ও শাসনের প্রয়োজনে 'বাঙালি', 'উড়িয়া', 'বিহারী', জাতিসত্তাগুলির প্রত্যক্ষ মদতে কুড়মিদের 'আদিবাসী সমূহ' (Tribal cluster) থেকে বের করে আনার প্রক্রিয়াটিকে মদত দিচ্ছিলেন এবং পতিতদের ফেলে যাওয়া বাঁধ বাগান মহাজনদের হাতে অবলীলাক্রমে চলে যাচ্ছিল। অর্থাৎ কুড়মিদের একটি elite অংশ চাইছিল, অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কোনো সামাজিক লেনদেনই যেন ওদের না থাকে এবং কুড়মিরা যেন পুরোপুরি এদের সঙ্গে 'মালিক ও কাজের লোক' হিসেবে ব্যবহার করে। যার ফলে কুড়মি-ক্ষত্রিয় আন্দোলনের জন্ম হল এবং কুড়মিদের থেকে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজরা দূরে সরে যেতে লাগলেন।

শাসকগোষ্ঠী যখন দেখলেন বিভাজন সম্পূর্ণ, তখন ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট এবং ল্যান্ড রেস্টোরেশন অ্যাক্ট চালু হল। খ্রিস্টান-অখ্রিস্টান বিরোধ, আদিবাসী-দিকু বিরোধ, আদিবাসী ও অ-আদিবাসী বিরোধ ভোট কেনাবেচার লক্ষ্য হয়ে উঠল। কুড়মি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, গৌড়, রাউতিয়া, কামার, কুমোর মানুষেরা পরস্পর ভাগ হয়ে পড়লেন, আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসত্তার মানুষেরা অবাধ গতিতে পুরো ঝাড়খণ্ড এলাকাতে নিজেদের শিকড়কে মজবুত করলেন। এঁরা দখল করলেন ভাষা ও সাহিত্যকেও ; ব্যবসা, আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা, থানা-পুলিশ এদের দখলে থাকার জন্য সুসংবদ্ধভাবে পুরোপুরি বাজারহাট কেনাবেচা, উৎপন্নজাত দ্রব্য সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। লৌহ, কয়লা, অভ্র, তামা, সোনা, সীসা, পিতল সব কিছু চলে গেল আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী ও দেশীয় বেনেদের হাতে। কামার, ঠেঁঠরী, মালহাররা পরিণত হলেন সস্তা শ্রমিকে ; মুচি, ঘাসী, ডোম, কাহাররা নিজেদের বৃত্তি ছাড়লেন, হলেন সস্তা শ্রমিক।

নাপিত, ধোপা, কুমোর, তাঁতি, জোলারাও বাধ্য হলেন নিজেদের বৃত্তি ছাড়তে।

ব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বাদ মিটল না। জমিকেন্দ্রিক সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, কুড়মি, রাউতিয়া, ভূমিজ, গোড়দের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মালিকানাধীন জমি টুকরো টুকরো হতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে দেখা গেল যে জমি ও সংস্কৃতি তথা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে না। তাই জমিকেন্দ্রিক মূল্যবোধ থেকে জাত-আকাঙ্ক্ষা বেশিদিন টিঁকলো না— জমি আর লাভজনক নয়, জমির উৎপাদনে সারা বছরের খাবার যখন কুলোচ্ছে না, তখন আকাঙ্ক্ষার বা চাহিদার পূরণ কি করে হবে? তাই শুরু হল নূতন প্রক্রিয়া।

এবার প্রথমে কুড়মিদের মধ্যে একদল বুদ্ধিজীবী কুড়মিদের আদিবাসীত্বকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে এলেন। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। লেখক, কবি, গবেষক, গায়ক, তার্কিক, বক্তা, অসংখ্য যুবক ও ছাত্র ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতির প্রবহমান একতাকে প্রমাণ করলেন। সংহতি আছে এখানের জীবনের মূল্যবোধে, জীবন দর্শনে, তাই কুড়মি ক্ষত্রিয়রা দীর্ঘ ৭০ বছর আন্দোলন করেও মূল প্রবাহ থেকে কুড়মিদের আলাদা করতে পারলেন না। ১৯৬৭ থেকে শুরু হওয়া কুড়মিদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন ১৯৮৭ সালে মহীরুহে পরিণত হল। রাঁচিতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত আদিবাসী ও মূলবাসীদের এক সম্মেলনে কুড়মি গোষ্ঠীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আদিবাসী হিসেবে সকলে মেনে নিলেন। ১৯৮৭ সালের ঝুঁঝকা (পুরুলিয়া) গ্রামে অনুষ্ঠিত লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে অন্যান্য আদিবাসী নেতাদের উপস্থিতিতে কুড়মিদের ফিরিয়ে নেওয়া হল আদিবাসীদের মধ্যে; যা তারা ছিলেন এবং যা বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল। এবার তারা সাংবিধানিক সংরক্ষণ দাবি করলেন এবং সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিলেন। এই ধরনের স্মারকলিপি প্রদান যদিও ১৯৬৯ থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু ১৯৮৭ সালে তা জোরদার হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একই বিষয়ে একই মঞ্চে সমবেত হওয়াতে।

ড. সজল বসু (১১ ; ১৯৮৫) গরিব ও গরিবির কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন 'তুলনামূলক বঞ্চনাবোধ' (relative deprivation), অসাম্য, সংস্থানিক ব্যবস্থা, বিশেষ গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ ইত্যাদি প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে আলোচিত ও বিতর্কিত। অধ্যাপক মিরডালের অনুসরণে গুনার এডলার কারলসনও বলেছেন, 'সমতা প্রতিষ্ঠাই গরিবি নিরসনের মূল শর্ত, নচেৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসে ও সম্পত্তি সম্পর্কে (Property relations) কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। অধ্যাপক গলব্রেথ

তৃতীয় বিশ্বে গণ-গরিবির (mass-poverty) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গ্রামীণ সমাজের পুঁজি-সম্পদহীনতা, সঞ্চয়-শূন্যতা, বিনিয়োগের সম্ভাবনাহীন এক অশুভ চক্রের সহাবস্থানের কথা বলেছেন। এই চক্রই ঝাড়খণ্ডে তুলনামূলক গরিবির পরিস্থিতি (equilibrium of poverty) সৃষ্টি করেছে। ঝাড়খণ্ডের মানুষজনকে স্থান-কালের মূল্যবোধ, জীবনদর্শন, লোকাচার, ধর্ম ও সংস্কারের নিগড়ে বিচার করলে বোঝা যাবে যে তাদের সংস্কৃতি 'গরিবি সংস্কৃতি' নয়। Oscar Lewis বলেছেন, 'The culture of poverty is both an adaptation and a reaction of the poor to their marginal position in a class-stratified highly individualised society.'

জামশেদপুরের আশেপাশে অসংখ্য ঝোপড়িতে শহরের বাবুদের কাজের লোকেরা সহায়-সম্বলহীন ও অন্ধকার ভবিষ্যতের চেতনাতে আচ্ছন্ন। তার কারণ : (১) মুনাফাভিত্তিক কম মজুরি, (২) বেকারির উচ্চ হার, (৩) কম আয়ের মানুষজনদের সংগঠিত আন্দোলনের অভাব। কোনো পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে একজন 'কুলি' বা 'খালাসি' যে কাজ করে, যেভাবে থাকে, যা খায়, সব জেনেও সে খুশি হয় একটি বিশাল সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে, কারণ সে বুঝতে পারে যে সে একা নয়। যেহেতু ঝাড়খণ্ডী শ্রমিকেরা সংগঠিত নন, সেহেতু এরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ, তাই আরও বেশি মুনাফা লাভের আশায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিরা আরও সস্তা শ্রমিক চান শহরে, বন্দরে, কলে, কারখানাতে। এবং এর জন্যই হাজার হাজার গ্রাম উচ্ছেদ করে নব নব উন্নয়ন পরিকল্পনার নামে কলকাতা, দিল্লি, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, চণ্ডীগড়ে যেভাবে সস্তা শ্রমিক চালান হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন পশ্চাৎপদ অঞ্চল থেকে, তেমনি টাটা কোম্পানির চাকুরে বাবুদের বাড়িতে আলু, মুলো, বেগুন, মুরগি, চাল সরবাহ থেকে কাজের লোক পর্যন্ত আসছে একটি সীমাহীন দারিদ্র্যক্লিষ্ট পশ্চাদপদ এলাকা থেকে।

১৯৩৭ সালে ভারতের স্বাধিকার বিষয়ক নির্বাচনে বেঙ্গল প্রদেশে আদিবাসীদের কোনো সংরক্ষিত আসন না থাকার জন্য মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে, এমন কি বর্ধমান থেকেও কোনো 'আদিবাসী' ভোটে দাঁড়াবার সুযোগ পাননি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে এক অতি-বুদ্ধির খেলাতে মুসলমান, হিন্দু ও রাজাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। আদিবাসীদের সেদিন 'হিন্দু' হিসেবে গণনা করে হিন্দু প্রার্থীদের জয়কে সুনিশ্চিত করতে এবং মুসলমান জনসংখ্যাকে ঠেকানোর জন্য এই কায়দাটি রপ্ত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা হতেই পারে না এই অভিনব প্রতারণার।

আর এই প্রতারণাতে সামিল করার জন্য মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার

বিভিন্ন এলাকাতে 'সাফা হড়' আন্দোলন শুরু হয় ; পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে 'দেশওয়ালী' মাঝিদের মধ্যে 'অলেখ ধর্ম' প্রচার শুরু হয়। রাজবংশী, কোচ, পোলিয়া, মেচদের মধ্যে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন দানা বাঁধে। ত্রিপুরায় ত্রিপুরী, হালাম, কাইপেং, জামাতিয়াদের মধ্যে সিংহ, কলই সিংহ পদবী দিয়ে ক্ষত্রিয় সাজাতে চেষ্টা হল। আর এই আশ্চর্য 'হিন্দু'— 'হিন্দুত্বে'র খেলাটিকে নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু (১৯৪১) আখ্যা দিলেন, 'হিন্দুদের আদিবাসী সাঙ্গীকরণ'। এক অ্যাকাডেমিক প্রলেপ দিয়ে আদিবাসীদের 'স্বেচ্ছায় হিন্দুত্ব বরণ করার প্রক্রিয়াকে' 'আজান' দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। যাঁরা স্বেচ্ছায় হিন্দু হল তাঁদের অবস্থান জাতি-বর্ণাশ্রমের নীচু স্তরে কোন যুক্তিতে হল সেটা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। ফলে 'শূদ্র' হয়েও 'সৎশূদ্র' পোষাকী নাম পেয়ে রবাহুত অনাহুত থেকেই গেলেন। কিন্তু যে সমস্ত সংস্কৃতির মানুষের তেজ ও বিক্রম তাঁদের সমাজ কাঠামো ও জীবনছন্দের মধ্যে আছে, তাঁরা কেন বর্ণাশ্রমের দাস বা slave অর্থাৎ 'সাংস্কৃতিক দাসে' পরিণত হবেন? যাই হোক, কুড়মিরা রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করলেও ১৯৪২ সালে মানবাজারে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে চুনারাম মাহাতো ও গোবিন্দ মাহাতো গুলি খেয়ে শহীদ হলেন।

অসংখ্য খেটে-খাওয়া মানুষজন সেদিন কংগ্রেসের নেতাদের কথাতে জেল খাটলেন। ১৯৪৬ সালে বান্দোয়ানের জিতান গ্রামে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষের ডাকা এক সভাতে মানভূম জেলা কংগ্রেস এক প্রস্তাব দিলেন, মানভূম জেলাকে বেঙ্গলের সঙ্গে সামিল করতে হবে। কিন্তু হুড়া থানার পলমা গ্রামের মহেশ্বর মাহাতোর নেতৃত্বে একদল কংগ্রেস কর্মী প্রস্তাবটির উপর ভোটাভুটি চাইলে শ্রীঘোষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং শ্রীঘোষ হেরে যান। শ্রীঘোষ ও তাঁর দলবল তখন 'লোকসেবক সংঘ' গঠন করেন।

পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ, বিশেষত কুড়মিরা ভেবেছিলেন যে, বোধহয় বিহারের অপশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গভুক্তি হলে তাঁরা বাঁচবেন। শেষমেষ বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষাতে পঠন-পাঠন করতে পারবেন। মানভূম জেলা কংগ্রেসের নেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে সামনে রেখে বিহার সরকার লোকসেবক সংঘের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, ইচাগের কুড়মি-ক্ষত্রিয়নেতা রামজীবন মাহাতোর পুত্র এবং রাজকিশোর মাহাতোর জামাতা। অত্যন্ত সুদর্শন, বক্তা, সংগঠক শ্রী মাহাতো ছিলেন সম্পন্ন চাষির সন্তান, ১৯৫২ সালের ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি জিতে গেলেন ঝালদা কেন্দ্র থেকে। কুড়মিরা স্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত হলেন। একদিকে অর্থাৎ লোকসেবক সংঘের পক্ষে নেতা

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অরুণ ঘোষ, বীররাঘব আচারিয়া, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, চিত্ত দাশগুপ্ত এবং শ্রীশ ব্যানার্জী এবং তাঁদের সহযোগী ভজহরি মাহাতো, গিরীশ মাহাতো, সত্যকিঙ্কর মাহাতো ও সাগর মাহাতোরা, আর দেবেনবাবুর সঙ্গী মহেশ্বর মাহাতো, সৃষ্টিধর সিংহদেও কাটিয়ার, রামপদ মাহাতো, তুলসীদাস মাহাতো, শরৎ দাস, শঙ্করনারায়ণ সিংহদেও, অজিত প্রসাদ সিংহদেও প্রমুখ।

১৯৫৫ সালে ভাটবাঁধের জনসভাতে পাঁচ লক্ষ মানুষের জনসমাগম হল বিহারের পক্ষে। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি জানালেন এই এলাকার ভাষা বাংলা, কংসাবতী পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে হবে ; সুতরাং চাষ, চন্দনকিয়ারী বাদে সমস্ত সদর মহকুমা পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো এক অলৌকিক কারণে চাণ্ডিল, পটমদা ও ইচাগড় থানা বিহারের সিংহভূম জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। পশ্চিমবাংলাতে আসার পর বিধানবাবু পুরুলিয়ার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন, সৈনিক স্কুল, সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র খুললেন। কুড়মি ছেলেরা তখন Educationally Backward Class হিসাবে মাসে মাসে সরকারি বৃত্তি পেতেন স্কুল ও কলেজে। কিন্তু বিধানবাবুর সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সুপারিশে ১৯৬৩ সালে সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

১৯৬১ সালে উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জের দুজন খুবই মেধাবী কুড়মি ছাত্র পড়তে গিয়েছিলেন কটকে। চিতোড়ার পদ্মলোচন মাহাতো এবং রায়রঙ্গপুরের গিরিশ মাহাতো। তৎকালীন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহতাবের সহযোগী এবং মন্ত্রী সোনারাম সোরেনের এক আদেশে কুড়মি মাহাতো ছেলেদের বৃত্তি ও অনুদান বন্ধ হয়ে গেল। গিরিশবাবু শিখতে পারলেন কারণ তাঁর বাবা তাঁকে ধান ও জমি বিক্রি করে পড়ালেন, কিন্তু পদ্মবাবু পারলেন না। দরিদ্র এই অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি সেদিন পড়তে পারলেন না। কুড়মি ছেলেরা তখন Scholarship পেত, তাঁরা আই. এ. পর্যন্ত পেয়েছিলেন, আর পেলেন না। কলেজের মাইনে দিয়ে হোস্টেল খরচ চালাতে পারলেন না। অনেকেই পড়া ছেড়ে ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। এইভাবে বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করতে পারলেন না।

রাজ্য-পুনর্গঠনের যা শর্ত ছিল তা মানলেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। Bengal Tenancy Act চালু হল। খুঁঠকাঠিদার স্বত্ব বা ছোটনাগপুর Tenancy Act-কে অগ্রাহ্য করতে লাগলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। West Bengal Forest Act চালু করে ১৯২৫-২৬ সালের Cadastral Survey settlement-এর সময়কালের জঙ্গল সীমান্তে এরা যেতে চাইলেন। কংসাবতী Project-এর Land acquisition-এর টাকা বহু চাষি পেলেন না। কারণ জমির মালিকানা বা টাইটেল বাবার নামে থাকাতে তাঁর

সন্তানেরা জমির মূল্য পেলেন না। ট্রেজারিতে টাকা জমা পড়ল, সেই টাকা পাবার জন্য রায়তরা চেষ্টা করলে উকিল ও কেরানীদের মোটা কমিশন দিতে হত।

সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এমন ভয়ঙ্করভাবে পরিবেশ দূষিত করতে লাগল যে ১৫ মাইল রেডিয়াসের ফুলকপি-বাঁধাকপিতে বালি পড়তে লাগল। চাষের জমি, বাড়ি, গ্রাম পরিবেশ দূষণের ফলে ভয়ংকর মরুভূমিতে পরিণত হতে লাগল। শাল জঙ্গল শেষ হল। পাঞ্চেত রাকাব, অযোধ্যা আজ ধুঁকছে। বদলে বিদেশী রিফিউজি গাছ ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি ইত্যাদি লাগানো শুরু হল।

১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে ১৯৮৯ সাল দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর পর আজ যদি কাশীপুর হুড়ার কোনো ছেলে-মেয়ে জিজ্ঞাসা করে 'শালগাছ' কেমন, তাহলে তাঁর বাবাকে হয়তো ছবি এঁকে বোঝাতে হবে। ছোটো-বড়ো যাবতীয় পরিকল্পনা করলেও সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলা পিছিয়ে পড়তে লাগল। ফলে ১৯৫৬ সাল থেকে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট, ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট-এর শাসনে পুরুলিয়ার মানুষ বুঝতে পারল যে, সাঁওতালডিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলেও পুরুলিয়া এক ফোঁটাও বিদ্যুৎ পায় না। সিমেন্ট ফ্যাক্টরি করার নামে বারেবারে দামামা বাজানো হলেও পুরুলিয়ার সুবিশাল বেকারীর সংখ্যাতে কোনো পরিবর্তন হল না।

সিদ্ধার্থশঙ্কর মন্ত্রীসভাতে এম. এল. এ. কোটাতে যাঁরা চাকরি, শিক্ষকতা পেলেন তাঁরা বাঁচলেও ১৯৭৯ সাল থেকে শিক্ষকতা, চাকরি সব বিষয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা নেতাদের সুপারিশ ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। এমনকি জেলার অন্যান্য শরিক দলগুলিরও অবস্থা খুবই খারাপ। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, চাকরি, অর্থনীতি বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রের বঞ্চনা ও সীমিত ক্ষমতার কথা জেলার বামফ্রন্ট নেতারা যতই জোর গলায় প্রচার করুন না কেন, মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণকে দমন করতে পারছে না।

পঞ্চায়েতের প্রধান, অঞ্চল সদস্য হিসেবে নূতন আকাঙ্ক্ষার জন্ম হল। এতদিন যাঁরা সাইকেলে চড়ে সংগঠন করতেন তারা কিনলেন রাজদূত বা ইয়াজদি ইত্যাদি এবং বাড়িতে বাড়িতে টি. ভি. সেট, নেতাদের ছেলে-মেয়ে, জামাই, ভাগ্নে, শ্যালক, ভগ্নিপতি সকলেরই চাকরির ব্যবস্থা— এসব পুরুলিয়ার সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষেরা দেখলেন। প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল, কলেজগুলোতে পড়াশোনার বাতাবরণ নষ্ট হল।

১৯৬৭ সাল থেকে অতি নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে একদল যুবক ও ছাত্রদের আহ্বানে ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ও পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পায়ে পায়ে চলে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যখন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে শুরু হতে চলছে, তখন ১৯৭২ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাতে বিনোদ বিহারী মাহাতোর সভাপতি পদ পাওয়াতে ঝাড়খণ্ডের কুড়মিরা নড়ে চড়ে বসলেন। আন্দোলনের পুরোভাগে উঠে এলেন শিবু সোরেন, শৈলেন্দ্র মাহাতো, নির্মল মাহাতো, অজিত মাহাতো, মনোরঞ্জন মাহাতো, রতিলাল মাহাতো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১৯৮৭ সালের ৮ আগস্ট ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সভাপতি নির্মল মাহাতোর হত্যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঝাড়খণ্ড এলাকাতে এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেল। কিন্তু তার আগে নির্মল মাহাতো দিয়ে গেছে 'আজসু' নামক এক স্বতন্ত্র ছাত্র-সংগঠন, যাঁদের মধ্যে সূর্য সিংহ বেসরার মতো ছাত্র নেতারা যেমন আছেন তেমনি আছেন সুষেন মাহাতো, শুভাশীষ মাহাতো, বাদল মাহাতো, পঙ্কজ মাহাতো, বীরবল মাহাতোদের মতে সুবক্তা ছাত্র নেতারা।

১৯৮৭ সালে ঝুঁঝকা গ্রামে আদিবাসী কুড়মি মহাসভা, বাঁকুড়ার দুঁন্দার গ্রামে, পুরুলিয়ার বিশপুরিয়া গ্রামে এবং মেদিনীপুরের ক্ষেমাশূলী চন্দবিলাতে, বালিগেড়িয়া, ধূমসাই প্রভৃতি স্থানের সভাতে যোগ দিলেন ড. রামদয়াল মুণ্ডা, ড. নির্মল মিঞ্জ, শিবু সোরেন, অমিয় কিস্কু প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও নেতারা। কুড়মিদের একটা বিশাল সংগঠিত অংশ আর এককভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে হড়-মিতান হিসাবে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, ওরাঁওদের হাত ধরে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আন্দোলনে সামিল হলেন। যোগ দিলেন মুসলমান ও খ্রিস্টান নেতারাও। সকলেই সমানভাবে ঝাড়খণ্ডী জাতিসত্তার বিকাশ, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি, জঙ্গল, খনিজদ্রব্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। নব আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণে আজ কুড়মি সমাজের একটি বিশেষ সংগঠিত অংশ পথে নেমে পড়েছেন।

ছোটনাগপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকাতে জাতিসত্তার প্রশ্নে ও তার বিকাশের প্রশ্নে সকল নিপীড়িত মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন। ঝড় উঠেছে। এই ঝড় কাগুজে ঝড় নয়। গণতন্ত্রের ভোটের ঝড় নয়, এ ঝড় স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশ এবং স্বায়ত্তশাসনের ঝড়। কুড়মিসহ অন্যান্য খেটে-খাওয়া 'হড়-মিতান' দেশজ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এইভাবেই দানা বেঁধেছে— যার শেষ পরিণতি আমরা জানি না। হয়তো চরৈবেতি। তাই গোষ্ঠীগতভাবে মাঝারি বুদ্ধির নেতারা যাঁরা অতীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের সামনে আজ বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে নতুন তীক্ষ্ণমেধার নেতৃত্ব। পরবর্তীকালে এক সুসংহত বুদ্ধিজীবীর দল 'ঝাড়খণ্ড বুদ্ধিজীবী মঞ্চ' নামে এক সংগঠন তৈরি করেছেন।

মূল শিকড়ের খোঁজে

ছোটোনাগপুর মালভূমির 'হড়-মিতান' সামাজিক সভ্যতার ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া, নাগেশিয়া, তাঁতি, কামার, কুম্ভার, বেদিয়া, কুড়মি, ডোম, চিকবড়াইক, গহুঁজু, কোরোয়া, ভূমিজ, হো, (কোল) তথা বহু অন্যান্য ছোটো ছোটো গোষ্ঠী, যেমন বাগাল, দেশওয়ালি, পুরাণ, মুচি, ডোম, কোলকামার প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে আজ যে অঞ্চলে তাঁরা স্থানীয় মেচ, রাভা, পোলিয়া, রাজবংশী, টোটোদের সঙ্গে বসবাস করে তীব্র জীবন সংগ্রাম করে এক সামগ্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলেছেন যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে, সেই ভূমিখণ্ডের ভৌগোলিক নাম উত্তরবঙ্গ। কুমার সুরেশ সিং বলেছেন, ছোটোনাগপুরে ইংরেজ কর্তৃত্ব পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসার পর দেখা গেল শুধুমাত্র ছোটোনাগপুর থেকেই অসমে ১৮৭১ সালে ৯৬,০০০ জন দেশান্তরী হয়েছেন। সেটা বেড়ে ১৮৯১ সালে দাঁড়াল ৩ লক্ষ ৩০ হাজার, ১৯১১ সালে ৭ লক্ষ ৭ হাজার এবং ১৯২১ সালে ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার। ড. সিং মন্তব্য করেছেন— 'যদি এই বৃহৎ সংখ্যক লোকসংখ্যা ছোটনাগপুরের নিজ বাসভূমিতে বাস করত তবে কৃষক উচ্ছেদ পদ্ধতি আরও দ্রুত হত।'

এই বৃহৎ সংখ্যক ঘরছাড়া মানুষ কিন্তু আশ্রয় নিল 'আড়কাঠিয়া'দের হাত ধরে সুন্দরবনের জঙ্গলাকীর্ণ জলাজমিতে, নদীয়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও যশোরের নীলকুঠি ও জমিদারদের পতিত জমি উদ্ধারের কাজে। অসমের চা বাগান ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলগুলিতে এবং দেশবিভাগের পর মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে জমি বিনিময় করে আজ তাঁরা জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি ও মালদা জেলাতে এবং অসমের দরং, গোয়ালপাড়া, লখীমপুর ও কাছাড়, দরং, ডিব্রুগড় জেলাতে বসবাস করছেন। ১৮৮৪ সালের একটি তথ্য থেকে জানতে পারা গেছে যে, সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে আড়কাঠিয়া মারফৎ অসম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানের সমস্ত শ্রমশক্তির মধ্যে অসমের শ্রমিকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫.৫ এবং সাঁওতাল পরগনা ও ছোটোনাপুরের শ্রমিক ছিল ৪৪.৭ এবং বৃহত্তর বাংলা প্রদেশের শ্রমিকের হার ছিল শতকরা ২০.৬ জন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য প্রাকৃতিক কারণে মানভূম জেলাসহ সমস্ত ছোটোনাগপুর মালভূমি এলাকাকে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক এলাকা করে রাখার ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা থাকার জন্যে এবং ব্রিটিশ পুঁজি ও তৎকালীন উচ্চবর্ণের জমিদারদের ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সহায়তায় চা বাগানে চা উৎপাদন ব্যবসার জন্যে সস্তা ও বাধ্যতামূলক শ্রমিকের হাজারে হাজারে প্রয়োজন ছিল। আজও পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, রাঁচী হাজারিবাগের মানুষের কণ্ঠে এখনও একটা ঝুমুর গান শুনতে পাওয়া যায়—

চল মিনি আসাম যাব
জড়া পাঁখা টানাব
কানের তলে মাছি করে গান
হায় গঙ্গারাম ফাঁকি দিয়ে
পাঠালি আসাম।
*　　*　　*
সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরি আন
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম
রে যদুরাম ফাঁকি দিয়ে
পাঠালি আসাম।

কিন্তু এই ভাবে সংগঠিত উপায়ে ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে কৃষক উচ্ছেদ কেন? সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে, সস্তা শ্রমিকের বিনিময়ে (Human Cattle) অনেক বেশি মুনাফাই ছিল সেদিন মালিকদের কাম্য। কিন্তু ছোটোনাগপুরেও তো কাজ ছিল। ছোটোনাগপুরের লোহা, কয়লা প্রভৃতি খননের জন্যে কিন্তু সস্তা শ্রমিক এল বিলাসপুর, সুন্দরগড়, ছত্তিশগড়, রাইপুর এলাকা থেকে, অন্যদিকে, চা বাগানে প্রচুর সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন। কৃষক উচ্ছেদের নব নব প্রথা ও পদ্ধতি, সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ, মহামারী তাদের দেশছাড়া করল।

ব্র্যাড্‌লেবার্ট বলেছেন—

> 'Manbhum is the land of cultivator, the coolie and the Bhumij Kol– the cultivator pursuing the dull round of daily life and fighting with each recurring season the battle of existence; the coolie hurrying or hurried on through the Gateway of Chotanagpur to dreams of exile or the reality of better wages beyond which ever his mind may choose to dwell upon.'

দেশান্তরে অতীত চিহ্ন

ছোটোনাগপুর মালভূমি বহু ইতিহাসের সাক্ষী। এই অঞ্চলের সামগ্রিক সৃষ্টি বহু বিচিত্র লোকসংস্কৃতির বহু ঐতিহ্যপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান বাসিন্দারা এখনও নানা ভাবে পালন করেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে 'কুড়মি-মাহাতোদের সামাজিক গতিশীলতার' উপর গবেষণা করার সময় ময়ূরভঞ্জের পলাশবধা গ্রামের গ্রাম্য বধূ গোলাপী মাহাতোর কাছ থেকে একটি ঝুমুর গান সংগ্রহ করি। গানটি নিম্নরূপ—

হাঁসা রাজার কাঁসা সিংহ
চড়ল বিষণ সিং (ঝড়গ্রামে— অচল সিং)
এ হো মলভূঁই এ সাজলে লড়াই
মলভূঁই এ মারগেল রাজা হো বিষণ সিং
পগড়ী অ্যাইলরে নিশান যে।
পগড়ী দেখে রানি ভাঙ্গে আম ডালগো
পগড়ি লেকে সতী-যাব যে
কাঁহা ছুটল মর, হাঁসা রাজার ঘোড়ারে
কাঁহা ছুটল মর ঢাল তলোয়ার
সড়পে ছুটল মর হাঁসা রাজার ঘোড়া গে
রণে ছুটল মর ঢাল তলোয়ার
কৈসে ভিজল মর হাঁসা ঘোড়ার ঘোড়া যে
রণে ভিজল মর ঢাল তলোয়ার
শিশিরে ভিজল মর হাঁসা রাজার ঘোড়া গো
রক্তে ভিজল মর ঢাল তলোয়ার।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলার ভাসার ডাবরী গ্রামের (পো-দক্ষিণ ধলকর) রমেশ মাহাতো ও দুলাল চন্দ্র মাহাতোর কাছ থেকে একটি বন্দনা পরবের ঝুমুর গান সংগ্রহ করি ১৯৮০ সালে। গানের কথাগুলি নিম্নরূপ—

চড়ে লাগল ঘোড়া, চমকে লাগল জিন
রাজা যাইবে রণ, হাঁসা রাজার ঘোড়া হো।
বিষণ সিং।
রাজা যাইবে রণ ঢাল— তলোয়ার
রাজাকে যুয়ুয়া যাইবে হাঁসা রাজাক ঘোড়া হো
লড়াইয়ে যাইবেক মর ঢাল-তলোয়ার।
কথি ভিজল হাঁসা রাজার ঘোড়া,

কথি ভিজল বান হাঁসা রাজাক ঘোড়া
কথি ভিজল ঢাল-তলোয়ার।
তারমে ভিজল রণে, হাঁসা রাজার ঘোড়ারে
রকতে ভিজল ঢাল-তলোয়ার
কাঁন্দে লাগল খয়রো রানি
নৈয়নে বহে লর
সিঁথাকে সিন্দুর রানি
দৈবে জরি লেল।

এই দুটি গানই আসলে একই ব্যক্তি ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চূয়াড় বিদ্রোহের নায়ক বিষণ সিং (অচল সিং, বিশ্বনাথ শাহী কিংবা গোপাল সিং)-এর স্মৃতিতে এই গান। মূল ভূমিখণ্ডে অর্থাৎ ছোটোনাগপুরের এই গান আমি বহু চেষ্টাতেও পাইনি, পাইনি এর সূত্র। কিন্তু নব অভিবাসনের ফলে দেশান্তরী মানুষগুলো আজও ছোটোনাগপুরের সেই স্মৃতিকে এখনও মনে রেখেছেন। একে আমরা বলি স্মৃতিহরণ বা Memocide।

রাজশাহীর নীলকুঠির কিংবা জলাজমি আবাদ করার কাজে এখনও ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি অঞ্চলে যে গান শুনতে পাওয়া যায়, তারই ক্ষীণ রেশটুকু এখনও এই দেশান্তরী মানুষগুলোর মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

শালুক লাড়ার অ'টার দড়ি
হাল ধরতেই পড়ে মরি
বাবুর মা বাবুর মা
আজ হামকে ভখেই মরালি
নীল লোটা ক্যাটে ক্যাটে
হাথ গেল ফ্যাইটে হে
খঁখার বাপ খঁখার বাপ
দেন টুকু কাঁচা হল্যদ বাঁটে।
[সংগ্রহ— ফণিভূষণ মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী, গ্রাম + পো— শিকারপুর, জেলা— নদিয়া]

পশ্চিম দিনাজপুরের জামালপুর অঞ্চলে যে সমস্ত মাহাতো বসবাস করেন, ঝালদার এক জনসভাতে তাঁদের কাছেই শুনলাম যেন গানটির পরবর্তী অংশ—

দাদন দেল হপ্‌কী সাহেব
দশ টাকা লেল হেঁ

মহাজনেক বহাল খেতে
করহি লীল চাষ হে

অসমের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে শুনলাম, গানটির পরের অংশ—

শিখরের আকালে
শিয়াল কুকুর কাঁদে হে
পিয়াল পাকা, বাবুর বাপ
দেন দুটা পিয়াল পাকা প্যাড়ে হে।

ছোটোনাগপুরে শিখরদেশ (এখন দ্বিখণ্ডিত মানভূম জেলা) তাঁদের স্বপ্নের বিচরণভূমি। আদিপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে তাঁরাই একদা পৌছেছিলেন ঢাকার কুর্মিটোলাতে। কিংবা কোকিলামুখসহ অসম ও উত্তরবঙ্গের অসংখ্য চা বাগানে। অথবা নদীয়া জেলার সীমান্তে কিংবা সুন্দরবনে।

টুসু, করমা, বড়বাহাড় দেবদেবীর আশ্রয় হারিয়ে, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে, মহাজনের ঠিকাদারের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে এক অনিশ্চিত পথে যাঁরা পা বাড়িয়েছিলেন আজ তাঁরা নিজদেশে পরবাসী। কিন্তু করম নাচের আখড়াতে কোনো বয়স্কা রমণী যদি সত্যিই গেয়ে উঠে—

করম কাটি আনি
আখড়া থাপনা করি
আখড়া থাপনা ব্রজের নারী
আজ রে করমের বাতি।

কিংবা, তাঁরা এখনও গেয়ে চলেছেন—

আজরে করমঠাকুর
খার দুয়ারে।
কালরে করমঠাকুর
শাঁখ নদীর পারে।
*   *   *
আজরে করমঠাকুর
ঘার দুয়ারে
কালরে করমঠাকুর
কাঁস নদীর পারে।

কোথায় শঙ্খ, কোয়েল, কনহর, কাঁসাই, দামোদর, সুবর্ণরেখা, বৈতরণী ? নূতন বসতির নেশায় পাগল সভ্যতার আদিম মানুষগুলি তিস্তা, মহানন্দা, ইছামতী, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা দেখেছে। দেখেছে তাদের আশ্চর্য সুন্দর ভয়াল ভয়ংকররূপ, কিন্তু তাঁদের মন ভরেনি। ছোটো শুষ্ক, অজীর্ণ যুবতী কাঁসাই আর শঙ্খ নদী তাঁদের সামগ্রিক গোষ্ঠীসত্তার সমগ্র সৃজনশীলতাকে এমন আবিষ্ট করে রেখেছে যে তাঁদের লোকায়ত ও ব্যবহারিক জীবনে গঙ্গা, পদ্মা, তিস্তা, ইছামতী, মহানন্দা যেন এখনও জায়গা করে উঠতে পারেনি।

উত্তরবঙ্গেও বাঁদনা (সোহরাই) উৎসব আছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহাতোরা কালীপুজোর অমাবস্যার রাত্রিতে গান করে, গো-বন্দনার গান। সে গানে কেমন আড়ষ্টতা এসে গেছে। সুন্দরবনে, রাজশাহীতে, চা বাগানে তাঁরা যখন সমবেতভাবে নাচ-গান করতেন তখন গোষ্ঠীচেতনা থেকে ব্যক্তি-চেতনার উত্তরণে অভ্যস্ত ভদ্রলোক বাবুরা তাঁদের 'বুনো' বলত। আজও 'বুনো' শব্দটি তাঁদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় জেনে তাঁদের মধ্যে থেকে তরুণ শিক্ষিত ছেলে গান-নাচ প্রকাশ্যে করতে রাজি নয়। সামগ্রিক সৃজনশীলতার উপর, পরিবেষ্টিত হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের জাতিভেদ প্রথা থেকে উদ্ভূত 'বাবু সমাজ' বা 'ভদ্রলোক সমাজ' এদের উপর এক সুপরিকল্পনা মারফত যৌথ হীনম্মন্যতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। হিমালয়ের ওজনের চেয়েও ভারী মনে হয় তাঁদের কাছে এই মানসিক বোঝা। যেন এই হীনম্মন্যতা তাঁরা আর কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

তীব্র মানসিক সংকট, সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ কয়েক লক্ষ মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বাতন্ত্র্যতার খোঁজে এক বদ্ধ অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা সহজেই বলতে পারি সাংস্কৃতিক নির্বাকায়ন বা Cultural Silence। চাকরি থেকে এরা বঞ্চিত, লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, জমিতে জল সেচের অভাব, রিফিউজি হিসেবে সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত এরা। আদিবাসীদের সুযোগ লাভে বঞ্চিত মাহাতো গোষ্ঠীর তরুণ বুদ্ধিজীবীরা। শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা আজ পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ যখন এরা এই নয়া বসতি বেছে নিয়েছিলেন তখন থেকে মাহাতোরা ১৯৩১ খ্রি. পর্যন্ত আদিবাসী সূচিতে জায়গা পেয়েছিলেন।

ছোটোনাগপুরের কুর্মি-ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ঢেউ অসম ও উত্তরবঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর কারণ হিন্দু মহাসভা ও আর্য সমাজের সংস্কার আন্দোলন। কিন্তু যাঁরা কৃষক হিসেবে উচ্ছেদ হয়ে নববসতি গড়ার খোঁজে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ যেমন জঙ্গল কেন্দ্রিক জীবিকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তেমনি

কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে ভূমি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিলেন। তৎকালীন নেতারা পৈতা নিয়ে জাতে উঠতে চাইলেন, কিন্তু হিন্দু বর্ণাশ্রমে তাঁদের স্থান নিতে হল একেবারে নিচের তলাতে। ফলে সবচেয়ে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ল হীনম্মন্যতা। সামগ্রিক গোষ্ঠী সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ যে উৎসবে, নাচে, গানে তা রুদ্ধ হয়ে গেল। সৃজনশীলতার কোমল অংশে পড়ল লোহার সামাজিক আবরন, নতুন কিছু সৃষ্টি হল না। সংগ্রামী ঐতিহ্য ভুলে যেতে লাগলেন তাঁরা এই প্রক্রিয়াই হল Memocide বা স্মৃতিহরণ প্রক্রিয়া। পরিবেষ্টিত হিন্দু সমাজের কাছ থেকে এরা নিতেও পারল না তাঁদের সৃষ্ট রূপ, রস ও মাধুর্য। জল সেচনের অভাবে কিংবা ধানের শিকড়ে পোকা ধরলে যা হয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের মাহাতো সমাজের মধ্যে নব নব সৃষ্টির বাতাবরণ না থাকাতে একটা গোষ্ঠী সাংস্কৃতিকভাবে সম্পূর্ণ অধঃপতিত হয়ে যেতে লাগল। সাংস্কৃতিক নির্বাকায়ন (Culture of Silence) প্রক্রিয়া চলছে আজও। অথচ এমন তো হবার নয়। এখনও তাদের যা আছে তা যদি আবার পূর্ণ জাগরণ করা যায় তবে এই গোষ্ঠী বাঁচবে। বাঁচবে তাঁর নিজস্ব গুণে। তাদের সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই এই রস এখনও আছে। তাঁরা তাঁদের গোত্র, শাঁখওয়ার, পুনুড়িয়া চঁছমুত্রা, কাটিয়ার, চিলবিঁধা, বানোয়ার, হিন্দোয়ার ইত্যাদি এখনও ভুলে যাননি। এখনও তাঁদের বিয়েতে গান হয়। এখন কোনো কোনো বয়স্ক মানুষ গেয়ে উঠেন—

কাঁহা মালিন বাজে, জোড়ারে ধমসা
শুন মালিন গে
কাঁহা মালিন বাজে করতাল
আখড়াহি বাজে জোড়ারে ধমসারে
রাজা ঘরে বাজে করতাল।
কৈসন কৈসন বাজে জোড়ারে ধমসা
কৈসন কৈসন বাজে করতাল
শুন মালিন গে
হিকিড়-গিড়িম বাজে, জোড়ারে ধমসা
শুন মালিন গে
ছুমুর ছুমুর বাজে করতাল
মধুমাসে বাজে করতাল।

পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দার্জিলিং এলাকাতে বাঁন্দনা পরবের এই গানগুলি এখনও শুনতে পাওয়া যায়।

আশ্বিন বাহরাতে, কার্তিক সামাতে
পড়ি গেলা অমাবস্যার রাতিরে
পড়ি গেলা অমাবস্যার রাতিরে
জাগো মা লক্ষ্মিনী, জাগো মা ভগবতী
জাগে তো অমাবস্যার রাতি।

বাঁন্দনা পরবের সময় গুরুর বিশেষ পরিচর্যা হয় উত্তরবঙ্গেও—

ভালা অহিরে, তুঁই যে কহথি
কপিলা
হামার বড় দুঃখরে
হামি তো দেখি বড় সুখরে
দুরারেহি দেখি ভালা
চন্দনা ছড়াগো
গোহালে তো দেখিহি কাটা ঘাস।

উত্তরবঙ্গের 'মৈযাল' তথা মাহুতদের গানের সঙ্গে মাহাতো ও সাঁওতালদের সোহরাই উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। দু-একটি সোহরাই বা বাঁন্দনা গানের নমুনা তুলে ধরলে তার সমৃদ্ধির কথা বুঝতে পারা যাবে।

কনেতো চরে ভালা গুডুকি গুডুকি বাবুহো
কনেতো চরে ভালা কানঠাড়ারে
কনেতো চরে ভালা চমকি চমকি
কনেতো চরে নিরালায়?
অহিরে, গুডুকি চরে ভালা গুঁড়ুররে বাবুহো
শশা যে চরে ভালা কানঠাড়ারে
হরিণী তো চরে ভালা চমকি চমকি রে
বাঘাবাঘীন চরে নিরালায়।

অর্থাৎ কে ছোটো পা ফেলে (গুঁড়কে) চরে বেড়ায়, কে চরে বেড়ায় কোনো সতর্ক রেখে, কে চরে বেড়ায় চমকে চমকে, কে চরে বেড়ায় নিঃশব্দে? ছোটো তিতির চরে বেড়ায় গুঁড়কে গুঁড়কে, শশক (খরগোশ) চরে বেড়ায় কান সতর্ক করে দেয়, চমকে চমকে হরিণী চড়ে বেড়ায়, বাঘ ও বাঘিনী নিঃশব্দে চরে বেড়ায়।

জঙ্গল কেন্দ্রিক আদিবাসী জীবনে জঙ্গলের পশু-পাখিও তাঁদের গানে চলাফেরার প্রতীক। কিন্তু তাঁদের প্রিয় গৃহপালিত জন্তুগুলিই যেন অলংকরণে শ্রেষ্ঠ।

কনকা শিং ভালা, আঁকুচা-বাঁকুচা বাবুহো
কন শিং তরল বাঁশ হো
কন শিং ভালা কান পেটে ঘুরে
কনকা শিং ছাতুয়া ?
অহিরে মৈষিনকা শিং আঁকুচাই বাঁকুচাই বাবুহো
কাড়ুয়া কা শিং তরল বাঁশ
ভেড়য়াকা শিং ভালা কান পেটে ঘুরাই
হরিণীকা শিং ছাতুয়া।

অর্থাৎ কার শিং এঁকে বেঁকে থাকে, কার শিং বাঁশের মতো সোজা, কার শিং কানের কাছ দিয়ে পেটের দিকে চলে যায়, কার শিং ছাতার মতো ? মৈষীনের (স্ত্রী মহিষ) শিং আঁকা বাঁকা, কাড়ুয়ার (কিশোর মোষ) শিং বাঁশের মতো সোজা, ভেড়ার শিং কানের কাছ থেকে পেটের দিকে চলে যায়, হরিণের শিং ছাতার মতো।

পার্থিব সম্পদ সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য মাহাতো মেয়ের ধারণা বাঁন্দনা গানে আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

অহিরে কনেত দেইত মালীন ঝিরিহিরি শাড়িয়ারেই বাবুহো ?
কনেত ধেনুগায়, কনেত দেইথ মালীন দুইকানে সনা ?
কনেত দেইত সিঁথাকে সিন্দুর ?
অহিরে মায়ত দেইত মালীন ঝিরিহিরি শাড়িয়েই বাবুহো
বাপত দেইত ধেনু গাই, ভায়ত দেইত ভালা
দুয় কানের সনা,
পরের বেটায় দেইত সিঁথায় সিঁন্দুর
ছিঁড়ি ফাটি যাইত মালীন ঝিরিহিরি শাড়িয়েই বাবুহো
মরে-হারে যাইত ধেনু গাই
বিকি-কিনি খাইত মালীন দুয় কানের সনা
যুগে যুগে রহি যাইথ সিঁথাকে সিঁন্দুর।

অর্থাৎ বান্ধবী (মালীন) আমার, আমাকে কে দেয় ঝিরিহিরি শাড়ি, কে দেয় ধেনু গাই, কে দেয় কানের সোনা, কে দেয় সিঁথিতে সিঁন্দুর ? বান্ধবী আমার, মা আমাকে শাড়ি দেয়, বাবা দেয় আমাকে ধেনুগাই, দাদা-ভাইরা দেয় কানের সোনা, পরের বেটাতে দেয় সিঁথিতে সিঁন্দুর। মায়ের দেওয়া ঝিরিহিরি শাড়ি ছিঁড়ে-ফেটে যেতে পারে, বাবার দেওয়া গরু মরে যেতে পারে, ভাইদের দেওয়া সোনা বিকে-কিনে খেতে পারি, কিন্তু যুগ যুগ ধরে পরের বেটার দেওয়া মাথার সিঁন্দুর থেকেই যাবে।

ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসেছে গভীর অরণ্যের বুকচিরে 'দ্যাঁওয়াসিয়া' নদী। অর্থাৎ দেবী মহামায়ী নদী। ভুটানের পাদদেশ থেকেই গোয়ালপাড়ার বনবিভাগের সীমানা। তরাই-এর অন্যান্য অঞ্চলের মতো গভীর চির শ্যামল অরণ্যের মাঝে আজ বহু ছোটোনাগপুরের অধিবাসীদের বসবাস। লোকসংগীতের বর্ষীয়ান শিল্পী নীহার বড়ুয়া মন্তব্য করেছেন 'গোয়ালপাড়া জেলা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ভাগে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি অসমের অন্তর্ভুক্ত হলেও ওখানকার ভাষাকে অসমিয়া ভাষা বলা চলে না। শতবর্ষ পূর্বে এটি উত্তরবঙ্গেরই অংশ ছিল। বর্তমানে অসমের অন্তর্ভুক্ত হলেও ওখানকার ভাষা বা সংস্কৃতির এতকাল কোনো উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেনি। রংপুর ও কুচবিহারের সীমানাতে অবস্থিত এই অঞ্চলটির কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও তার উচ্চারণভঙ্গিও উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলিরই প্রায় অনুরূপ। এই ভাষাকে কোচ-রাজবংশী ভাষা বলে বর্তমানে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার বহু ধনী ও ভদ্র পরিবার বহুকাল যাবৎ জমিদাররূপে কিংবা ব্যবসা সূত্রে উত্তরবঙ্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁরা নিজেদের উত্তরবঙ্গবাসী বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ভাষা বা কৃষ্টি ওই সমাজে অপ্রচলিতই রয়ে গিয়েছে। তাঁদের কথা ভাষা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিলিতরূপ নিয়ে অন্য একটি রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁরাই স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষা ও লোকদেরও— (পূর্ববঙ্গবাসীদের, হয়তো ব্যঙ্গ করেই যেমন 'বাঙ্গাল', পশ্চিমবঙ্গবাসীদের যেমন 'ঘটি' বলা হয়) 'বাহে' বলে উল্লেখ করে থাকেন। তা থেকেই মনে হয় 'বাহে'-র উৎপত্তি। 'বা-হে' অর্থাৎ বাবা-হে। সম্বোধনকালে পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গে 'ও গো' বা 'ও হে' বলা হয়, উত্তরবঙ্গে গ্রাম্য কথাতে 'বাহে' বলাই ভদ্রতা এবং সম্মানসূচকও বটে।'

ছোটোনাগপুরের অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানসূচক ও ভদ্রতাযুক্ত সম্বোধন হচ্ছে 'ব'। যেমন, হে ব খুড়া কাঁহা যাওয়থিন। মামা-ভাগ্নে, কাকা, জ্যেঠা, পিসে, মামা, মেসো সকলেই ভাইপো ও ভাগ্নাদের পরস্পরের সঙ্গে 'ব' কথাটি ব্যবহার করেন। সুতরাং, উত্তরবঙ্গের ছোটোনাগপুরের কুড়মি মাহাতোদের মধ্যেও সেটা প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের 'মাহুতবন্ধুরে' গানগুলির পাশাপাশি ছোটোনাগপুরের এই নববসতি করা মানুষরা 'ডোমকচ', গানের সুরের রেশ এবং কথা আজ সুন্দর ভাবে ধরে রেখেছেন।

রিমিঝিমি রিমিঝিমি মেঘ বরযে হায়রে
রিমিঝিমি রিমিঝিমি
মেঘ বরযে হায়রে, বরযার সুরেরে কদম ফুল ফুটে
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি চাঁদ চমকে হায়রে

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি
শরত সরসীরে শালক ফুল ফুটে
ঝলঝল ঝলঝল শিশির ঝলকে হায়রে
শিশির সময়োরে হলদি গেঁদা ফুটে।
শিরিশিরি শিরিশরি শীতুয়া বাতাস হায়রে
শিরিশিরি শিরিশিরি
রঙ্গ ঝলকায় হায়রে শিমূল ফুল ফুটে।

পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি যে অঞ্চলেই মাহাতো, ভূমিজ, ওরাঁও, মুণ্ডারা বসবাস করেন, সর্বত্র বিবাহের গান শুনতে পাওয়া যাবে।

এক পেটে জনম ভাইরে বহিনরে
ভাইরে হাঁকরি খাওলে মায়ের দুধ।
তর যে লেখা ভাইরে দেশপতি রাজারে
ম্যর লেখা পরের ঘর।
হামি কি লিখেছে বহিন
বিধাতাই কি লিখেছে রে,
বহিন, বিধাতাই লিখেছে পরের ঘর।
তর যে লেখা ভাইরে দহি-দুধ ভাতরে
ভাইরে ম্যর খাওয়া গুন্দলি কি ভাত।
তর যে শুয়া ভাইরে অলংকার পালঙ্করে
ভাইরে ম্যর শুয়া গুন্দলিকে পুঁয়াল।
তর যে সিনান ভাইরে চুয়া চন্দন জলে
ম্যর সিনান ভাইরে ব্যাঙ পচা জল।

অর্থাৎ একই পেটে ভাই ও বোন জন্ম নিলাম। ভাই, তুমি মায়ের দুধ জোর করে খেলে (হাঁকরি— হাভাতের মতো)। তোমার ভাগ্যে দেশপতি রাজা হবার কথা, আর আমার ভাগ্য পরের বাড়ি। বোন, আমি তো আমার ভাগ্য লিখিনি, লিখেছে বিধাতা। বোন, বিধাতাই তোমার ভাগ্যে পরের ঘর লিখেছে। ভাই, তোমার ভাগ্যে দহি-দুধ ভাত আর আমার খাওয়া শুধুমাত্র গুঁদলির ভাত। ভাই, তোমার শোওয়া কারুকার্য খচিত পালঙ্কে, আমার শোয়া গুন্দলির খড়ে। ভাই তোমার স্নান হবে চন্দন সুগন্ধিত জলে আর আমার স্নান ব্যাঙ পচা জলে।

অন্যদিকে 'মদেশিয়া' বা 'সদরি' ভাষা ছোটোনাগপুরের নাগপুরিয়া, কুর্মালি ভাষারই অনুরূপ। একই ভাষা। একই মানুষ। 'রাজবংশী' ভাষার প্রভাব এতে পড়তে আরম্ভ করেছে।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা ব্যাপক গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে চারুচন্দ্র সান্যাল, সুধীরকুমার করণ, পবিত্রকুমার গুপ্ত, মনীষ রাহা, বিক্রমকেশরী রায়বর্মন, বিশ্বনাথ জোয়ারদার, শিশিরকুমার মজুমদার, বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, প্রদ্যোত ঘোষ, বিমলেন্দু দাম, নির্মলেন্দু ভৌমিক, হরেন ঘোষ, নির্মল দাশ, অচিন্ত্য গোস্বামী, পি. কে. দাশগুপ্ত, এ. কে. দাস প্রমুখ। কিন্তু উত্তরবঙ্গে 'আদিবাসী' সংস্কৃতি খোঁজার ভিড়ে আরেক দল মানুষ যাঁরা আদিবাসী সূচিতে স্থান না পেয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন তাঁরা কিন্তু ছোটোনাগপুরের মাহাতো। এখন উত্তরবঙ্গই যাঁদের বাসভূমি। বিবাহের সময় কুর্মালি ভাষাতে আরও বহু গান তাঁরা করেন—

কলস স্থাপনের গীত। (যা ছোটোনাগপুরে ছামড়া বাঁধা গীত)

সাতশয় কৌয়া মাগো বাজনা বাজায়
গীধরানি চাঁওয়ারা ডোম ডোলায়
মুড় কাটিয়ে আজা কলসা ধরায়
রকতাহি চৈখা পুরায়
কোনে আনি দেতউ ধানাকর বাইল
কোনে আনি দেতউ আম কের ডাইর
সুগা আনি দেতও ধলেকর ডাইর
পালো আনি দেতও আম কের ডাইর।

বর বিয়ে করার জন্যে গাড়ি নিয়ে যাবে তখন তাঁকে গান গেয়ে পাত্রী পক্ষের মেয়েরা আশীর্বাদ করে ঘরে নিয়ে যাবে—

পূর্বা পশ্চিম সে আইলরে জাহাজা লাগল দুয়াইর
ঘরসে বাহারুল সাইস আপনা
পিয়হুঁ পিয়হুঁ এলো জুড়ি পান।
কৈসে পিয়াব সার্গো এহো জুড়ি পান।
কৈসে চিনহ্বন দুল্হা আগে তোহার
পাকল দরিহয়া সাসো আজা হামার।

যখন বর বিয়ে করে বাড়ি ফিরবে তখন বর-বাড়ির মেয়েরা গান ধরবে—

ঘরসে বাহারালা সাইস আপনা
বেটা কেতনা দহেজ
ভূখা ঘরের বেটি মাগো কহলো না যায়
মায়গো ছুছে জাহাজ

ধনী মর সুন্দর
মায় গো চলেকে সুন্দর
মায়গো বুলেকে সুন্দর।

কিন্তু উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী কিংবা অসমে বসবাসকারী চা বাগানের কুলি ছোটোনাগপুরের মানুষদের কী অবর্ণনীয় দুঃখ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তার বিবরণ আমরা ১৮৮৪ সালে পেয়েছি। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তাঁর 'Slavery in British Dominion' গ্রন্থে বিখ্যাত চার্লস ওয়েব বনাম বুধন বেঙ্গলির মোকদ্দমার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়— "The history of the Webb case is this : Charles Webb, the Agent of the India General Steam Navigation Company at Kokilamookh in the Jorhat Sub-division in Assam, was in the charge of a flat belonging to the Company on which passengers are accommodated. A batch of coolies had arrived at Kokilamookh on Saturday, the 12th of April, and they were on board the flat on the night of Saturday and also on Sunday the 13th April. On the following day one of these coolies, named Buddhan went to Jorhat and filed a complaint in the Assistant commissioner's Court to the effect that on the previous night his wife had been forcibly taken away and dishonoured by the 'Sahib' at Kokilamookh and that on his objecting he was assulted by the 'Sahib'." ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে সাহেবের পাশবিক অত্যাচারে বুধনের স্ত্রী শুকুরমণি মারা যায়। যদিও সরকারি দলিলে লেখা হয়েছিল মৃত্যুর কারণ— 'Apparently from the effect of diarrhoea'. ওয়েব মোকদ্দমার মূলবাদী বুধন তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন— 'আমার নাম বুধন, পিতার নাম মেগু, জাতিতে পুরাণ। বাড়ি পুরুলিয়া জেলা। বর্তমানে আমি লুলুংগুড়ি চা বাগানের কুলি।' বুধনের কথামতো জানতে পারা যায় যে, 'আমরা কোকিলামুখে পৌছোই শনিবার। রবিবার সন্ধ্যাবেলা আমি এবং আমার স্ত্রী শুকুরমণি, শ্রীমতী এবং তাঁর স্বামী জাহাজের পাটাতনে বসেছিলাম। সেই সময় বেনুধর নামে এক খালাসী এসে আমাকে জানায় যে 'সাহেব আমার স্ত্রীকে চাইছে'। আমি বলি তা কী করে সম্ভব। তাঁরা সাহেবকে সব কথা বলে এবং সাহেব বের হয়ে এসে আমাকে বেল্ট দিয়ে মারতে থাকেন। আমার বাবা মেগু সাহেবকে বাধা দিতে গেলে সেও সাহেবের হাতে প্রহৃত হন এবং একজন খালাসী আমার স্ত্রীকে সাহেবের কেবিনের মধ্যে জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। আমি এবং আমার বাবা ডেকের উপরে প্রচণ্ড মার খেয়ে পড়ে থাকি। পরের দিন সকালে রক্তাক্ত কাপড়ে আমার স্ত্রী পেটের উপর হাত দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে আসে।... আমার স্ত্রীর কয়েক দিন আগে মাসিক

শ্রাব হয়েছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতে সাহেব তাঁর ওপর বলাৎকার করে। আমার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কোনো দৈহিক মিলন হয়নি।'

শুকুরমণির উপর বলাৎকার ও মৃত্যুর মোকদ্দমাতে সাক্ষী ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে শ্যাম ছিলেন অন্যতম। শ্যামের বাড়ি ছিল পুরুলিয়াতে এবং তাঁরা ছিলেন জাতিতে ডোম। তাঁর জবানবন্দীতে শ্যাম বলেছিল— রবিবার সন্ধ্যাবেলা জনৈক বাবু ও একজন খালাসী জাহাজের পাটাতনে এসে বলে তোমার একজন মেয়ে সাহেবের জন্যে দরকার। আমরা আমাদের সম্মান কোনোমতেই খোয়াতে রাজি না হওয়াতে সাহেব খবর পেয়ে বুধন ও মেগুকে মারধর করে। তারপর অভিযুক্তবাবু ও দুজন খালাসী শুকুরমণিকে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে সাহেবের কেবিনে ঢুকিয়ে দেয়। পরে 'বাবু' ও খালাসী দুজন আবার ফিরে এসে ছোটো সাহেবের জন্যে আমার স্ত্রীকে চাইতে থাকলে ছোটো সাহেব নিজেই আপত্তি করলে, আমরা ঘুমুতে যাই। শুকুরমণির চীৎকার ঘরের দরজা ভেদ করে আমরা শুনতে পেলাম— 'মাগো আমার পেট গেলো'। শুকুরমণি ভোরে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। পেটের যন্ত্রণাতে, কাতরাতে কাতরাতে সে পরে মারা যায়।

শুকুরমণির উপর বলাৎকার, পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে আসামী চার্লস ওয়েব-এর মাত্র ১০০ টাকা জরিমানা হয়, আসামী বাবু বেনুধর দত্তের কোনো সাজাই হয়নি। কারণ জোড়াহাটের অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন হরিচরণ সেন শুকুরমণির মৃতদেহকে ময়না তদন্ত করে বলেছিলেন, 'I am of opinion that she died of natural cause. I carefully examined the private parts, they were normal and no sign of violence appeared.' যদিও উক্ত মোকদ্দমার আরেকজন সাক্ষী শ্রীমতী ডোম, যিনি পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থেকে চা বাগানে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী শ্যামের সঙ্গে, বলেছিলেন, 'We were sitting on one bed and Shukurmani was sitting on hers when the Babu and Khalasi dragged her off. The Sahib sat down too and then went in the cabin when the Babu and the Khalasi put Sukurmoni in, she was crying. We did not interfere. The accused Mr. Webb shut the door and the Babu stood outside peeping.'

নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে শুকুরমণির ইজ্জতের জন্যে সেদিন ছোটোনাগপুরের কুলিরাও যে লড়তে পারে তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ বুধন পুরাণের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার। সেই সঙ্গে সাহেব, বাবু আর খালাসিরা যে কত ভয়ংকর ছিল এখনও তা চা বাগানের গানে প্রতিফলিত।

সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরি আন

সাহেব বলে লিব
পিঠের চাম
রে যদুরাম ফাঁকি দিয়ে পাঠালি আসাম।

স্বাধীনতার আগে ১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজ সমগ্র বাংলাদেশকে আলোড়িত করেছিল। তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তৎকালীন বাংলাদেশের উনিশটি জেলায়। আন্দোলনের প্রধান এলাকা ছিল উত্তরবঙ্গ রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা আর ২৪ পরগনা জেলার আবাদ এলাকা। ওই সব এলাকাতেই জোতদারী শোষণ ছিল তীব্র আর বর্গাদারের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। পুলিশ, জোতদার এবং তাদের গুণ্ডাবাহিনী আধিয়ারদের সংগঠিত শক্তিকে দমন করার চেষ্টা করে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুরাওয়ার্দি ২৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভাতে স্বীকার করেন যে, দিনাজপুর জেলার খাঁপুর গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ ১২১ রাউন্ড গুলি চালালে ওই গ্রামের ২০ জন নিহত হয়। এর মধ্যে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। চিরির বন্দর থানার বাজিতপুর গ্রামে ৪ জানুয়ারি ১৯৪৭ ভোরে পুলিশ খেতমজুর সমিরুদ্দিনের বাড়ি ঢুকে তাকে জোর করে ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে যায়। হৈ হল্লা শুনে আশপাশ থেকে অনেক লোক জড়ো হয়। সাঁওতাল কৃষক যুবা শিবরামও এসেছিলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ সমিরুদ্দিনকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে শিবরাম হাতের তির ধনুক চালান হত্যাকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে। শীতকালের ভোরে মোটা ওভারকোট পরা সত্ত্বেও তির সেই পুলিশের হৃৎপিণ্ডে গেঁথে যায়। তারপর অন্য একজন পুলিশ শিবরামকে গুলি করে।

ছোটোনাগপুর থেকে আগত যে সমস্ত আদিবাসী উক্ত তেভাগা আন্দোলনে শহিদ হন তাঁরা হলেন— হপন মাণ্ডি, সরেন মাঝি, দুখনা কোলকামার, পুরনা কোলকামার, ফাগুয়া কোলকামার, ভোলানাথ কোলকামার, নারায়ণ মুর্মু, মাকটু সিং, নেন্দিলী সিং। শেষোক্ত দুজন বাদ দিয়ে সকলেই ছিলেন খাঁপুর গ্রামের এবং শেষোক্ত দুজন ছিলেন ঠুমানিয়া গ্রামের, জেলা দিনাজপুর। অন্যদিক ২৪ পরগনা জেলার বেড়মজুর গ্রামের রবিরাম সর্দার, পাগলু সর্দার, বৈরা সর্দার এবং ছোটো আজগড়া গ্রামের রতিরাম সর্দার শহিদ হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছোটোনাগপুরের মানুষরা এই উত্তরবঙ্গে এসেও অংশ নিয়েছিলেন— তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য খঁচাকান্দর গ্রামের জিতু সাঁওতাল, রাজশাহীর নগেন্দ্র মাহাতো, ভূষণ মাহাতো, সরুবালী মাহাতো প্রমুখ। দিনাজপুরের যশোদারানি, গহনু মাহাতো, ডোমন সর্দার সহ অনেকেই শহিদ হন।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসে,

পোশপত কুর্মির সঙ্গে সাঁওতাল রমণীর বিবাহের থেকে জাত নায়ক রুইতন কুর্মি অসাধারণ চরিত্র। পোশপত (পশুপতি) কুর্মির ছেলে রুইতন কুর্মির সঙ্গে সাঁওতাল মেয়ের বিবাহের ব্যাপারটা তথাকথিত শিক্ষিত কুর্মি সামন্তবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভালো চোখে দেখেননি। এ বিষয়ে সমরেশবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম যে, ছিন্নমূল এই মানুষগুলো তাঁদের সমগ্র গোষ্ঠী নিয়ে তো নূতন অভিবাসন তৈরি করেনি। তাই একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষদেরই তাঁরা তখন বেছে নিতে থাকেন বিবাহের জন্যে নূতন প্রজন্মের প্রয়োজনে। যুগে যুগে এটাই সত্য। প্রেম-ভালোবাসা একই সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে জমে ভালো। প্রেম বিবাহ হতেই পারে।

সমরেশবাবুর সরস ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বুঝতে পেরেছিলাম যে, একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মানুষগুলি উত্তরবঙ্গে এসে যে সম্মিলিত জীবনধারা তৈরি করেছিলেন তা এক 'সামাজিক সমূহ' (Social cluster)। এই সামাজিক সমূহকেই স্থানীয় বাংলাভাবী ব্যক্তিরা 'বুনো' বলতেন। বুনোদের মধ্যে সাঁওতাল, মাহাতো, মুণ্ডা, ওঁরাও, খেড়িয়া, নাগেশিয়া, দেশওয়ালী পুরাণ, কোলকামার, কোল প্রমুখই মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ। একই সাংস্কৃতিক পরম্পরা, একই ধরনের নাচ ও গান, খাদ্য ও পানীয় (হাঁড়িয়া সহ) এক ধরনের হওয়ার জন্যে নিজ গোষ্ঠীর বিবাহ সম্বন্ধের ব্যাপারে দূর-দূরান্তে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশার অভাবে, 'বুনো' সামাজিক সমূহের মধ্যেই বিবাহ প্রথাসিদ্ধ ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত রূপ নেয়। সুন্দরবনে, নদিয়াতে (নীলকুঠি শ্রমিকদের মধ্যে) এটা আজও সত্য।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শারীরিক মানববিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি. পি. মুখার্জী ও এম. আর. চক্রবর্তী তাঁদের 'A dermatoglyphics approach to the Mundari ethnic problem (1964)' প্রবন্ধে বলেছেন—

> 'The Kurmi-Mahato, supposed to be related to Santal have a pattern intensity similar to West Bengal Santal. But their difference in frequency of radial loops and arches may be due to intermixture. The hypothesis of the ethnic modification of the Eastern Mundari on the basis of finger prints find support from the instances of inter-marriages among the tribes.'

'রক্ত সংমিশ্রণ' মেনে না নেওয়াটা সামন্তবাদী মনোভাবের অন্ধকার দিক। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটে চলেছে এবং ভারতীয় নামক মিশ্র জাতি সত্তা তৈরি করছে। কাজেই শুধুমাত্র বুনো সামাজিক সমূহের মধ্যেই নয়, বর্ণ হিন্দু তথা অন্যান্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গেও অনবরত মিশ্রণ অব্যাহত।

তবুও নিজ নিজ গোষ্ঠী স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় অধিবাসী ও আদিবাসীদের সঙ্গে দৈনন্দিন লেনদেন, সামাজিক রীতি-রেওয়াজ সৃষ্টি করে উত্তরবঙ্গীয় পানীয় গ্রহণকারী গোষ্ঠী সমূহ (Drinking group) তাঁরা তৈরি করেছেন। অপরিচয়ের দূরত্ব কাটিয়ে উঠে স্থানীয় অধিবাসী হিসেবে তাঁরা রাভা, মেচ, পোলিয়া, রাজবংশীদের সঙ্গে সুখদুঃখের সমান ভাগীদার হয়েছেন। ছোটোনাগপুরের সিংভূম জেলাতে গবেষণা চালাতে গিয়ে টি. আর. শর্মা বলেছেন— 'However the local Santal do not attach any prohibition for bringing a Kurmi girl as they believe that once the Kurmis and Santals were kindered people.' তিনিও লক্ষ করেছেন যে, 'In this area the Gaur, Mahato, Oraon, Munda, Santal, Bhumij and Bhuiyas with Hos constitute drinking group and the untouchable group of the Hos constituted the Muslims, Christians, Tanti, Dom etc.' উত্তরবঙ্গের 'বুনো'দের মধ্যে 'পানীয় গ্রহণকারী গোষ্ঠীসমূহ' একদা স্থানীয় আদিবাসীদেরও প্রভাবিত করে এবং এক বৃহত্তর দলিত ও শোষিত মানুষের গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আদান প্রদানের ফলে জন্ম নেয়। পরবর্তীকালে এক বৃহত্তর গোষ্ঠী 'ভাটিয়া' অর্থাৎ নূতন অভিবাসনকারী বাঙালি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক দূরত্ব সৃষ্টি করে।

মাহাতোদের 'বুনো' সমূহের মধ্যে থাকা সামন্ত ও উদ্‌বৃত্ত নিয়ন্ত্রণকারী মাহাতোরা মেনে নিতে পারেনি। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন, রাভা ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রভাবে তাঁরাও কুর্মি-ক্ষত্রিয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এই আন্দোলনগুলির পিছনে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির খেলা ও রাজনীতির টানাপোড়েন ছিল সেটা তাঁরা দেশ স্বাধীন হবার পরও বুঝতে পারেননি। ১৯৫০ সালে নূতন সংবিধান অনুযায়ী সরকারিভাবে যে 'আদিবাসী সমূহ' বা Tribal cluster-এর জন্ম হল, তার ফায়দা মাহাতোরা নিতে পারল না। অথচ টি. আর. শর্মার মতে, "The expression 'aboriginal tribes' was used instead of animists, in order to give the benefit of the exemption to those who had become converts to Christianity because it was understood that such converts in all cases continued to follow their tribal customs in the matter of succession and inheritance. The Govt. of India stated that 'Where the tribes known as Munda, Oraons, Santals, Hos, Bhumij, Kharia, Ghasis, Gonds, Kandhs, Korwas, Mals, Kurmis, Saurias and Pans dwelling the province of Bihar and Orissa have customary rules of succession and inheritance incompatible with the provisions of the Indian Succession Act 1865 and it was inexpedient to apply the provisions of that act to the members of those tribe.'

কিন্তু মাহাতোরা সহ সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি গোষ্ঠী নানা কারণেই আদিবাসী সূচি থেকে বাদ পড়ল ১৯৩০ সালে। এই বাদ পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো প্রতিবাদ হল না। ক্ষত্রিয়দের মোহে কুর্মি নেতারা সেদিন যেভাবে সমস্ত সমাজটাকে বর্ণহিন্দুদের কাছে বন্ধক রেখেছিল তা ভাষাতে প্রকাশ করা যাবে না। সাঁওতালদের 'সাফা হড়', ভূমিজদের 'ভূমিজ ক্ষত্রিয় আন্দোলন' যেন একই গতিতে চলছিল। আসলে বাংলা প্রদেশকে ঘিরে হিন্দু ও মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতির সর্বাত্মক বলি হলেন মাহাতারাসহ সাঁওতাল, মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী। মুসলমান জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের জনসংখ্যা বাড়াতে গেলে কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীকে হিন্দু করতেই হবে। তাই রাজবংশী, রাভাদের কেউ হলেন আদিবাসী, কেউ হলেন দলিত। আর দলিতরা তো হিন্দুদেরই একাংশ। মাহাতোদের সেখানেও জায়গা হল না। সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে এখনও যাঁরা 'বুনো' বলে পরিচিত তাঁরা পরিণত হলেন বর্ণ-হিন্দুতে।

১৯৩১ সালের হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যা দাঁড়াল মুসলমান ৫২% এবং হিন্দু ৪৬%। শুধুমাত্র তৎকালীন উত্তরবঙ্গে ১৯৩১ সালে হিন্দু ৩৬% এবং মুসলমান ৬১%, কিন্তু ১৯৪১ সালে তা দাঁড়াল হিন্দু ৩২% এবং মুসলমান ৬২%। অধ্যাপক অমলেন্দু দে বলেছেন, 'তারকচন্দ্র দাস মন্তব্য করেন ১৯৩১-৪১ খ্রিস্টাব্দের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার রাজনৈতিক কারণ ছাড়া কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে হিন্দুরা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস বয়কট করেন। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাসের সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি করে দেখান।... অবশ্য লোকসংখ্যার হিসেব নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ আরও জোরের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন।'

একদা মাহাতোদের 'বুনো সামাজিক সমূহ'-এর মধ্যে থেকে যে স্বাভাবিক পানীয় গ্রহণকারী গোষ্ঠীসমূহ হিসেবে সামাজিক মর্যাদা ছিল, নূতন সরকারি নীতি ও আদিবাসী সূচির জন্যে তাঁরা সেই সমূহের মধ্যে যেন ময়ূর পুচ্ছধারী কাকে পরিণত হলেন। অখিল ভারতীয় কুর্মি-ক্ষত্রিয় আন্দোলন এই দূরত্বটাকে আরও বাড়িয়ে দিল। পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে, জলপাইগুড়িতে কুর্মি নেতারা শিক্ষার প্রসারের জন্যে হোস্টেল করলেন। কিন্তু ধান বিক্রি করে কতদিন তাঁরা ছেলেমেয়েদের পড়াবেন ? একদিকে আদিবাসী সূচিভুক্ত গোষ্ঠীগুলির উপর রাজনৈতিক বদান্যতা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে চাকরির সুযোগ ও তার সদ্ব্যবহার বাড়তে

লাগল। সরকারি বিভিন্ন খয়রাতি সাহায্য তাঁদের উপর (শুধুমাত্র আদিবাসী তালিকাভুক্ত থাকার জন্যেই) যে ভাবে পড়ছে তাতে এক নব্য বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব হল।

অন্যদিকে বর্ণ-হিন্দু উচ্চ জাতির লোকেরা তাঁদের আত্মীয়স্বজন মারফত, রাজনৈতিক সংগঠনের মারফত এবং মেধা ও দক্ষতা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবার যে পরম্পরাগত কৌশল তাতে মাহাতোরা সামিল হতে পারলেন না। তাই আজও জলপাইগুড়ি জেলাতে ৩০ হাজার মাহাতোর মধ্যে মাত্র ছয়জন মহিলা ম্যাট্রিক পাশ, চারজন গ্র্যাজুয়েট ও কিছু ছাত্রছাত্রী কলেজে পড়ছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জামালপুর, দৌলতপুর, চেঙ্গিজপুর, কুড়মাইল, ভবানীপুর ইত্যাদি গ্রামে মাত্র শতাধিক মহিলা স্নাতক, দুইজন ডাক্তার, পাঁচজন দুর্গাপুরের ব্যাঙ্ক কর্মী। অথচ সেই জেলাতে কুর্মি মাহাতোদের লোকসংখ্যা লক্ষাধিক।

মালদহ জেলার কেঁন্দপুকুর গ্রামে সমীক্ষার কার্য চালাতে গিয়ে দেখেছি, ১৪/১৫ বছরের মালতী মাহাতো স্কুলের মেধাবী ছাত্রী হলেও তার গরিব মা তাকে পড়াতে পারেননি। অন্যদিকে, কিছু 'ভদ্রলোক' মাহাতো পাকুয়া, বুলবুলচণ্ডীতে বিভিন্ন সরকারি চাকুরি, ধান বেচাকেনার ব্যবসা করে 'সরকার', 'বিশ্বাস' পদবি নিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। এরা নিজেদের কুর্মি-মাহাতো বলতে লজ্জাবোধ করেন, এমনকী লোকলজ্জার ভয়ে এই 'ভদ্রলোকরা' মাহাতো পদবি বাদ দিয়ে ওই এলাকাতে প্রচলিত হিন্দুদের অর্থাৎ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের common পদবি 'সরকার' 'বিশ্বাস' ইত্যাদি এক বা দু-পুরুষ আগে নিয়ে নিজেদের লুকিয়ে ফেলতে চান।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রীসীতারাম মাহাতোর কাছে শুধুমাত্র 'মাহাতো' হিসেবে পরিচিতি দিয়ে এরা এদের অভাব অভিযোগ সহ চাকুরির দাবিও করেছেন হাজারে হাজারে। রাজ্য অতিথি নিবাসের বিধায়কদের হোস্টেলে দেখা গেছে এদের নেতাদের ভিড়। কিন্তু এদের সর্বজনীন সুবিধা হয়নি। পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলাতে ছোটোনাগপুরের এই নববসতি করা মানুষগুলোর মধ্যে এক নতুন চেতনা ১৯৮০ সালে লক্ষ করেছি।

১৯৮০ সালের ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি অখিল ভারতীয় কুর্মি মহাসভার ঝালদা অধিবেশনে প্রকাশ্যে তরুণ নেতারা উত্তরবঙ্গে সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করে কুর্মি-ক্ষত্রিয় নেতাদের কায়েমি চক্র ভেঙে ফেলে পুনরায় আদিবাসী সূচিতে তাঁদের স্থান করে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পঞ্চানন মাহাতো, রমেশ মাহাতো, দুলাল মাহাতো, অরুণ মাহাতো, দীনেশ মাহাতো, খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, নীলেশচন্দ্র মাহাতো, খগেন মাহাতো, সুরেন মাহাতোর মতো

তরুণ নেতারা যখন বলেছিলেন 'উত্তরবঙ্গের জীবনের সঙ্গে আমরা আজ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ওখানেই আমাদের মরতে হবে, ওখানেই আমাদের নূতন প্রজন্মের বিকাশ ও জন্ম হবে, কাজেই উত্তরবঙ্গের বুনোদের দলের, একদল এই মাহাতোরা, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আদিবাসী ছিল, আজও আমরা সামাজিক ধ্যানধারণা, বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে আদিবাসী, আমরা বুনো। তাই আমরা আদিবাসী সূচিতে স্থান লাভের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছি। আবেদন করেছি সিডিউল কাস্ট ও সিডিউওল ট্রাইব অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্যে। আশা করি আপনারা আমাদের সমর্থন করবেন।' বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯৮০ সালে দার্জিলিং-এর মিউনিসিপ্যালিটি হলে যখন বি. পি. মণ্ডল মহাশয়ের নেতৃত্বে 'অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন' পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন, তখন সেই কমিশনের সামনে বহু অনগ্রসর মানুষের কথা তথ্য প্রমাণ দিয়ে তুলে ধরেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি ফেডারেশনের সম্পাদক হিসেবে বতর্মান গ্রন্থের এই লেখক ও শ্রী বীরেন ভৌমিক, অ্যাডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট। স্নেহলতা মাহাতো, রমেশ মাহাতো, অহীন্দ্র মাহাতোরাও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সেই সময়।

দীর্ঘ টালবাহনা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চাপ অস্বীকার করে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৪ সালে গঠন করেন 'পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন'। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিচারপতি এ. এন. সেন। অন্যান্য সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন ড. রমেন পোদ্দার, ড. বেলা ভট্টাচার্য এবং ডা. অমলকুমার দাস মহাশয়দের। ড. পোদ্দার পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ড. বেলা ভট্টাচার্য শারীর নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। ড. অমলকুমার দাস একমাত্র নৃ-বিজ্ঞানী যিনি সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত।

পশ্চিমবঙ্গের কুড়মি-সমাজ সল্টলেকে ১০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্যে। বর্তমান গ্রন্থের লেখকসহ ড. ভৈরব মাহাতো, রাসবিহারী মাহাতো, মনোরঞ্জন মাহাতো, অশোক সিং মাহাতো, বঙ্কিম মাহাতো, বাসন্তী মাহাতোসহ বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের চেয়ারম্যান মাননীয় বিচারপতি অজিত নাথ সেনের কাছে এই গ্রন্থের লেখক দাবি করেছিলেন যে, কুড়মি-মাহাতো গোষ্ঠী মূলত 'হড়-মিতান' সামাজিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম ভাগীদার। সুতরাং এঁদের 'আদিবাসী' হিসেবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্ত করা হউক 'কুর্মি' হিসেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শেষ পর্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণি হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন।

'ছোটোনাগপুরিয়া' অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আজ তাদের উত্তরবঙ্গের জন্যে সমাজ ভাবনা, অর্থনৈতিক ভাবনা, সাংস্কৃতিক ভাবনা ভাবতে হবে। অন্যদিকে প্রশাসক ও কলকাতার শাসক গোষ্ঠীদের ভাবতে হবে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে একইভাবে দেশান্তরিত 'ছোটোনাগপুরিয়া'দের উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। করম, ঝুমুর, ভূঁয়াগ, ডাহের, টুসু, ভাওয়াইয়া, চটকা, মাহুতবন্ধুর গান সমান্তরালভাবেই চলুক। জীবনের নব নব সৃজনের উন্মাদনাতে বুনোরা পরিণত হোক উত্তরবঙ্গীয় হিসেবে। তার জন্যে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুণ্ডারী, কুর্মালি, সাঁওতালি ভাষার শিক্ষার মাধ্যম, নতুবা শুধুমাত্র মদেশিয়াদের সদরী ভাষা শিক্ষা, ব্যাপকভাবে উত্তরবঙ্গে কর্মযজ্ঞ শুরু করে সকল খেটেখাওয়া মানুষের জন্যে চাকরি ও কাজের সুযোগ করে মানুষের মর্যাদা দেবার কাজ শুরু হোক।

পুরুলিয়া : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দামোদর, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর শিলাবতী টটক কুমারী ও সুবর্ণরেখা বিধৌত, পঞ্চকোট, অযোধ্যা, জয়চণ্ডী বিধৃত, সুপ্রাচীন গণ্ডোয়ানার একাংশ বৃহৎ ভূমিখণ্ড ও সংস্কৃতি যে অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে তা বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে বর্তমানে ছো, টুসু, করম, দাঁসাই, সেহরাই, ঝুমুর, ইন্দ, ছাতা, ধরমের লীলাক্ষেত্রে পরিণত, নিম্ন ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির পুরুলিয়া জেলা।

পুরুলিয়া জেলা ছোটোনাগপুর মালভূমির শিলাময় উপত্যকা। এই অঞ্চলের প্রাগার্য মানবগোষ্ঠীর মূল আবাসস্থল ছিল স্থানীয় স্রোতস্বতীগুলির উৎপত্তিস্থলের অদূরে এবং পাহাড়ের অঙ্গপৃষ্ঠে। এই প্রাচীনতর প্রত্নাশ্মীয় কালের আবহাওয়া যে শুষ্কছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধের অতুলনীয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায় পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা, বাঘমুণ্ডী ও অন্যান্য পাহাড়ের সানুদেশে, দিগন্তপ্রসারী উপত্যকায় ও অরণ্যে। পুরুলিয়া জেলার পাহাড়গুলো ভূতাত্ত্বিকদের মতে হিমালয় পর্বতমালা থেকে কয়েকশত লক্ষ বছরের পুরাতন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে পাঁচপরগনিয়া শিখর ভুঁই, বরাভুঁই, খাসপোল, পাতকুম, সিংভূম, সাতভুঁইকে নিয়ে গঠিত যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল তা মূলত সুবৃহৎ কোল সংস্কৃতির 'হড়-মিতান'.সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ও সভ্যতার অংশ।

শতাব্দীর দুঃখ বেদনা ও আনন্দ নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষরা তাঁদের ভাষা সংস্কৃতিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। ড. সুকুমার সেন এই অঞ্চলের ভাষাকে

বলেছেন ঝাড়খণ্ডী বাংলা। ড. ধীরেন সাহা মন্তব্য করেছেন মানভূম সিংভূমের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার শাল মহুয়ার সীমানা যেখানে শুরু, সমতল বাংলার সেখানে শেষ। এখান থেকে শুরু অরণ্য জীবনের আরণ্যক সংস্কৃতির। একদিকে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাড়িয়া, অন্যদিকে মাল, মাঝি, মাহাতো, মাহলির বিচিত্র জীবন পর্যায় পরিচালিত একটি জনমন এই সংস্কৃতির ধারক।

পুরুলিয়া জেলার ভূমিব্যবস্থার বিবর্তন এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলির মাইগ্রেশন একই সঙ্গে এই এলাকাতে হয়নি। শরৎচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেন।

"And we might further suggest that this primitive stock from which we have supposed the Mundas and other allied tribes in and outside India to have been descended, had their original abode in the hilly regions extending from the Aravalli mountains and proceeding eastwards along the Vindhyan and Kaimur ranges as far as the modern state of Surgunja and the Southeastern District of Chotnagpur. It is in these parts of India that remains of the most ancient human settlement have been discovered. Traces of the stone age have been found as far east as in the modern District of Singbhum and Manbhum and in the South eastern parts of Ranchi District."

পুরুলিয়ার মাটিতে তাই দেখতে পাওয়া যায় মূলত শিকার ও খাদ্য আহরণকারী মানুষ, যাযাবর জঙ্গলকেন্দ্রিক মানুষ, আর চাষি। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলকেন্দ্রিক হওয়ার জন্যে নিজ গোষ্ঠীর মানুষদের আদান প্রদান সীমিত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক মুণ্ডা, কোল প্রভৃতি বৃহৎ জাতি গোষ্ঠীগুলি খণ্ড-খণ্ড হয়ে (ethnic fragmentation). এক সময় ওই খণ্ড গোষ্ঠীগুলিই স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন একের সঙ্গে অপরের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক পৃথকীকরণ হয়ে গেছে। ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানে শুধুমাত্র থেকে গেছে একটা আঞ্চলিক রূপ ও ঐক্য।

ভূমি-ব্যবস্থা

ইতিহাসের বিভিন্ন গতিপ্রকৃতিতে এ কথা আজ স্বীকৃত যে, আদিম গ্রাম-সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামের সমস্ত জমির, অথবা বংশের যৌথ মালিকানা (এজমালি) থেকে অধুনালুপ্ত রাজা ও জমিদার এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের যে উত্তরণ তা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত যে, পুরুলিয়াতে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ধাপে ধাপে হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামের নামকরণ, জমির নামকরণ, ধানের

নামকরণ মূলত অস্ট্রিক সাংস্কৃতিক লোকদের দ্বারাই হয়েছিল। যেমন, তুমড়াশোল, নামশোল, ডুমুরশোল, বাগদা, লাগদা, ঝালদা, চিপিদা, ঝুলুডি ইত্যাদি। ছোটোনাগপুরের মুণ্ডা খুঁটকাঠিদারদের মতো এখানেও লায়া খুঁট, মাহাতো খুঁট, মড়াখুঁট, মাঝি-খুঁটের প্রাধান্য। যারা প্রথমে জঙ্গল সাফ করে, গ্রামের সীমানা ও দেবদেবীর স্থাপনা করে গ্রামস্থাপন করেছিল তারাই আজও পুরুলিয়াতে বংশপরম্পরাক্রমে লায়া, মাহাতো, মাঝি, নায়কি ঘর হিসেবে পরিচিত। পঁচিশ-ত্রিশটা গ্রাম নিয়ে গ্রামপ্রধানরা নির্বাচিত করতেন নিজ-নিজ গোষ্ঠীর পরগনৎ বা পরগনা, আবার ১২টি পরগনা নিয়ে নির্বাচিত হত দেশ মণ্ডল। অনেক সময় এটা ছিল বংশানুক্রমিক, বা কোনো সময় রাজাদের দ্বারা মনোনীত।

এই মাহাতো, মাঝি, পরগনৎ, দেশমণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিরাই নিজ-নিজ এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা, সামরিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করতেন। সর্দার, ঘাটোয়াল, মানকি, তরফসর্দার প্রমুখ থেকে বিবর্তিত হয়ে 'রাজা' নামক যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল যখন থেকে, তখন থেকেই পুরুলিয়ার ভূমি-ব্যবস্থা নূতন মোড় নিল। পঞ্চকোট মহারাজার সামন্তরা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। তারই ফলস্বরূপ পুরুলিয়াতে বহু ধরনের জমির মালিকানা-স্বত্বের নিদর্শন ও অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই : রাজা ও তার খাসমহল, হিকমালী, দেওয়ানী, মোগলা পাট্টা, বিভিন্ন বৃত্তিভোগী, ব্রহ্মোত্তর, লায়ালি ইত্যাদি।

বহিরাগমন ও প্রতিরোধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির আগমন ঘটে এই জেলাতে। উচ্চবর্ণ হিন্দু, বাংলা, হিন্দি ও ওড়িয়াভাষী মানুষ, উত্তর ভারতের ব্যবসায়ী মুসলমানসহ অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ রাজা, সামন্ত, তথা জমিদারদের কাছে বিলাস সামগ্রী, ঘোড়া, গরম কাপড় বিক্রি করার সুযোগে মহাজনে পরিণত হন। পরবর্তীকালে ওই সমস্ত সামন্ত ব্যবসাবাণিজ্য, জঙ্গল কাটার সুযোগ করে দেন তাঁদের এবং কতকগুলি মৌজা 'জার পেসকি' বা 'ভুগত' হিসেবে দিয়ে দেন। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর থেকে আসত লবণ, মশলা, বিক্রেতারা বিশেষ করে তাম্বুলি, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিকরা গরুর পিঠে (ছালার বলদ) বস্তা চাপিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দুই দশকে যে সমস্ত উচ্চবর্ণের মানুষ উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, কেরানি, দেওয়ান, কবিরাজ হয়ে

আসেন, তারাই পুরুলিয়া জেলার কর্তৃত্ব করতে থাকেন বিভিন্ন বিষয়ে। মধ্যবিত্ত জীবন পুরুলিয়ার মূলবাসীরা তখন কেউ শুরুই করেননি। এই নূতন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর প্ররোচনাতে, জমিদার, মহাজন, ঠিকাদারদের সাহায্যেই এবং ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়, অসমের চা বাগানে, কয়লা খনি এলাকাতে 'গিরমিট'-এর বেড়াজাল 'আড়কাঠিয়া'দের সাহায্যে বহু মানুষকে চালান দেওয়া হতে থাকে।

অন্যদিকে, ১৭৬৫ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত পুরুলিয়ার খেটেখাওয়া মানুষ যে ভাবে দীর্ঘ সাতষট্টি বছর ধরে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিহত করেছিল তা নিঃসন্দেহে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এই এলাকার মানুষের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে ভূষিত এই গণসংগ্রাম তথা জনযুদ্ধকে 'ভদ্রলোক' মানসিকতার ঐতিহাসিকরা প্রকৃত মূল্যায়ন করতে এখনও সমর্থ হয়নি। এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই ছিল না, ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপন্থীও। সবচেয়ে ভয়াবহ ও ব্রিটিশের চোখে মারাত্মক ত্রাস সৃষ্টিকারী সেই দাম পাড়ার দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী জগন্নাথ পাতর, কুইলাপালের সুবলা সিংহ, ধাধকার শ্যাম গঞ্জামের নেতৃত্বে তখন ক্যাপ্টেন মরগান, রেসিড্যান্ট ভ্যানসিনটারট, লে নান, ক্যাপ্টেন ফোরবস, লে গুডইয়ার পর্যুদস্ত হন। এ সম্পর্কে জে সি প্রাইস-এর মন্তব্য—

"প্রাচীন কাল হইতে যাহারা জমি ভোগদখল করিতেছিল তাহারা যখন দেখিল যে বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে তাহাদের জমি ভোগের অধিকার জানিয়া শুনিয়াই কেবলমাত্র সরকারি পুলিশ বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে অথবা সেই জমির উপর এরূপ একটা নূতন রাজস্ব ধার্য করা হইতেছে যাহা দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, আর আবেদন নিবেদনও কোনো ফল হয় না, তখন তাহারা যে প্রথম সুযোগেই অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহা তাহাদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিবে তাহাতে বিস্ময় বা ক্রোধের কোনো কারণ থাকিতে পারে না—"

পুরাতন জমিদার ও সামন্তরা বিশেষ করে মেদিনীপুর জমিদারির রানি শিরোমণি, বিষ্ণুপুরের মহারাজা, পঞ্চকোটের মহারাজা হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, তাঁরা চতুর্দিক থেকে একদল অজানা অচেনা মানুষের দ্বারা পরিবৃত। তাঁরা কেউ কোম্পানির কালেক্টার বা অফিসার, মহাজন, পুলিশ, দারোগা, যাঁদের অঙ্গুলি হেলনে তাঁদের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সম্মান ও ক্ষমতা যে কোনো সময় বিপন্ন হতে পারে। বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন, The British authorities tried to substitute 'contract' for 'custom' overnight. একদল

নূতন অভিজাত জমিদার শ্রেণির তরঙ্গ বইতে থাকে, প্রধানত 'বাংলাভাষী' হিন্দু, শহরের পুঁজিপতি, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, সরকার, ফৌজদার, দফাদার, তরফদার, রাজপুরোহিত, কালী ও দুর্গা প্রমুখ দেবদেবীর সেবাইত ব্রাহ্মণেরা সাধারণ প্রজা থেকে শুরু করে সামন্ত ও রাজাদের সম্পত্তি নিলামে ডেকে নিতে থাকেন। খাজনা দিতে অস্বীকার করায় ১৭৯৩ সালে পঞ্চকোট জমিদারি নিলামে উঠে এবং তা বেনামে ডেকে নেন নীলাম্বর মিত্র। কিন্তু প্রজাদের তীব্র বিরোধিতায় তিনি তা দখল নিতে পারেননি।

এই সময় পুরুলিয়া জেলা 'পঞ্চকোট' জেলা হিসেবে পরিচিত ছিল। পুরুলিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা গোপাল মাঝি ও বিরজু মাঝি চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ঘাটোয়ালি স্বত্বের পুনঃপ্রবর্তন করেও বিদ্রোহ দমন করা গেল না। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সেনাপতিদের নির্দেশে এই জেলার সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করল ইংরেজ বাহিনী। অগ্নি সংযোগ, লুট, গণহত্যা অবাধে শুরু হল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বরাভূমের জমিদার লালসিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘটে। ১৭৬৫ থেকে ১৮০২ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে বহু ঘটনার বর্ণোজ্জ্বল সমারোহ যার শেষ পরিণতি 'জঙ্গল মহল' জেলা সৃষ্টি। ১৮০৫ সালে! কিন্তু 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার' নেতা গঙ্গানারায়ণ সিং ও বুলি মাহাতোর বিদ্রোহের ফলে ১৮৩৩ সালে 'জঙ্গল মহল' জেলাকে ভেঙে তৈরি হল মানভূম জেলা।

১৮০০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মানভূম জেলার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে এই জেলার লোকেরা বাঁচার তাগিদে, অন্য জেলাতে মাইগ্রেশন করেছেন এবং বহু বহিরাগত ব্যক্তি এই জেলাতে এসে বসবাস শুরু করেছেন।

১৮১৬ সালে শুরু করে ১৮৩৫ সালে জেলাতে কয়লাখনির কাজ পুরোদমে শুরু হলে, তথা ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েজ-এর স্থাপনা হলে, জনসংখ্যার রূপ পরিবর্তিত হয়।

জনবিন্যাস

১৮৭২ সালের লোকগণনা অনুসারে মানভূম জেলাতে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল ভূমিজ ৮৯৮২৭ ও সাঁওতাল ১৩২,৪৪৫। সেমি-হিন্দুয়াইজড আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল ডোম ১৭,৩৪২, হাড়ি ১০,১৪৪, মুচি ৬৬৯৫, রাজোয়াড় ১০,০৯১। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫৩,৭০১ ছত্রি বা রাজপুত ১৬,৫৮৮, বৈদ্য ২,৩৯৪ কায়স্থ ৭,৯৯১, গন্ধবণিক ৭,১৪০, সুবর্ণবণিক

৬,৪৮৬, তাম্বলি ৪,২২৪। উপজাতি-হিন্দু চাষি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে গোয়ালা ৩৩,০৬৩, কুরমি ১৩৭,৯৩৪, কামার ২২৬১৫, কুম্ভকার ২৪৩৯১, শুঁড়ি ১৯০৮০ ইত্যাদি। আবার ১৯০১ সালের লোকগণনা অনুসারে দেখতে পাই— কুর্মি ২,৪১,০০৬, সাঁওতাল ১,৯৪,৭৩০, ভূমিজ ১,০৯,০১৬, বাউরী ৯৯,০৯৬, ব্রাহ্মণ ৫৭,০২৫, কুম্ভার ৩৮,৮৭৭, আহির ও গোয়ালা ৩৭,৮৮৫, ভুঁইয়া ৩৬,৬০৩, রাজোয়াড় ৩২,১৬৬, কামার ও লোহার ২৯,৫৬৯।

মাইগ্রেসনের প্রধান কারণ যে অর্থনীতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত অসম ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯০১ সালে ছোটোনাগপুর থেকে 'কুলি' সংগ্রহ করে লখিমপুর জেলায় চালান দেওয়া হয়েছে ৫১,৫৫৩, সিলেটে ২২,৭৪৫, শিবসাগরে ৫৭,৭২৮ এবং দরং-এ ৩০,৪৭৭ জনকে। এদের মধ্যে মুণ্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, কুরমি, সাঁওতাল, ডোম, রাজোয়াড় প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর লোকরাই প্রধান যাঁরা মূলত 'হড়-মিতান' সামাজিক সভ্যতার মানুষজন।

লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ ও লোকসংগীত গায়ক কালী দাশগুপ্তের সংগ্রহ থেকে একটি গানের নমুনা তুলে ধরলে বিষয়টির অভাবনীয় গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে না—

'চল মিনি আসাম যাব
দেশে বড় দুঃখরে
আসাম দেশে রে মিনি
চা বাগান হরিয়াল।

অন্যদিকে পুরুলিয়াতে এখনও শুনতে পাওয়া যায়—

খেতে বুনলি ধান
ধান দেখি টানমান
রোদা দেখি উড়ল পরাণ
এ্যাইসা কে জান?
না দেখি গুঁদলি
না দেখ মাড়ুয়া
না দেখ বাড়িকে জনার
এ্যাইসা কে জান?
কেহু করে হায় হায়
কেহু বা পলাঞঁয়ে যায়
এ্যাইসা কে জান।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে পুরুলিয়া জেলা উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক এলাকা বলেই শাসক ও শোষণকারীরা বরাবরেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থের খাতিরে এখানকার মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে বিপথে চালনা করেছে। রাঁচি, মানভূম, হাজারিবাগ, সিংহভূম, বিলাসপুরের তথা ছত্তিশগড়ের শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভূমি ও মূলধনের উপযুক্ত সদ্‌ব্যবহার করার জন্যে 'Indenture Labour' হিসেবে চালান হতে শুরু করে। ফিজিতে চিনি উৎপাদনের জন্যে, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকাতে জঙ্গল কাটা ও রেল লাইন স্থাপন করার জন্যে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ছোটোনাগপুর থেকে শ্রমিকরা চলে যেতে থাকেন। ব্রিটিশ পারলিয়ামেন্ট ১৮৮২ সালের 'এশিয়ান ইমিগ্রেশান বিল' সহ Indian Emigration Act of 1882, Inland Emigration Act, 1882-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থাগুলো নিতে লাগলেন ব্রিটিশপুঁজি খাটাবার জন্যে। 'Agreement' কথাটি পরবর্তীকালে 'গিরমিট' হিসেবে কথ্যভাষাতে পরিচিত হল এই এলাকায়। রাঁচি, মুরি, পুরুলিয়া, চক্রধরপুর থেকে 'Special coolie' ট্রেন ছাড়তে লাগল।

খরা ও দুর্ভিক্ষ

উপরোক্ত অর্থনৈতিক ঘটনাস্রোতকে ত্বরান্বিত করেছিল এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ। খরা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে এই জেলা বারে বারে। শুষ্ক আবহাওয়া, কম বৃষ্টিপাত তথা খরার ফলে একমাত্র ফসল ধান বারে বারে নষ্ট হয়েছে এবং মানুষ অসীম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে বহু শতগ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। এমনকী বড়ো বড়ো শহরগুলিতে মাত্র সিকি ভাগ লোক কোনও ক্রমে বেঁচে ছিলেন। ১৮৫১ সালে আবার খরা হয়, ১৮৬৫ সালে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে ভাদুই শস্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং তারই ফলস্বরূপ ১৮৬৬ সালে মানভূম জেলা এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। ১৫ মার্চ, ১৮৬৬ সালে জেলার পুলিশ সুপারেনটেনড্যান্ট লিখেছেন—

> '...a great increase of the robberies and dacoities, particularly in the Southern and eastern parts of the District... that these were largely due to scarcity was proved by the fact that the property stolen consisted of nothing but eatables, any valuables in the houses broken into being left as useless... Poor but even more respectable natives had been forced to eat Mahua and the like; numbers of the people were said to be actually starving on grass or anything they could get.'

অনাহারে, অর্ধাহারে থাকা এই জেলার মানুষ, ভেলা, জাম, পিয়াল শালফল, খুদ, খইল খেয়েও বাঁচবার চেষ্টা করে। দুর্ভিক্ষের মহামারীরূপ পরিলক্ষিত হয় বরাভূম, মানভূম এবং রাইপুর পরগনাতে। মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সরকারিসূত্র অনুসারে একলক্ষের মধ্যে বিশহাজার। বরাভূম পরগনার মোট সংখ্যার সিকিভাগ কিংবা ১/৩ ভাগও হতে পারে। ১৮৭২, ১৮৭৩, ১৮৭৪ সালে বর্ষার অভাবে পুনরায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এই জেলা। মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে রিলিফের কাজ চললেও জেলার ৯৯১০৩০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় একদিকে চা বাগানে, বর্তমান বাংলাদেশের নীলচাষি হিসেবে, সুন্দরবন আবাদ করার জন্যে মানুষের মাইগ্রেশন চলতে থাকে। অন্যদিকে অরণ্যসংকুল পথে, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝোর, বোনাই, বামরা, বিলাসপুর ও সুন্দরগড়ের দিকে চলে যেতে থাকেন পুরুলিয়ার খরা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অভিশপ্ত চাষি তথা অন্যান্য গোষ্ঠী।

ময়ূরভঞ্জ সামন্ত রাজ্যে কুর্মী মাহাতোদের লোকসংখ্যা ১৯৩১ সালে দাঁড়ায় ৬০,৩৪২, যা ১৯০১ সালে ছিল ৩৫,৯৬৮ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরে মোট জনসংখ্যা শতকরা ৬৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সাঁওতালদের লোকসংখ্যা ১৮৯১ সালে ছিল ৯১৪৯০, ১৯০১ সালে দাঁড়ায় ১৮৫,১৪৯ জন, ১৯১১ সালে ২,১৪,১৬৪ জন এবং ১৯৩১ সালে ২,৫৮,১৯৫ জনে। ভূমিজদের লোকসংখ্যা গত চল্লিশ বছরে (১৯৩১ সালে লোকগণনা অনুসারে ৭৮,৪০০ জন) শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। খরা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের এর চেয়ে ভয়ংকররূপ ভারতের ইতিহাসে, আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে বিচিত্র ও বহুমুখী ধারা ফল্গু নদীর অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত তার সবকটি সূত্রই বোধ হয় পুরুলিয়াতে খুঁজে পাওয়া যাব। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে এখানকার গণমানুষ বৈষ্ণব ধর্মের সাম্যের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। হিন্দু সংস্কৃতির চাপ, তখনও পুরুলিয়াতে সকল স্থানে সমানভাবে পড়ে নি। হিন্দু সংস্কৃতির চাপ বলতে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ জ্ঞানপুষ্ট জন্মগত পেশা ও পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বসবাস করাকে আমি হিন্দু সংস্কৃতি বলতে চাই। কিন্তু 'গোত্র', 'পরিবার', 'বাখোল', 'কুল্যি', গ্রাম', 'পরগনা', তপ্পল', দেশ' নিয়ে যে 'সর্দার', 'মানকি', 'ঘাটোয়াল', তরফ সর্দার প্রভৃতি রাজনৈতিক তথা কৌলীন্য সিম্বল দেখা দিতে শুরু করেছিল যার অনিবার্য ফলস্বরূপ সবচেয়ে উপরের স্তরের মানুষদের বিশেষ কয়েকটি পরিবার 'রাজা' বলে পরিচিতি দিয়ে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির স্বীকৃতি নিয়ে নিজেদের 'গড়'-এর

(State) মধ্যে বসবাস শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ রাজা-প্রজার মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের সহজ ও সাধারণ প্রথাগুলিও লুপ্ত হতে শুরু করল। ঠিক ওই সময়ের বৈষ্ণব প্রভাব নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তবে ভুল হবে না।

বৈষ্ণব প্রভাব

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর নীলাচল হতে কাশী যাবার সময়, ছত্রভোগের প্রসিদ্ধ পথের পরিবর্তে উড়িষ্যার পশ্চিম দিকে যে পর্বত এবং বনাকীর্ণ প্রদেশে আছে তা ভেদ করার বিবরণ আছে।

হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি
ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।

আরেক স্থানে আছে—

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝাড়খণ্ড
ভিল্ল প্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড।

অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডবাসীরা আর্যোত্তর সংস্কৃতির বহির্ভূত ছিল বলেই 'ভিল্ল' ও 'পরমপাষণ্ড' বলা হয়েছে। ভূমিজদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যাবে যে একটি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অহিন্দু সংস্কৃতি কীভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতায় এসে, তাদের সামন্তরা সাধারণ ভূমিজদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এটাই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রবহমান ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার কুর্মি মাহাতোদের চাষি (Peasant) হিসেবে সার্থকতা, অবাঙ্গালি পুরোহিত নিয়োগের সঙ্গে গোষ্ঠী সচেতনতা ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমান মনোভাব দেখে রিজলে, গ্রিয়ারসন-এর মতামত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডালটন-এর মতানুসারে কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভূমিজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও আদিমগোষ্ঠী হিসেবে সামাজিক কাঠামোর কোনো হেরফের হয়নি। জি. এস. গুরে তাঁর মতামতে রাসেল ও হীরালালকে সমর্থন করেছেন—

'About the Gonds, they are of opinion that they immigrated into the central provinces after the establishment of the Hindu kingdoms about the sixth century A. D. Mr. Wills thinks that the Bhumias, the Binjhwars,

the Mahatos, the Korwas and others of the Bilaspur zamindaries who eke out a precarius existence by the practice of shifting cultivation in the hills were driven there by the Gonds and the Kamars who immigrated from east and the north bringing with them plough cultivation.'

বৈষ্ণব প্রভাব সম্পর্কে ড. সুরজিৎ সিংহ যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। পুরুলিয়ার প্রতিটি চাষি পরিবারে তুলসীমঞ্চ ছাড়াও প্রতিটি গ্রামে 'হরিমন্দির' ও নামসংকীর্তন, নগরকীর্তন, খোল, করতাল, ইষ্টনাম জপ, কণ্ঠি, রসকলি ইত্যাদির সঙ্গে বৈষ্ণবভোজনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব যুক্ত আছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার এত রসঘন লৌকিকরূপ আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব পদাবলি সমতল বাংলার সীমা ছাড়িয়ে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে সমস্ত নিম্নঝাড়খণ্ডী এলাকাতে। পুরুলিয়ার ঝুমুর গানের বিশিষ্ট ঢং, তাল ও উচ্চারণভঙ্গিকে আশ্রয় করে পুরুলিয়ার লোককবিদের দ্বারা রচিত হতে লাগল রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, মান-অভিমান, যা অলৌকিক ব্যাপারটার খোলস ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের দরজাতে পৌঁছে পরিণত হল লৌকিক রসাস্বাদনের এক অপরূপ ক্ষেত্রে। সুতরাং বলা যায়, পুরুলিয়ার ঝুমুর বৈষ্ণব পদাবলিকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যদিকে 'পঞ্চনাম' বৈষ্ণব উপধারার 'রতি সাধন' প্রভৃতি তান্ত্রিক যোগব্যায়াম করে 'বীর্যস্তম্ভন' প্রভৃতি প্রক্রিয়া আদিবাসী সর্দারদের আকৃষ্ট করল। 'গড়' কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরের নায়ক-নায়িকা হিসেবে আবির্ভূত হল 'নাচনী' ও 'রসিক'। নাচনীরা সমাজ পরিত্যক্ত হলেও রসিকের কাছে ভরণপোষণের দায়িত্ব তথা তাদের সন্তান-সন্ততিরা সম্পত্তির অধিকার পেত। 'নাচনী' রাখা পুরুলিয়ার সামন্ত তথা বড়চাষি ও সিউড়ো সামন্তদের কাছে এক বিশেষ মর্যাদার বস্তু হয়ে পড়েছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ, অবস্থিতি ও প্রসারণের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ভূমিজদের উপর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংমিশ্রণ। ভূমিজ সামন্তরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রুদ্ধদ্বারকে উন্মুক্ত করেছিল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' রূপে।

বৈষ্ণব ধর্মের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবেরা রাজা সর্দার ইত্যাদির কাছে বৈষ্ণব ধর্মমতের জীবন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার অস্তিত্বকে সরাসরি কোণঠাসা না করে বর্ণ ব্যবস্থার উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ও সাম্য মতবাদের সহজ সহাবস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজা ও সামন্তরা দাক্ষিণ্য প্রকাশে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের বৈষ্ণব খোলসটা খুলে যায়। রাজা ও সামন্তরাও তখন রাজপুতানা তথা অন্যান্য স্থান থেকে আগত ক্ষত্রিয়দের বংশতালিকা প্রণয়ন তথা 'আর্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বহু হাতিয়ার পেয়ে গেছে। পরস্পর পরস্পরকে

তোষণ করে সৃষ্টি হতে লাগল অসংখ্য গল্প ও কাহিনি। যখনই সামন্তরা বুঝতে পারল যে, তারা মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন থেকে শুরু হল নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে ক্ষত্রিয় আন্দোলন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

হিন্দু আগ্রাসন

অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলার 'কুড়মি' মাহাতো সম্প্রদায়ের সামন্ত বড়ো চাষি, শিক্ষিত, ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের জমি থেকে উৎপন্ন উদ্‌বৃত্ত ফসলের দৌলতে 'অখিল ভারতীয় কুর্মি' ক্ষত্রিয় মহাসভার সঙ্গে যোগদান করল। কালক্রমে মূল 'কুড়বি' বা 'কুড়মি' গোষ্ঠী সর্বভারতীয় কুর্মি জাতি হিসেবে পরিচিত হল। আধা-সামন্ত সিউডো সামন্তদের মধ্যে যে বুদ্ধিজীবী (elite) প্রেরণা কাজ করেছিল, তারই ফলে আর্যত্বের হাওয়া বইতে শুরু করল।

সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ম্যাকস্‌মূলার-এর ভাবধারায় প্রভাবিত হল। এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু দে মন্তব্য করেছেন "উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ধর্ম ও সমাজজীবনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অনেকেই জাতীয়তাবাদ বলতে হিন্দু-জাতীয়তাবাদই মনে করেন।"

হিন্দুয়ানি ও জাতীয়তা প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ে। ১৮৭১ সালে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। বলা বাহুল্য এর পর থেকেই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়। অন্যদিকে, পারসি ভাষার পরিবর্তে উইলিয়ম বেন্টিক বাংলা ভাষা চালু করলে হিন্দুদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় এ. এফ. সালাহুদ্দিন আহমদ তা উল্লেখ করেছেন—

...'When the Bengalee Language is brought into use, all the natives besides Moosoolmans, may be employed in the public service. The Moosoolmans will be driven out and never will be able to read and write Bengali.'

১৯০৫ সালের লর্ড কার্জন-এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা প্রদেশে প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ মুসলমান হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য হিন্দু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা করল। আর্য মহাসভা, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সংগঠন নিম্নবর্ণের ও অন্ত্যজ বর্ণহিন্দু মানুষদের কাছে 'দ্বিজত্ব' (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) প্রাপ্তির সরলীকরণ করে সামাজিক সংস্কার করতে শুরু করলেন। জাতি সভাগুলিও তখন নিজ নিজ গোষ্ঠীকে সামাজিক মর্যাদা দেবার জন্যে সক্রিয়। ১৯৩১ সালের

জনগণনা অনুসারে সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী উচ্চবর্ণ হিন্দু তথা মুসলমান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যে দাবি উত্থাপন শুরু করেন তা নিম্নরূপ।

জাতি ও গোষ্ঠী	নূতন দাবি
১। বাভন	ভূমিয়ার ব্রাহ্মণ
২। বরহি কামার	বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ
৩। ভাট	ব্রহ্মভাট, ব্রাহ্মণ
৪। হাজাম, নাপিত, নাই	নাই ব্রাহ্মণ, কুলীন ব্রাহ্মণ
৫। খাতি, ছুতার	যজ্ঞিদা ব্রাহ্মণ
৬। বরাইক	যদুবংশী ক্ষত্রিয়
৭। দুসাধ	গোহলাট রাজপুত
৮। গোয়ালা, আহির, গোপ	যাদব, যদুবংশী ক্ষত্রিয়
৯। কালয়ার	হৈহেয় ক্ষত্রিয়
১০। কুইরী	কুশহাওয়া ক্ষত্রিয়
১১। কুর্মি	কুর্মি ক্ষত্রিয়
১২। শুঁড়ি	শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয়
১৩। জোলা	শেখ, শেখমোমিন

বাংলা প্রদেশেও ঠিক অনুরূপভাবে সামাজিক আন্দোলন হতে থাকে। দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন "হিন্দুর দুর্ভাগ্য তাই আর্য্য হিন্দু সন্তানগণ আর আপনাদিগকে আর্য হিন্দুজাতি (Hindu Nation) না বলিয়া নিজদিগকে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, করণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, কামার, কুমার, গোপ, নাপিত জাতি বলিয়া পরিচয় দেয় ও মনে করে।" তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে "কায়স্থ, রাজবংশী, ঝালমাল, গোপ, করণ, কর্মকার, মাহিষ্য, কোচ, শুঁড়ি, হদি, পোদ, পুঁরো, নট, আগুরী, বাগদী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশধর, রাজপুতানার ঝল্লমল্লক্ষত্রিয়, যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়, ঘশক্ষত্রিয়, শৌণ্ডিক ক্ষত্রিয়, হৈহেয় ক্ষত্রিয়, পৌনড্র ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।"

১৯৩১ সালে বাংলা প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২১,৫৭,০৪০৭ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭,৪৯৭,৬২৪ অর্থাৎ

মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ। হিসেবমতো দেখা যায় যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০.৩%, অন্যদিকে, ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত জনসংখ্যা ৭.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অধ্যাপক তারকচন্দ্র দাসের মতে রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কোনোভাবে এর ব্যাখ্যা করা চলে না। জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দুরা ১৯৩১ সালে সেন্সাস বয়কট করেছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের লোকগণনার সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকরাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি করে দেখান।

১৯১১ সালে বাংলা প্রদেশ থেকে বিহার ও উড়িষ্যার পৃথকীকরণের সময় বাংলাভাষী মানভূম জেলাকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ঘটনাকে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতা বরদাস্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে, কাছাড়, লখিমপুর, ডিব্রুগড় পর্যন্ত উত্তেজনার ঢেউ অসমের বাংলাভাষী অঞ্চলে আছড়ে পড়ে। সমগ্র ছোটোনাগপুর, সাঁওতাল পরগনাসহ মানভূমকে নিয়ে ভাষার প্রশ্নে মধ্যবিত্ত বিহারী, উড়িয়া ও বাঙালি মানসিকতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাঁচির খ্রিস্টান মিশনারিদের প্ররোচনাতে আদিবাসী মধ্যবিত্ত নেতৃত্বও ছোটোনাগপুর সম্পর্কে সজাগ। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ১৯১৯ সালে মানভূম জেলার দুজন মূলবাসী ছাত্র রাজকিশোর মাহাতো ও মদনমোহন মাহাতো ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং মধ্যবিত্ত জীবন শুরু করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন, তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ মূলবাসীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও বেশি জাগ্রত হয়।

১৯০৯ সালে দেবচক্র মাহাতোর নেতৃত্বে পুরুলিয়ার বিশিষ্ট উচ্চবর্ণ হিন্দু আইনজীবীদের সহযোগিতায় 'কুর্মি বাইশি' অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পুরুলিয়ার (তৎকালীন মানভূমের) মাহাতোদের ভাষা বাংলা এবং বাংলাপ্রদেশে যোগদানের কথা বলা হয়। কিন্তু পঞ্চকোট মহারাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংহদেও ও বিহারের কায়স্থ নেতা সচ্চিদানন্দ সিংহ এর বিরোধিতা করেন। ১৯১১ সালে অখিল ভারতীয় কুর্মি মহাসভার নেতা মিথিলাশরণ সিংহ মানভূমের কুর্মিরা বিহারের হিন্দিভাষী কুর্মিদের একটি অংশ—এই দাবি এবং মানভূম প্রশ্নে বিহারের দাবিকে জোরদার করে তুলতে থাকেন। ১৯২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'স্বরাজ দল' গঠন করার পর, মানভূম জেলাতে অনেক সাধু মহারাজদের আগমন ঘটতে থাকে। লক্ষ্মণপুর, মাগুড়া, লাখরা, কেশরগড়, হুটুমুড়া, কেতুকা প্রভৃতি স্থানে তাঁরা স্থানীয় লোকেদের কাছে হিন্দুধর্মের প্রচার চালাতে থাকেন। ১৯২৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস 'নেহরু কমিশন' গঠন করে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আন্দোলন শুরু করে। ১৯২৬ সালে 'সাইমন কমিশন' হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী তথা তপশিলি জাতি, রাজমহারাজাদের নির্বাচনের জন্যে পৃথক পৃথক আসন সংরক্ষণের জন্যে সুপারিশ করেন। ১৯২৯

সালে (১৩৩৫ সালের ২৯ চৈত্র) ঘাঘরজুড়ি কুর্মি-ক্ষত্রিয় মহাসভাতে পৌরোহিত্য করেন পঞ্চকোট মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও। কুর্মিরা মহারাজকে নিজ গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করলেও ব্রাহ্মণ্যবাদ পুষ্ট বংশাবলীতে তাঁদের 'ধারা-নগরের' রাজপুত ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, ০৯.০৪.২৯ তারিখে মহারাজা তাঁর ২১ নম্বর চিঠিতে কাঁসাইপার পরগনার গুগুই গ্রামের শ্রীলহবত মাহাতোকে 'পরগনোত' হিসেবে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি উক্ত সভার উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করলেও চিঠিতে স্বীকার করেন নি যে, তিনি কুর্মি জাতির লোক। অন্যদিকে 'সেরাইকেল্লা' রাজ্যের মহারাজা 'কুর্মিজাতি ক্ষত্রিয় ও জলচল' কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন সর্বশ্রী শরৎকুমার আচার্য, এম. এ., দিবাকর আচার্য, ন্যায়াধীশ সত্যানন্দ পাণ্ডা, ড. জে. সি. বাগচী, কমিটির সেক্রেটারি শ্যামাপদ ষড়ঙ্গী এবং সভাপতি ছিলেন রাজকুমার এন. এন. সিংহেদেব বি. এ.। কমিটি ১৬.০৭.৩০ তারিখে রিপোর্ট দাখিল করে বলে যে, কুর্মিরা 'জলচল' কিন্তু ক্ষত্রিয় নয়।

সত্যাগ্রহ ও সংরক্ষণ

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ঝালদার সত্যমেলার সামনে এক বিরাট মিছিলের আয়োজন করা হয়। 'কুর্মি ক্ষত্রিয় দিবাকর' পত্রিকার সম্পাদককে রাজকিশোর মাহাতোর লিখিত ১৬ নভেম্বর ১৯৩০ সালের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি এক নূতন চিত্র— "জানুয়ারি মাসের শেষদিকে ঝালদার সত্যমেলায় সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে, পাঁচ জন ঘটনাস্থলেই শহীদ হন, ১০০ জন বন্দী হয় এবং ৩০ জন আহত হয়।... সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হবার আগেই শীর্ষস্থানীয় কুর্মীনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, যেমন শ্রীগোপীনাথ মাহাতো, মড়িরাম মাহাতো, রজনী মাহাতো এবং বৃন্দাবন মাহাতো। যাঁরা শহীদ হন তাঁদের নাম সহদেব মাহাতো, গণেশ মাহাতো, গোকুল মাহাতো, মোহনচন্দ্র মাহাতো এবং শীতল মাহাতো।" ১৯৩১ সালে পুরুলিয়াতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কুর্মিক্ষত্রিয় মহাসভাতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩১ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'কুর্মি ক্ষত্রিয় প্রভাকর' পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে আমরা জানতে পারি নিম্নলিখিত তথ্য। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মৌলানা মহম্মদ আলিসহ দেশবরেণ্য নেতাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশসহ ব্রিটিশ শাসনে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসন-ভোগকারী দেশগুলির মতো ভারতও যাতে স্বায়ত্তশান লাভ করে এবং গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের মর্যাদা দিতে পারে তার প্রস্তাব

গ্রহণ করা হয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও সূত্র ধরে এ কথা স্বীকার করা হয় যে, মানভূমসহ দেশের অন্যান্য কুর্মি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর হওয়ার জন্যে অন্যূন দশ বছরের জন্যে বিধানসভা নির্বাচনে কুর্মিজাতির জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখা হোক। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন রাজকিশোর মাহাতো এবং সমর্থন করেন রাঁচির আইনজীবী করমসিং মাহাতো। কিন্তু সাইমন কমিশন-এর সুপারিশমতো যখন দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক তৎপরতা চলছে, ঠিক তখনই ১৯৩১ সালের লোকগণনাতে আদিম জাতিগোষ্ঠীর তালিকা সংশোধনের সময় অসম উপত্যকার 'কাছাড়ি' উপজাতি এবং ছোটোনাগপুর বিভাগের 'কুর্মি মাহাতো' উপজাতিকে আদিম জাতি গোষ্ঠীর সরকারি সূচি থেকে বাদ দেওয়া হল। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ. জি. লেসির মন্তব্য অসাধারণ :

It may be questioned whether this movement is calculated to promote the best interest of the Kurmi-Mahato community. As aboriginals they receive the benefit of a special measure of protection from the Revenue Laws of Chotanagpur, for instance, the transfer of their holdings to non-aboriginals is not permitted. It may be that the true position in this respect is not appreciated by many of them. On the other hand, they may be prepared to forego such privileges for the greater honour and glory which they believe will acquire to them in their new status, and it is quite true that in view of their material prosperity, they do not stand in the same need of protection as the other aboriginal tribes of the locality. As already stated it is not possible to give accurate statistics of the Kurmi-Mahato community, but something over 660,000 kurmis were enumerated on the Chotanagpur plateau, and the overwhelming of these (about half of whom were found in Manbhum District) would undoubtedly be Kurmi-Mahatos.

কিন্তু মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড, পশ্চিমবাংলার রাজবংশী, কোচ তথা অন্যান্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছোটোনাগপুরের কুর্মি মাহাতোদের অপেক্ষা অগ্রসর গোষ্ঠী হলেও তাঁরা কিন্তু আদিম জাতিসূচি থেকে বাদ পড়েন নি।

কুর্মি-মাহাতোদের আদিম অধিবাসী সূচি থেকে বাদ দেওয়ার কারণ নিম্নরূপ : (ক) মানভূম জেলার মূল-অধিবাসীদের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান (খ) পাঁচজন কুর্মি-মাহাতো শহিদ হওয়ার ঘটনাটি সমস্ত জেলাকে রাজনৈতিক সচেতন করে তোলে। (গ) হিন্দু-মুসলমান সংখ্যার প্রশ্নে কুর্মি-মাহাতোরা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হন। কারণ আর্য সমাজ ও হিন্দু-মহাসভার অনুপ্রেরণায় তখন 'পৈতা'

গ্রহণ ও 'সংস্কার' আন্দোলনে সিউডো সামন্তরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্যদিকে কোর্ট-কাছারির উচ্চবর্ণের উকিল-মোক্তারা তাদের 'ওকালত'নামাতে সরাসরি ধর্মের স্থানে 'অ্যাবরিজিন্যাল' কথাটির বদলে 'হিন্দু' লিখতে শুরু করেন। কারণ ১৯২৫ সালে পাটনা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি ম্যাকফারসন, কৃত্তিবাস মাহাতো বনাম বুধন মাহাতানীর মোকদ্দমার রায় দানকালে মন্তব্য করেছিলেন—

'The term aboriginal in Chotanagpur denotes race only and implies nothing as to religion, on the other hand, the term Hindu has in Chotanagpur reference only to religion'.

সব মিলিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে কুর্মিরা আদিবাসী সূচি থেকে বাদ পড়ল।

পৃথক রাজ্য আন্দোলন

১৯৩২ সাল থেকে আবার বিহার ও উড়িষ্যার পৃথকীকরণের আন্দোলন সোচ্চার হতে লাগল। মানভূমের বাংলাপ্রদেশে যুক্ত হবার দাবি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সরকার নিয়োগ করলেন ১৯৩৩ সালে ওড্যানেল কমিটি। উৎকল-সমাজের উচ্চবর্ণের নেতারা উড়িষ্যার ছাব্বিশটি স্বাধীন রাজ্যসহ বাংলার তমলুক, খড়গপুর, বাঁকুড়া জেলার খাতড়া, ছাতনা, ইন্দপুর এবং মানভূম জেলার বলরামপুর, বরাবাজার, হুড়া, পুঞ্চা, পটমদা, চাণ্ডিল, ইচাগড়, মানবাজার থানাগুলি দাবি করলেন পৃথক উড়িষ্যা রাজ্যের জন্যে। অন্যদিকে, বিহারের মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগনাসহ উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ রাজ্য বঙ্গভুক্তির জন্যে দাবি করলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ নেতা।

বিহারের নেতা সচ্চিদানন্দ সিং, কৃষ্ণবল্লভ সহায়, দেবশরণ সিং ও বীরচাঁদ প্যাটেল দাবি করলেন মানভূম, সিংভূম সেরাইকেলা, খরসঁয়া বিহারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে। উচ্চবর্ণও উচ্চশিক্ষিত মানুষদের এ এক বিচিত্র খেলা! মুসলিম লিগের ক্রমাধিপত্য তাদের সকলকেই তখন সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। উড়িষ্যার বি. এন. মিশ্র ১১.০২.৪৪ তারিখে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-কে যে চিঠি লেখেন তাতে স্পষ্ট এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

'In view of the fact that under the reform in Bengal and predominant muslim-majority next to Bengali Hindus, the hopeless minority of Oriyas would be worst than you.'

হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য বাড়াবার ঘটনা উল্লেখ করে শ্রীভ্রাম্যমান মন্তব্য করেন যে, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ঝাড়গ্রাম, গিধনী, শালবনী, ঘাটশিলাতে সাঁওতাল, কুর্মি,

লোধাদের সরাসরি হিন্দু করার চেষ্টা করতে থাকেন। পুরুলিয়াতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত অনুরূপ চেষ্টা চালান।

মানভূমের চাষি-নেতৃত্বের সামনে এই সময় 'ভদ্রলোক' মানসিকতার ছাপ জোর করেই চালু করা হয়। ১৩৪১ ও ১৩৪২ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকাতে শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করলেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। শ্রীশরৎচন্দ্র রায় 'মানভূম জেলায় সাহিত্য সেবা গবেষণার উপাদান' নামে একটি মূল্যবান সচিত্র প্রবন্ধে কুর্মি-মাহাতো, মাল ভূমিজ প্রমুখের সামাজিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। রাজকিশোর মাহাতো ও তাঁর পরিবারের ছবিতে ক্যাপসন আছে 'মানভূম জেলার একটি শিক্ষিত কুড়মি ভদ্রলোক' ও 'মানভূম জেলার একটি শিক্ষিত কুড়মি পরিবার', কিন্তু পাশাপাশি, ভূমিজ, দেশওয়ালি, বাউরি, সাঁওতাল প্রভৃতি ছবিতে এই ধরনের ক্যাপসন অনুপস্থিত।

গোষ্ঠী চেতনা

এরপর থেকেই কুর্মিদের মধ্যে দুটো সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণির কথা শোনা যেতে পারে। যদিও এই পৃথকীকরণ এখনও কুর্মিদের গোষ্ঠী সচেতনতার বাধাস্বরূপ হয়ে উঠেনি। যে সমস্ত কুর্মি-মাহাতোদের কাছে 'বাঁধ', 'বাগান', 'বেড়', 'বন্দুক', 'বাঁধাড়', 'বহাল', 'ব্যান', 'বাগাল' আছে, তাঁরা নিজেদের 'বুনিয়াদি' বলে আত্মপ্রকাশ করে নিজেদের মধ্যে গর্ব অনুভব করতে লাগল। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর 'বুনিয়াদি' স্তরের মানুষরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও সজাগ হয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির গ্রামীণ এজেন্ট হিসেবে পরিচিত হলেন। এঁরা একাধারে বড়চাষি, মহাজন, প্রাথমিক শিক্ষক, স্কুলের সম্পাদক (প্রাথমিক, জুনিয়র, উচ্চমাধ্যমিক), পোস্টমাস্টার, আমিন, ডিভরাইটার, রাজনৈতিক দলের কর্মী, জেলার বড়ো নেতার আত্মীয়, দারোগার ও বি. ডি. ও.-র টাউট, উকিলের ট্যাঁড়, মোক্তার, ডাক্তারের এজেন্ট (হাতুড়ে ডাক্তার), রেশন দোকানের মালিক, পে-মাস্টার, মোহরার, কোনো সৎসঙ্গের ঋত্বিক, অঞ্চলপ্রধান, বা সদস্য, গ্রামীণ বিবাদের শালিশীকারক, ছো-নাচ ও নাচনী নাচের সংগঠক, গ্রামের ক্লাবের বা যাত্রাপার্টির কর্ণধার, হরিনাম সংকীর্তনের মূল গায়ক বা বাদক, সামাজিক ক্রিয়াতে (যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে) মাতব্বর।

উপরোক্ত গুণরাশিকে এক জীবনে আস্বাদ পাবার জন্যে এবং গ্রামীণ ক্ষমতার তুঙ্গে পৌঁছোবার মোহ থেকে পুরুলিয়ার মাটির সন্তানরা বৃহত্তর জীবনের আঙিনায় প্রবেশের প্রতিযোগিতা থেকে সব সময় দূরে থাকতে চায়। পুরুলিয়াকে ঘিরে একটা 'Process of withdrawal' চলছে আজও। অন্যদিকে আদিবাসী ও তপশিলি জাতিগোষ্ঠীর যুবকরা

সংরক্ষিত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'অনেক পেয়েছি' ভেবে জ্ঞান, বিজ্ঞান তথা সুকুমার বৃত্তির চর্চায় একেবারে পিছিয়ে পড়ছেন। যত বেশি সাংস্কৃতিক ও লেনদেনের ফাটল পড়েছে তত বেশি তাঁরা নীরব হয়ে পড়েছেন, চলছে Memocide প্রক্রিয়া।

উচ্চবর্ণ বাংলাভাষী হিন্দুদের সঙ্গে পুরুলিয়ার মূলবাসী মানুষদের সম্প্রীতি তথা নৈকট্যের বাধা হিসেবে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক সিম্বল (Cultural markars) বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে বিবর্তিত হয়ে আজ প্রতিভাত, তা প্রকাশ পায় তাদের লেনদেনের মাধ্যমে। অবশ্য মূলবাসীরা দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষমতার শিখরে উঠতে শুরু করেছেন। পুরুলিয়ার খেটে-খাওয়া চাষি মানুষকে একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও কর্মসূচি রাজনৈতিক সচেতন করেছে, ঠিক ততটাই নিজেদের গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেও সচেতন করেছে।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

১৯৪৮ সালে লোকসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠার পর তাদের ক্ষমতাচ্যুতিসহ বহু রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সম্প্রীতি ও নৈকট্যের বাধা দূর হওয়া তো দূরের কথা 'রিসোর্স্' এর ভাগীদার হিসেবে সংঘাত বরং বেড়েছে। উচ্চবর্ণ বাংলাভাষী হিন্দুদের সাংস্কৃতিক সিম্বল বা কালচ্যারাল মারকার্সগুলো নিম্নরূপ—

(ক) যারা 'বিশুদ্ধ' বাংলা উচ্চারণসহ কথা বলতে পারেন।

(খ) যাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তাম্বুলী, গন্ধবণিক এবং যাদের উপাধি চ্যাটার্জি, ব্যানার্জী, ঘোষ, বোস, দত্ত, সেনগুপ্ত, সেন, দাশগুপ্ত ইত্যাদি।

(গ) যাঁদের স্ত্রীলোকরা স্নান করে রান্না করেন, সন্ধ্যাবেলা পুনরায় গা ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় পরেন।

(ঘ) যাঁদের মেয়েরা বিপদতারিণী, জামাই ষষ্ঠী, ভাইফোঁটা, দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী ইত্যাদি তিথি পালন করেন।

(ঙ) যাঁদের মেয়েরা খেতে-খামারে উৎপন্ন ফসল যেমন, ধান, চাল, তরকারি প্রভৃতি বিক্রি করার জন্য হাটে-বাজারে যান না।

(চ) যাঁরা নিজেরা কখনই নিজ হাতে চাষ করেন না।

(ছ) 'মহাজনী' করে সম্পত্তি করার মধ্যে কোনো পাপ-পুণ্য তো দূরের কথা, বিবেকের দংশন পর্যন্ত অনুভব করেন না।

(জ) যাঁরা 'ওজন', 'পরিমাণ' ও 'মুদ্রা'র ব্যাপারে নিপুণ।

(ঝ) যাঁরা কুঁচি করে শাড়ি পরেন, সঙ্গে অন্তর্বাস ও ব্লাউজ পরেন। যাঁরা চুল বাঁধেন বিনুনী ও খোঁপা বেঁধে।

(ঞ) যাঁদের মেয়েরা মাথায় 'ব্যাসাম' নিয়ে মাঠে যান না।

অন্যদিকে পুরুলিয়ার মূলবাসী হড়-মিতানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারে সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলো নিম্নরূপ—

(ক) যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলবদ্ধ নাচ ও গান করেন।

(খ) যাঁরা 'কুরমালি', মানভূঁয়া অথবা 'ঠার' সাঁওতালি এবং 'রাড়ুয়া' ভাষাতে কথা বলেন।

(গ) যাঁদের সাঁঘা বা দ্বিতীয় বিবাহ সমাজকর্তৃক স্বীকৃত।

(ঘ) যাঁদের 'সিনান হাঁড়ি' নাই।

(ঙ) যাঁদের মেয়েরা 'ব্যাসাম' নিয়ে মাঠে যান এবং চাষের সমস্ত রকম কাজে পুরুষদের সাহায্য করেন এবং উৎপন্ন উদ্‌বৃত্ত ফসল হাটে, বাজারে বিক্রি করর জন্যে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেন।

(চ) যাঁদের করম একাদশী, টুসু, ভাদু প্রভৃতি ব্রত আছে এবং যাঁরা দুর্গাপূজা অপেক্ষা সোহরাই বা বাঁদনা পরবকে এবং টুসু পরবকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

(ছ) যাঁদের ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রার ব্যাপারে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব।

(জ) যাঁরা 'ঠেঁঠি' পরেন এবং চুল বাঁধেন 'খঁসা ও 'চুটু' করে।

(ঝ) যাঁরা ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিতে চান না। মহাজনের ঋণশোধ করাকে যাঁরা পরমপুণ্য বলে মনে করেন।

(ঞ) যাঁরা নিজেরা চাষ করেন এবং যাদের পদবি মাহাতো, সরদার, মাঝি, কুইরী, রাজোয়াড় ইত্যাদি।

পুরুলিয়াতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কমে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। জেলার শিক্ষিত মূলবাসীরা ভদ্রলোক (বাঙালি) মানসিকতাতে উঠবার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, গণসংস্কৃতির (Core culture) মানুষ তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান ও ধারণাকে নিয়ে দারিদ্র্যের বর্মের মধ্যে বাঁচার চেষ্টা করছেন। গণসংস্কৃতি থেকে কোনোক্রমে উঠে যাঁরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে অ, আ, ক, খ-র পাঠ শুরু করেছেন, তাঁদের কাছেই শহুরে সংস্কৃতির ধাঁধা ও চমক বেশি করে লাগছে। সামান্য লেখাপড়া শিখে নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানবার বা ভাববার সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন না। তাই জেলার সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলো আধুনিকতার প্রভাবে লুপ্ত হতে চলেছে। শহর মানসিকতার স্বচ্ছন্দজীবন পরিচর্চার ক্ষেত্রে যে সৃজনশীল চিন্তা, ভাবনা ও আড্ডার প্রয়োজন পুরুলিয়ার মূলবাসীরা তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেনি বলেই সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কলকাতা কেন্দ্রিক ব্যক্তি, মানসিকতা ও প্রতিষ্ঠান।

//

ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীত

দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, বৈতরণী, বুড়াবালাম, কোয়েল, কুইলী, সঞ্জয়, কনহর, কারো, অজয়, ময়ূরাক্ষী, বরাকর বিধৌত একটি সুস্পষ্ট বিশাল ভূখণ্ড যা মূলত প্রাচীন গণ্ডোয়ানার একাংশ— তারই ঐতিহাসিক নাম ঝাড়খণ্ড। একদা নাগদেশ এবং দশারণ্য নামে খ্যাত এই বিশাল ভূখণ্ডের একদিকে রাজমহল পর্বতমালা, মধ্যভাগে দুমকার হিজ্‌লা, রাঁচির জনা-জারগা, চাঁন্দোগা, বড়গড় ও পালামৌর পাট। পুরুলিয়া বাঘমুণ্ডীর অযোধ্য পাহাড় ও সিংভূমের দালমা, পাওড়া, কিরিবুরু, রায়রঙ্গপুরের বাদাম পাহাড় একেবারে এর মধ্যভাগে। অন্যদিকে, ময়ূরভঞ্জের সুবিশাল শিমলীপাল পাহাড়। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, আর পুরুলিয়ার পাঞ্চেত যেন এর ভিতকে শক্ত করছে।

খড়গপুরের কাছে সমতল বাংলার যেখানে শেষ, সেইখান্ থেকেই শুরু ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির করম বা করমা নাচ ও সুরের গুঞ্জরণ, শেষ তার রায়পুর, সুরগুঁজা, পালামৌতে। সাঁওতাল পরগনার গোড্ডা থেকে শুরু করে ময়ূরভঞ্জ কেঁওনঝোরের প্রত্যন্ত গ্রামে টুসু বা সোহরাই সুরের অনুরণন। দাঁসাই সোহরাই, নওয়াখিয়া, বাহা শারুল, জিতুয়া, রজঃ উৎসব ও সুরের মাদকতা ; ছো, পাঁতা, ভূঁয়াঙ্গ, নাটুয়া, ডাহের, পাইক, দংগেড় নাচের দীপ্তিময় পদক্ষেপ ; ঢাক ঢোল, ধমসা, মাদল, বাঁশি, তুরুধুতু, সেহনাই, রামশিঙ্গা, রেগড়াটামাকের বাজনাতে এবং ডোমকোচ ও ঝুমুরের মূর্ছনাতে উদ্‌বেলিত হয় এই অঞ্চলের মানুষ।

ভারতীয় উপমহাদেশে এই বিশাল ভূখণ্ডের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তারা, যাঁরা হলেন সাঁওতাল, ভূমিজ, মুদি, রাজোয়াড়, দেশওয়ালী, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাল, মাহলী, লোধা, খেড়িয়া, চিকবড়াইক, অসুর, আহীর, বাগাল, মাহাতো, নাগেশিয়া, কোরোআ, বীরহোর, বাউরী, হাড়ি, ডোম, মুচি, ঘাসি, প্রধান, বেনে, শুঁড়ি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, রাজপুত, ভুঁইয়া, ভঞ্জপুরাণ, করণ, খণ্ডায়েত প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর বহু মানুষ। ভারতের রাজনৈতিক প্রয়োজনে আজ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বিহার, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক সীমানাতে বিভক্ত। কিন্তু ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যকে ধরলে নৃ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলটিকে ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতিক্ষেত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে।

সংস্কৃতি ব্যবসা

কলকাতা, পাটনা ও ভুবনেশ্বর কেন্দ্রিক তথাকথিত 'সংস্কৃতিবান' শিল্পী, গায়ক, আবৃত্তিকার, সিনেমা পরিচালক, নাটককার, লেখক, কবি বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্যে আজ ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতির যে গোষ্ঠীগত ও সংহতিপূর্ণ উৎকর্ষ তাকে বাণিজ্যিক প্রথা ও পদ্ধতিতে হজম করে, মধ্যবিত্ত মানসিকতার চরমপ্রাপ্তি বলে মনে করে সংস্কৃতির 'সার্থক রূপকার' হিসেবে চিহ্নিত হন। ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির যৌথ কর্মপ্রেরণা, গোষ্ঠীসত্তার উপরে ওঠে আঞ্চলিক সংহতির সামগ্রিক সৃষ্টিকে যাঁরা তিল তিল করে জন্ম দিয়েছেন, সগর্বে লালন করে যা এক বহতা স্রোতের মতো রেখেছেন, সেই পরম্পরাগত মূল্যবোধকে বোঝবার তাঁরা চেষ্টা করেননি। গায়কী ঢং, উচ্চারণ ভঙ্গি তথা বিষয়বস্তুর গভীরে না গিয়ে শহরজীবনে লালিত-পালিত মানুষজনের কাছে যা পরিবেশন করেন তাই নগরকেন্দ্রিক শ্রোতাদের কাছে নূতন ও অভিনব বলে মনে হয়। লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে বহু দূরে থাকা এই মানুষগুলি কলকাতার শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে ওই সমস্ত শহুরে শিল্পীর বিকৃত ও যান্ত্রিক পরিবেশনাকে বাহবা দেন। বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টেলিভিশনের প্রভাবে সর্বৈব নিয়ন্ত্রিত কলকাতার নগরমনস্ক মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা তাই আজ 'ব্যক্তি' সুরকার, গায়ক তথা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও বাহবা পান। প্রেক্ষাগৃহের একটি টিকিট সংগ্রহ করা স্ট্যাটাস হয়ে দাঁড়ায়। রেডিয়ো মারফত কোনো নাটকে 'বটেক' 'বটেক' শব্দ সংবলিত নাটক শুনে আদিবাসীদের সম্বন্ধে তীব্র এক হাস্যখোরাকযুক্ত আকর্ষণ খুঁজে পান অনেকেই। অন্যদিকে, আকাশবাণী-খ্যাত অন্যান্য বিশিষ্ট আবৃত্তিকার কবিতা পাঠ করেন, আবৃত্তি করেন না, না সেগুলো কবিতা, না ঠিক ঝাড়খণ্ডী কথ্যভাষা। অথচ ব্যবসায়িক সাফল্যের আনন্দে এরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূমের ভাষাকে ব্যঙ্গ করেন। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরা 'কিউরিয়ো বস্তু' শুনে হাততালি দিয়ে আবৃত্তিকারকে অভিনন্দন জানান। মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' থেকে শুরু করে শান্তিগোপালের 'কালপুরুষ'-এ একই চিন্তাভাবনা।

'কিউরিয়ো হানটিং' মনোবৃত্তি আজ শহুরে মানসিকতার তথাকথিত সংস্কৃতিবান মানুষের 'ইগো স্যাটিসফ্যাকশন'। তাই আকাশবাণীর বসু-ঘোষরা আঞ্চলিক কবিতার আসরে বাজার মাৎ করেন। এন. এফ. ডি. সি. ও ফিল্ম ডিভিশনের দৌলতে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে 'বৈপ্লবিক' ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার লেখক কলা-কুশলীদের অনেক 'কুলীন' প্রগতিবাদীরা দিব্যি সংস্কৃতি ব্যবসা করে খাচ্ছেন। ডোকরা, বাঁকুড়ার ঘোড়া, ছো-এর মুখোশ ড্রইংরুমের শোভাবর্ধন আর করছে না। ক্যামেরা নিয়ে কাকমারাদের পিছনে তথা আদিবাসীদের

পিছনে শহরের 'বাবুরা' গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন। কৃষক উচ্ছেদ, জমি হড়প, মহাজনী শোষণের পর শিল্পকর্মের নামে এ এক নূতন উপদ্রব। টেপরেকর্ডার আরও ভয়াবহ। গ্রামের সাধারণ অজ্ঞ অধিবাসীর সামনে ওই যন্ত্রটি চালিয়ে বাবুরা গান রেকর্ড করে তাদের শুনিয়ে নিয়ে এলেন শহরে। হঠাৎ রেডিয়োতে শোনা গেল ওই গানের কথাগুলো নিয়ে কলকাতার গায়কী ঢং-এ, সুরের মধ্যে একটু হেরফের করে অনেকেই হয়ে যাচ্ছেন প্রসন্ন চিত্তে সুরকার, গীতিকার ও গায়ক।

রেকর্ড কোম্পানিগুলি শহরের মানুষের চাহিদা বোঝেন। রেকর্ড করার জন্যে তাঁদের বহু সুন্দরীর ভিড় সামলাতে হয়। কর্তৃপক্ষের পেয়ারের লোকদের দিয়ে গান রেকর্ড করে তাঁরা বাজার মাৎ করেন। অনেক সময় কত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে! তাদের দেখারও সময় নেই কীভাবে কোনো চক্রবর্তী মহাশয় সুরকার, গীতিকার, গায়ক হিসেবে ঝাড়খণ্ডী মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করল। কিংবা টুসু লৌকিক দেবীকে 'ছুঁড়ি' বলে টুসুর ভাবমূর্তিকে হেয় করলে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ঝাড়খণ্ডী মানুষজনের ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্পের নামে বাণিজ্যিক পণ্যের রমরমা 'নিউ মার্কেট'। মানুষগুলো কেমনভাবে আছে তা দেখার সময় নেই কারুর। পাতাল রেলে কর্মরত পার্ক স্ট্রিটের কাঁশডুংরীতে মাহাতো ও সাঁওতাল পল্লিতে এরা কেমন আছে তা দেখারও এদের ফুরসৎ নেই। অর্থাৎ চিরকালীন উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক ঝাড়খণ্ডী মানুষদের সম্বন্ধে অনীহা বরং আগের চেয়ে বাড়িয়ে এদের শিল্প-উৎকর্ষগুলিকে যত তাড়াতাড়ি নিজেদের কোম্পানির 'কপি-রাইট' অধিকারে আনা যায় ততই মঙ্গল। আদিবাসী, মূলবাসী ঝাড়খণ্ডের মানুষের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের সাংস্কৃতিক 'ভাইরাস'দের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে লাগলেন, তাঁরা চিহ্নিত হলেন 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে।

প্রতিবাদের সুর

এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীতের বিপ্লবী প্রতিরোধের কথাই আলোচিত হবে। যেখানে ঝাড়খণ্ডের মানুষ গেয়ে উঠত :

ডুংগুরীর উপরে কেরে ঝাঁটি কাটে?
হামি বঠি গো নাগবংশী রাজার বেটা
সরু দাতন কাটি।

(গায়ক— গোকুলচন্দ্র মুণ্ডা, গ্রাম— চালুনিয়া, পো— কেন্দাডাংরা, ভায়া— চাকুলিয়া, জেলা— সিংভূম।)

অন্যদিকে, রাজাদের প্রতি আস্থা নিয়ে পরম্পরাগত ট্যাঁড়গীত তারা গাইত :

জায়ুথিলি কেঁন্দুঝরি
কেন্দুপাচি ছিলা গণ্ডাচারী
মুই সেই কেঁন্দু লেঁই
রাজাকু ভেঁটলি।

(গায়ক— সনাতন পাত্র, গ্রাম— রিমিল, পো— চম্পুয়া, উড়িষ্যা)
আবার আরও একটি ট্যাঁড়গীত :

ই ডুংরী উ ডুংরী
পিয়াল প্যাকেছে।
বেধুয়া শালা খ্যাল ভরা
হামকে ভেলকাছে।

(গায়ক— রবি লোচন পাতর, গ্রাম— ভাকুয়াডি, পো— সোনাহাতু, জেলা— রাঁচি, বিহার)

ইতিহাসের নাগবংশী রাজাদের বংশধর মুণ্ডা ও ভূমিজরা জঙ্গলে আর সরু দাতন কাটতে পারছে না। শাল-জঙ্গল শেষ হতে চলেছে। কেঁন্দু পাকা ফল নিয়ে রাজার দরবারে যাওয়ার সরলতা হারিয়ে গেছে কবে। পিয়ালের টক-মিঠা স্বাদ আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আদিবাসী ও কৃষকদের জঙ্গলকেন্দ্রিক অর্থনীতি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। জঙ্গলে নতুন গাছের, নতুন আইনের আমদানি করেছে বনবিভাগ। ইউক্যালিপটাস আর সোনাঝুরি— সরকারি ভাষ্যে সোনার গাছ। পাঁচ বছরের মধ্যে সাইজ করে কেটে খুব সহজেই শহরের কাগজ কলগুলিতে পাঠাতে পারা যায়। একচেটিয়া ধনী ও পুঁজিপতিদের কাছে সোনা এই গাছ। অথচ আদিবাসীদের কাছে এই গাছের কোনো মূল্য নেই। মৌমাছি বসে না এই গাছে। পাখি বাসা বাঁধে না এই গাছে। পাতাগুলি শুধু জ্বালানি করতে পারে তারা। অথচ শালগাছের শালপাতা, শালধুনো, শাল দাতন, শালফুল, শালফল সবই প্রয়োজনীয় আদিবাসীদের কাছে। তেমনি কেঁন্দুপাতা আর কেন্দুফল। পিয়াল, মহুয়া, হরীতকী, বহড়া, আমলকী, করঞ্জ, নিম প্রায় শেষ। অথচ দ্রুত বর্ধনশীল ইউক্যালিপ্‌টাস ও সোনাঝুরি গাছগুলো আসলে মরুভূমির গাছ। সামান্য জল পেলেই তা বড়ো হয়ে ওঠে। মাটির সামান্য আর্দ্রতাও তারা শুষে নেয়। ফলে ঘাসও জন্মায় না ওই গাছগুলির নীচে। তাই ঝাড়খণ্ডী কবিরা গান বাঁধলেন, সুর দিলেন প্রচলিত ঝুমুরের সুরে।

ইউকিলিপিটি গাছ, সেহ গাছ মহাগাছ
শুষি লেলা গে ধনী
মাটিকেরী রস, সেতো শুষি লেলা।

আকাশমণি সোনাঝুরি
তর ল্যাগে গড় করি, মরি গেলা
মরি গেলা গে ধনী, ছেড়ি কেরী ঘাস
সেতো মরি গেলা।

কেঁন্দ, পিয়াল শেষেঁই ভেল
মহুল, কুসুম কাটি লেল
ফরেস্টারে, ফরেস্টারে টাকাই দলান দেলে।

পশুয়াক নিবেদন, শুন শুন সর্বজন
হামাদের জঙ্গল রাখতে
কাঁড়ে বাঁশে চড়াও হে পাটন
হামাদের শরম রাখতে।

(গায়ক— কর্মবীর মাহাতো, গ্রাম— জামবাদ, পো— বালকডি, জেলা— পুরুলিয়া।)

ঝাড়খণ্ডের ঝুমুর সংগীতের বিশেষজ্ঞ ও সুগায়িকা অধ্যাপিকা বীণাপাণি মাহান্ত এবং ঝুমুরের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গিরিশচন্দ্র মাহান্ত মনে করেন, ঝুমুরই এ অঞ্চলের প্রাণ ও জীবনীশক্তি। অধ্যাপিকা মাহান্ত বলেন, "হরিয়ানার রাগিনী, পাঞ্জাবের টপ্পা, রাজস্থানের মন্দ, জম্মু-কাশ্মীরের ডোগরী, উত্তর প্রদেশের চৈতী ও কাজরী, উড়িষ্যার সম্বলপুরী এবং বাংলার ভাটিয়ালীর মতোই ঝাড়খণ্ড ভূমিও এর ঝুমুর সংগীতের জন্য বিখ্যাত।... বছরের মধ্যে দুবার চাষের অসুবিধার জন্য এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু ঝুমুর এইসব মানুষদের জীবনে দৈব আশীর্বাদের মতো কাজ করে এবং এইসব গরিব দুঃখী মানুষদের বন্ধ্যাভূমিতে আনে প্রাণ। দারিদ্র্য এবং জীবন-যন্ত্রণার সবরকম অভিশাপ ভুলিয়ে দেয়। ঝাড়খণ্ডের জনপদবর্গের কাছে ঝমুর যে জীবন রক্তবিশেষ— একথা বলা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।" (১৯৭৯)

এই ঝুমুর গানের মাধ্যমে এই এলাকার উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকরা আসামে কুলি চালান যাবার সময় যে গান বেঁধেছিলেন, তা একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদের ইঙ্গিত, অন্যদিকে গানটি এখনও অসমের চা-বাগান, উত্তরবঙ্গের

চা-বাগান অঞ্চল এবং কুলিদের মূল বাসভূমি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেও সমানভাবে জনপ্রিয়।

চল মিনি আসাম যাব, দেশে বড় দুঃখরে
আসাম দেশেরে মিনি, চা-বাগান হরিয়াল।
কোদাল মারা যেমন তেমন, পাতা তুলা কাম গো,
হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়ে পাঠালি আসাম।
এক পয়সার পুঁঠিমাছ, কয়া তৈলীর তেল গো,
মিনির বাপে মাঁগে যদি আরই দিব ঝোল গো।
ছ্যালা কাঁদে টিহিক টিহিক, গাগরীয়ে জল নাই
বাপ-দাদারে বাঁঞ্জা মুরলী বাজায় রে।
সর্দার বলে কাম কাম, বাবু বলে ধরি আন
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম, রে যদুরাম।
(সংগ্রহ ও গায়ক— কালী দাশগুপ্ত)

সেদিন দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি আর খাদ্যাভাবের জন্যে শিশুকন্যা 'মিনি'র হাত ধরে বহু মানুষ ঘর ছেড়েছিল অসমের উদ্দেশে। নব অভিবাসনের নেশাতে পাগল এরা সেদিন (১৯২১ পর্যন্ত) দেশান্তরী হয়েছিল মোট ৯ লক্ষ ৭০ হাজার। ঝাড়খণ্ডের মানুষ 'বাবু', 'সাহেব', 'সর্দার' তথা আড়কাঠিয়া 'যদুরামের' উপর যে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিল, তার অনুরণন আজও শুনতে পাওয়া যায়। বাবু সাহেব, সর্দার, যদুরাম-এর যৌথ প্রতীক কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে বিবর্তিত হয়েছে বাঙালি উচ্চবর্ণ ও উচ্চ-জাতির বিরুদ্ধে।

পুরুলিয়ার খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষসহ সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আজও মানুষের কাজ জোটে না। ঔপনিবেশিক, অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদ তথা প্রচার মাধ্যমগুলির সাঁড়াশী চাপে তারা দিশেহারা। কিন্তু শুধুমাত্র দরিদ্র মেহনতী মানুষের স্বার্থে তারা গাইলেন :

মুলুকে নাহি মিলে কাম, কৈসে বাঁচে প্রাণ
সাঁঝে খ্যালে বিহানে হয় টান।
পরের ঘরের পর খাটালি, সকাল হলেই
যাই বাগালী রে,
খ্যাটে খ্যাটে পিঠে বহে ঘাম
কৈসে বাঁচে প্রাণ।
আষাঢ়-শরাবণ মাসে

চাষাই করে খঁজাখুঁজি রে
আশ্বিন মাসে বলে ভাইরে
কেহ কারু লহে।
নওয়াগড়োর কুটুম অ্যাল
খাওয়া দাওয়া সরে গেল রে
মাড় ভাতে রাখলই মান।
যাও ছিল গুঁড়ি-গাঁড়ি
তাও লিল মহাজনেরে
অ্যাড়ে বসে ঝুরত নয়ান।
(সংগ্রহ ও গায়ক— লেখক)

একটি 'ভুথি' অর্থাৎ 'ভাতুয়া' (Bonded Labour) মেয়ে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিল। সে রাতে দেখতে পায়না, ঢেঁকিই তার কাছে সবচেয়ে কাছের। তার পরনে একটাই ছেঁড়া টেনা অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো। রাঁচি জেলার সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সংগৃহীত একটি গান—

নিহুড়ি নিহুড়ি ডাণ্ডা টুটি
রে ভূথি, কেতিখন ছুটি।
বুন দেলও ঝুলুর ধান
ঝাড়তে খামারে বান, রে ভুথি।
ঢেঁকীরে ঢেঁকী ভাচ্যা
আর ভ্যাচা খ্যাটে মরি
ধান সিজা, ধান সুখারে ভূথি।
রোদপানি র‍্যাতকানা
কেমন সুখাব টেনা
সবরনেখায় সিনান করি রে ভূথি।
(সংগ্রহ ও গায়ক— লেখক)

বাবু পণ্ডিতদের কাণ্ড

কলকাতার তথাকথিত গবেষক/অধ্যাপক/পণ্ডিতরা লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝেই এমন সব উক্তি ও ব্যাখ্যা করেছেন, এই অঞ্চলের সংস্কৃতি নিয়ে যে পুরুলিয়াবাসী হিসেবে হতবাক হয়ে যেতে হয়। আমার কারুর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রাগ বা আক্রোশ নেই। অ্যাকাডেমিক বিতর্কের খাতিরেই এই বিষয়ের

অবতারণা। 'বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, গীত, নৃত্য' গ্রন্থে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৬৫) মন্তব্য করেছেন : "কৃষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত কুৎসিৎ দেহাকৃতির জন্য পৌরাণিক অভিজাত চরিত্রের নৃত্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করিবার কালে, পুরুলিয়ার সাধারণ জনসমাজ স্বভাবতই মুখোশের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছে (পৃষ্ঠা ৭৭১)।" এই উক্তি সমগ্র পুরুলিয়াবাসী কেন সমগ্র মানব সমাজের কাছে অপমানকর। আর এত বালখিল্য মন্তব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কলম দিয়ে বেরুবে সেটা ভাবলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মান সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। এতো গেল ছো নাচের কথা। 'বাঁন্দনা' বা 'সোহরাই' উৎসব ঝাড়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য গরু ও মোষকে বন্দনা করা। নাচ-গান, হাঁড়িয়া, দেওয়ালচিত্র আঁকা সব মিলিয়ে এক দারুণ উত্তেজক ব্যাপার। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পণ্ডিত ওই পুস্তকেই লিখলেন—

> 'এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ গরু মহিষ নাচানো। শক্ত খুঁটিতে একটি বলিষ্ঠ মহিষ কিংবা ষাঁড়কে বাঁধিয়া তাহাকে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্বে এইভাবে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ইহাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হইত। বর্তমানে লাঠি দিয়া খুঁচাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (পৃষ্ঠা ২২৪)।'

এই গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের বাংলা বিভাগের পাঠ্যপুস্তক। ওই অঞ্চলের মানুষ মৃগয়াজীবী থেকে চাষি হিসেবে যখন নিজেদের উত্তরণ ঘটালেন তখন থেকে চাষের জন্যে গরু বা মোষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরে তারা 'কপিলা মঙ্গল' নামে মৌখিকভাবে প্রচলিত গান সমূহের জন্ম দেয়। আজ গরু এবং গাভী সৌভাগ্যের প্রতীক। অন্যদিকে আরও একজন গবেষক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার লোকউৎসব ; তৃপ্তিহীন জিজ্ঞাসা ও মহান সঙ্কল' প্রবন্ধে পুরুলিয়ার ভাদু উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা কালে বৈজ্ঞানিক চিন্তন ও মনন থেকে সরে গিয়ে লিখেছেন "গোটা ভাদ্রমাস নৃত্যগীতে উৎসব পালন করে ভাদ্র মাসের শেষদিনে সারারাত নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে 'জাগরণ' পালিত হয়। জাগরণের অনুষ্ঠান কালে সমবেত নর-নারীরা অবাধ মেলামেশা করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌন শিথিলতাও পরিদর্শিত হয়।" বর্তমান প্রবন্ধের লেখক নিজে পুরুলিয়াতে লালিত ও পালিত। আমার গ্রামেও ভাদু উৎসব হয়। কিন্তু ভাদু-উৎসবে অবাধ মেলামেশা করার আবিষ্কারটি একেবারে কিউরিয়ো চিন্তাভাবনাপ্রসূত এবং ড. চট্টোপাধ্যায়ের বিকৃতরুচি ও নিম্নমানের চিন্তারই প্রতিফলন। (লোকায়ত সংস্কৃতি, পরিপ্রেক্ষিত ও

রূপরেখা, পৃষ্ঠা ১১৫, সম্পাদনা সঞ্জীব সরকার/অরুণ রায়, ১৯৭৮)। ওই পুস্তকেই আরও একজন গবেষক বলেছেন— "নৃত্যটির নাম ছৌ নৃত্য, ঝাড়খণ্ড তথা রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় এই নাচ।" কিন্তু আসলে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হওয়ার জন্যে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতোই তিনিও নাচের নাম ছো কে পাল্টে 'ছৌ' করলেন। ছো নাচের রং ঝুমুরটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে না পেরে খাপছাড়া চারটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে :

সকল সিদ্ধিদাতা, জয় জয় হর গৌরীর নন্দন
কি সুন্দর চতুর্ভুজ গজেন্দ্র গমন, বিঘ্নবিনাশন।

কিন্তু আসল গানটি হল :

সিঁন্দুর বরণ অঙ্গ, মুষিক বাহন
সকল কর্মের সিদ্ধিদাতা, জয় হর গৌরীর নন্দন
কি সুন্দর চর্তুভুজ গজেন্দ্র গমন, নমঃ নমঃ নারায়ণ।

আসলে দীর্ঘদিন কোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ না করে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষণের প্রথাগত ও পদ্ধতি না জেনে সাংবাদিকসুলভ মনোভাব নিয়ে কোনো কিছু লেখার লোভ এরা সামলাতে পারেন না, অথচ গবেষক বলে চিহ্নিত হন।

আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গি

বস্তুত এত কথা বলার কারণ, ঝাড়খণ্ডী ঝুমুরের কিংবা কোনো লৌকিক সুরের সঙ্গে নাচ ও গান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠান এমন মিলে মিশে আছে যে বহিরাগত গবেষকেরা তা বুঝতে অসমর্থ। তাঁরা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন দোভাষীর মাধ্যমে, কাজেই স্থানীয় বাংলার উচ্চারণভঙ্গি তাঁরা দু-একদিনের সরেজমিন তদন্তে রপ্ত করতে পারেন না। ফলে বাংলা হরফে লেখার সময় তাঁরা স্থানীয় উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠিক ঠিক ঝাড়খণ্ডী শব্দগুলি লিখতে পারেন না। লিখলেও অর্থ বুঝতে পারেন না। যেমন— চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয় তাঁর 'বাংলার পল্লীগীতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

আমি যে যাতে ছিলি কুলি বল কুলিরে
বাবুহো, তহর গাইয়া ডাকয়ে ঘুরাই।

অর্থ হিসেবে লিখলেন— আমি যখন কুলি খাটতে যাচ্ছিলাম তখন তোমার গাইটি আমাকে ডাকল। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— আমি যখন গ্রামের রাস্তা (কুলহি) দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তোমার গাইটি আমাকে ডেকে ঘুরাল। ঠিক উচ্চারণযুক্ত শব্দগুলি না লিখতে পারার জন্যে পুনরায় উচ্চারণ করার সময় যান্ত্রিক উচ্চারণ করেন ভীষণ কষ্ট করে। যা ঝাড়খণ্ডী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত। সহজাত উচ্চারণকারী ঝাড়খণ্ডী গায়করা রেডিয়ো, টেলিভিশন, গ্রামোফোন কোম্পানি, সিনেমার সংগীত পরিচালকের 'চক্র'-এর মধ্যে স্থান করে নিতে পারেন না। যখন কেউ কেউ বা ওই 'চক্র'-এর পাশাপাশি আসেন তখন দেখতে পান, বিকৃত উচ্চারণকারী, যান্ত্রিকতাসর্বস্ব শহুরে সংস্কৃতির মানুষরা তাদের গলাতে গ্রাম্যতার শহুরে চমক এনে বাজার 'দখল' করে রেখেছেন। মুখে এদের প্রগতির খৈ ফুটে, হাভানার যুব উৎসবে গিয়েই কেউ কিউবার লোকসংগীত শিখে আসেন। এরা সুর চেনে, বোঝে, গলাতে সূক্ষ্ম রস আছে, কিন্তু গ্রাম্যতা নেই। কলকাতার সুধী দর্শক ও শ্রোতারা লক্ষ্য করবেন এই সমস্ত লোকসংগীত গায়করা কোনোদিনই কিন্তু মূল শিল্পীদের, অর্থাৎ যাঁদের কাছ থেকে শহুরে শিল্পীরা টেপ করে আনেন, তাঁদের নাম বলেন না। বললেও এমনভাবে বলেন যে তাঁরা যেন মানুষই নন। বললে কলকাতার শ্রোতারা মূল-গায়কদের কাছ থেকে গান শোনার আগ্রহী হবেন। গ্রামীণ শিল্পীদের পরিচিতি বাড়ুক এটা এরা চান না। পরম শ্রদ্ধেয় লোকসংগীতের অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয়ের অভিজ্ঞতা এখানে স্মরণ করা দরকার :

"পল্লীগীতি গাইতে গিয়ে উচ্চারণের ব্যাপারে কঠিন বিতর্কের সম্মুখীন হতে হল। অবশেষে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। তাঁর সাথে পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই ভনিতা না করেই আঞ্চলিক গীতের উচ্চারণ সমস্যাটা তুলে ধরলাম। তিনি জানতে চাইলেন আমার মতামতটা কী? ভাষাবিদ আমি নই, সংগীত শিল্পী হিসেবে সংক্ষেপে নিজের মতামত ব্যক্ত করলাম। আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গী লোকসংগীতের অভিব্যক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি ভাবি এবং ভাবের integration-এর জন্যে এটা অপরিহার্য মনে করি। সেজন্যে আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করার আমি পক্ষপাতী। তাকে ভদ্রায়িত করতে গেলে অভিব্যক্তির authenticity নষ্ট হয়ে যাবে।" (হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোকসংগীত সমীক্ষা— বাংলা ও অসম, পৃষ্ঠা ১০২ ; ১৩৮৫)। বলাবাহুল্য ভাষাচার্য সুনীতি বাবু হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয়কে সমর্থন করেছিলেন।

লোকসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ কালী দাশগুপ্ত মনে করেন : "শব্দ আর নিঃশব্দতা মিলিয়ে সংগীত। অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়াতে এটা গড়ে উঠেছে।

বিষয়বস্তুর তাগিদে form কীভাবে বদলাবে সেটা স্থির করতে পারে তারাই যারা ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

অর্থাৎ গ্রামের মানুষ, না হয় এমন কেউ যে দীর্ঘ দিন তাদের মধ্যে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাষাতে কথা বলে, গান গেয়ে তাদেরই একজন হয়ে উঠেছে। এই যে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, ঝুমুর ইত্যাদি formগুলো, এগুলো বিবর্তনের প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠেছে। বাউলের কথাই ধরুন। এর baseটা ছিল ঝুমুর। তারপর নূতন কথা বলার তাগিদে, নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী তার formটা বদলেছে। জিনিসটা কী ভাবে হয়? কিছু এগিয়ে থাকা লোক তাদের ভাবনাচিন্তা মতাদর্শ এই গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সেটা করতে গিয়েই formটা ভাঙে। কিন্তু যেহেতু সেটা গ্রামের মানুষের ভিতরের থেকে হয়; কেউ বাইরের থেকে সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় না। তাই নূতন form-টাকে গ্রহণ করে নেয় তারা। সেই formটা আবার পরিস্থিতি অনুসারে বদলে যায়। কিন্তু 'ভাঙতে হবে'— এই idea থেকে আমরা শহুরে মধ্যবিত্তরা form ভাঙতে শুরু করে দিলাম। এটা বোধহয় ঠিক পন্থা নয়। গ্রামের মানুষকে, তার সমাজকে, তার ইতিহাসকে যখন বুঝতে পারব, যখন বুঝতে পারব এটা এখনো মূলত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, এখনো সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারাটাই প্রধান, তখন এটা করার অধিকার জন্মাতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের message গ্রামের মানুষের কাছে তার ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সব থেকে দুঃখের কথা, এ ব্যাপারটা আমরা বুঝি না, কিন্তু বুর্জোয়ারা বোঝে।... জনগণের মধ্যে থেকে, তাদের সুর, ভাষা আয়ত্ত করলে তবেই নূতন content দিয়ে নূতন গান রচনা করে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ ব্যাপারটা ধর্ম ব্যবসায়ীরা বোঝেন, এই প্রক্রিয়াটা কাজে লাগান। কিন্তু বিপ্লবীরা বোঝেন না, কাজে লাগান না।' (প্রস্তুতিপর্ব, পৃষ্ঠা ৫১-৫২, জুলাই-অক্টোবর '৮১) তাই দেখি 'আকাশবাণী' ও রেকর্ড কোম্পানিগুলিতে 'গীতিকার' যাঁরা তাঁরা বেশির ভাগই কলকাতার লোক।

এরা কলকাতাতে থেকে গ্রামজীবনের সুর-বাহার সম্পর্কে 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে কিছু কেতাবি ধ্যানধারণা নিয়ে, সর্বসাকুল্যে ১০০টি গ্রামীণ শব্দ জেনে মাটির কাছাকাছি যাবার অভিনয় করেন। আকাশবাণীর আইন অনুসারে 'অ্যাপ্রুভড্' গীতিকার হয়ে লোকগীতির দোকান খুলে বসেন। ক্রেতাও জুটে যায়। শহুরে লোকসংগীত শিল্পীরা তাদের গান নিয়ে, যান্ত্রিক উচ্চারণ ও বিকৃত সুরে আকাশবাণী মারফত সেই লোকসংগীত পরিবেশন করেন। প্রশ্ন ওঠে, সেটা লোকসংগীত না অন্য কিছু। এ বিষয়ে আকাশবাণীর কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। আর আকাশবাণীর তথাকথিত

'অডিশন' পরীক্ষাতে গ্রামীণ শিল্পীদের জিজ্ঞাসা করা হয় প্রথমেই যে তিনি কোনো স্কেল-এ গাইবেন। গ্রামীণ শিল্পী প্রথমে চমকে যান, আরও চমকে যান যখন দেখেন তানপুরা নিয়ে কোনো আকাশবাণীর কর্মী তার গলার স্বর শুনে সুর মেলাচ্ছেন। পুরুলিয়ার এমনই এক গ্রামীণ শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেছিল— "আমরা তো গুপী গায়েনের মতো তানপুরা নিয়ে মাঠে গ্রামে গলা সাধি না।" তা ছাড়া পুরুলিয়ার ঝুমুর গানের সংগত করার সময় সে মাদল না দেখতে পেয়ে খুব চটে গিয়ে বলেছিল— "পুরুলিয়া কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, যে মাদল আকাশবাণীতে স্থান পায় নি।" অডিশন কর্তারা ঘাবড়ে গিয়ে অদৃশ্যস্থান থেকে বলেছিল— "এবার থেকে পুরুলিয়ার ঝুমুরে মাদল রাখা হবে।" কিন্তু মাদল এলেও বাজাবে কে? বাদক তো পুরুলিয়া থেকে আনতে হবে। কিন্তু আজও মাদল ও মাদল বাদক আকাশবাণীতে দেখতে পাওয়া যায়নি।

প্রাণের গান

গ্রামীণ ভারতের অসংখ্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, যাঁরা গীতিকার, সুরকার ও গায়ক তাঁরা নিজেদের আনন্দের জন্যে গান বাঁধছেন, সুর দিচ্ছেন এবং গান গেয়ে লোকায়ত সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত ও গতিশীল রেখেছেন। এঁরা কোনোদিনই আকাশবাণীর 'অ্যাপ্রুভড্' শিল্পী বা গীতিকার নন। ঘটনাচক্রে এই সমস্ত গ্রামীণ গীতিকারদের গানকে যদি কোনো শিল্পী আকাশবাণী মারফত প্রচার করেন, তখন কিন্তু গীতিকারের বদলে প্রচার করা হয় 'প্রচলিত লোকগীতি' হিসেবে। গ্রামীণ ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশের ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির হাজার বছরের পুরোনো ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্যের অধিকাংশই গান। বিনন্দিয়া সিং, বরজুরাম, দুর্যোধন, নরোত্তমা, গৌরাঙ্গিয়া, পীতাম্বর, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, বিপিনবিহারী মুখী, গিরিশ মাহাতো, উদয় কর্মকার, দ্বিজ টিমা, সৃষ্টিধর, পদ্মলোচন, ভবতোষ, ললিত কৃত্তিবাস, সুনীল হাজারী, বিজয় প্রমুখ অসংখ্য ক্ষমতাশালী কবি ও গীতিকার লৌকিক সুরকে কেন্দ্র করে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্যকে সজীব ও বহতা রেখেছেন। এঁরা ঝুমুরের গীতিকার, আকাশবাণীর নন। এঁরা সেখানে বহিরাগত। আর কলকাতা শহরে বসে এই সমস্ত স্বনামধন্য কবিদের পংক্তির শব্দগুলি সামান্য হের ফের করে বাজারে চালাচ্ছেন যাঁরা তারাই শহরবাসীর কাছে সত্যিকারের ঝুমুরের গীতিকার। কলকাতাবাসী শহর সংস্কৃতির মানুষ, ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অপরিচয়ের দূরত্বে থাকার জন্যে বেমালুম এই 'দু-নম্বরী' লোকগুলিকেই 'এক নম্বরী' ভাবছেন।

কোনো লোকসংগীতের form দীর্ঘদিন এক থাকতে পারে না। কিন্তু কলকাতাতে

বসে 'ভ্রমর বসে কাঁচা বাঁশে' কিংবা 'কইলকাতার বিটি ছাড়া' কিংবা 'মদনা ছুঁড়া ধমসা বাজাছে, টুসু ছুঁড়ি ধমসার বোলে কেমন দেখ নাচিছে' গানগুলি না ঝুমুর না টুসু গান। অথচ শহর সংস্কৃতির লোকেরা এঁদের ঝুমুর ও টুসুর original গায়ক ও সুরকার ভাবলেন। এরা ঝাড়খণ্ডী মানুষের ভাষা জানে না, সুর চেনে না, উচ্চারণ ভঙ্গি জানে না, জানে না টুসু বা ঝুমুর গান তাদের কত আদরের। পাঁজরার কুনকুনে বেদনার সঙ্গে এঁরা এগুলো ধরে রাখেন। 'টুসু' এদের লৌকিক দেবী এবং তাদের মা ও মেয়ের মতো। কিন্তু 'চক্রবর্তী' পদবিধারী জনৈক গীতিকার সুরকার ও গায়কের বিশুদ্ধ ভজনাতে একটি প্রসিদ্ধ রেকর্ড কোম্পানি গানটি রেকর্ড করলেন। আর ঝাড়খণ্ডে সেই গানের রেকর্ড বাজতে না বাজতেই শুরু হয়ে গেল স্থানীয় পত্র পত্রিকাতে লেখালেখি। তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সমগ্র ঝাড়খণ্ডবাসী। হাজার কণ্ঠের সম্মিলিত কোরাস— 'টুসু আমাদের জননী ও কন্যাসম সুতরাং এই গান বাজেয়াপ্ত হউক।'

ঝাড়খণ্ডের তরুণ কবি ও সুরকার তথা ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক কৃত্তিবাস কর্মকার যখন তার স্ব-রচিত ঝুমুর নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান তখন কখন যে হাজার হাজার শ্রোতা তাঁর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নিজেদের অজান্তেই গলা মেলান, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পুরুলিয়া, বারিপাদা, ঝাড়গ্রাম, রাইপুর, দুর্গাপুর, ধানবাদ, রাঁচি, কলকাতা সর্বত্র তাঁর ঝুমুরেই যেন বিপ্লবী প্রতিরোধ।

১.

আমাদের ঝাড়খণ্ডের মাটি
চিরজীবন রবে খাঁটি
আত্মদানে দাও অঙ্গীকার
একসাথে তুলে হাত, করে দিব বাজীমাৎ
জাগাইব ঝাড়খণ্ড সমাজ।

২.

(রঙ) এই সোনার ঝাড়খণ্ড আমার রে
(১) এই মাটিতে জন্ম মোদের, আজ ষোল জেলা কার?
আগাম দিগাম ভাবে দেখ, সারা ভারতের সাররে
(২) পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ অ-ভাই এই সীমানা যার
কিছু উড়িষ্যা, কিছু বাংলা কিছুটা বিহাররে
(৩) বড়বড় কলকারখানা লক্ষ লক্ষ কোয়াটার
পরদেশিরা চাকরি করে জমিনটা কাহাররে

(৪) অভ্র, তামা, পিতল বিজলী বাতির তার
মাটির ভিতর কাল সোনা হামদের নাই যে অধিকার রে।

অন্যদিকে তরুণ কবি সুনীল মাহাতো টুসুর গানে লিখলেন :

সাঁওতালডি বিজলী কারখানা
কত বাবুদের আনা গোনা
কলকাতাতে বিজলী যাবেক
পুরুল্যার ট্যাড়ে ট্যাড়ে
বাতি জ্বলবেক কলকাতাই
আর হামারা রইব আঁধার
এই তো বাবুদের বিচার।

তিনি ঝুমুর গান লিখলেন :

(১) বেঙ্গল বলে তুঁই ছট
বিহার বলে দূর হটো
(রঙ) পুরুল্যা কি ঝাঁপ দিবেক জলে
বাঙালি ভাই, বিহারী ভাই
দেনটুকু বলে।

(২) পাহাড়ে জঙ্গলে ঘেরা
তাও কেনে সর্বহারা
কারখানায় কারখানা চলে

(৩) খাপরা পিঠা খরাঁই গেল
চিপে চাইপে মর‍্যাই দিল
সুনীলে কি পেঁদা কথা বলে।

আরও একজন প্রতিভাবান তরুণ কবি ও গায়ক হাজারী রাজোয়াড়। তিনি আরও তীব্র প্রতিবাদে মুখর।

উড়িষাতে লয় উড়িয়া, পশ্চিমেতে লয় পছিয়া
বাংলাতে লয় যদি বাঙ্গালী হে
(রঙ) হামরা কি উপরলে টপকিলি
তরাই সবল বাঁইটে সারে লিলি হে।
হামদের শাল হামদের লঢ়া

হামদের ভাঙ্গলি দাঁতের গড়া
হাথে টুপা পথে বসাঁই দিলি হে
হামরা কি উপরলে টপকিলি...

এমনিভাবে কবি সদানন্দ মাহাতো, বিজয় মাহাতো, বিশ্বনাথ মুখার্জি, তারিণী আচার্য, পবন মাহাতো, সুখদেব মুণ্ডা, সুগনা পাহান, রঘুনাথ জেরাই, মুকুন্দ নায়েক সচ্চিদানন্দ লাল সহদেও প্রমুখ হাজারে হাজারে গান লিখছেন, সুর দিচ্ছেন।

আর কণ্ঠের সুমধুর স্বরে, মাদলের তালে, যে সমস্ত ঝাড়খণ্ডী গায়ক-গায়িকা ঝাড়খণ্ডের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে শহুরে মাধ্যমগুলির নেতিবাচক ভূমিকাকে শিমূল তুলোর মতো উড়িয়ে ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীতের প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তুলছেন, তাঁরা হলেন গোলাপী মাহাতো, কৃত্তিবাস কর্মকার, বিজয় মাহাতো, ধনঞ্জয় মাহাতো, রাধাকৃষ্ণ ভঞ্জদেও, সুরূপা চক্রবর্তী, প্রদীপকুমার সিংদেও, বীণাপাণী মাহান্ত, অঞ্জলি মাহাতো, হাজারী রাজোয়াড়, সদানন্দ মাহাতো, পবন মাহাতো, রামদয়াল মুণ্ডা, অর্জুন হেসা, মদন জেরাই, কর্মবীর মাহাতো, রাখহরি মাহাতো, মঙ্গল সরেন, সামধন পিঙ্গুয়া, কার্তিক সিংমুড়া, দেবযানী বসু, মিনুরানি মাহাতো, সুধারানি মাহাতো, কল্পনা কর্মকার সহ অসংখ্য শিল্পী।

প্রতিবাদের গানের মধ্যে যে গানগুলি আজ ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলি হল—

গঙ্গা নও তুমি, কাবেরী নও
কৃষ্ণা নও তুমি, গোদাবরী নও
গঙ্গা দং বাং কানা।
রাজমহল পাহাড়ে, সিধু-কানুর ডাকে
হুল হুল হুল হুল
লক্ষ শহিদের এক নদী রক্ত
অজয়ের বালিতে, দামোদরের পাথরে
সোনা হয়ে ঝরেছে
গঙ্গা দং বাং কানা।
ডোম্বুরী পাহাড়ে, বিরসা মুণ্ডার ডাকে
উল্‌গুলান উল্‌গুলান
উল্‌গুলান উল্‌গুলান
লক্ষ শহিদের এক নদী রক্ত
তোমার বালিতে তোমার পাথরে

সোনা হয়ে ঝরেছে—
গঙ্গা দং বাং কানা।
শিমলীপাল পাহাড়ে
স্বাধিকারের দাবিতে
সেরাইকেল্লার হাটে
স্বপরিচয়ের দাবিতে
বিদ্রোহ, উল্‌গুলান
উল্‌গুলান, হুল হুল,
লক্ষ শহিদের এক নদী রক্ত
খরখরীর বালিতে
বৈতরণীর পাথরে
সোনা হয়ে ঝরেছে।
জগন্নাথ ধল মরেনি,
সিধু কানু মরেনি
বিরসা মরেনি,
নির্মল মরেনি,
মহেন্দ্র হেম্ব্রম মরেনি,
চুনী কোটাল মরেনি।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার কবি বেঞ্জামিন মোলাইজ-কে ফাঁসি দেবার প্রতিবাদে, ঝাড়খণ্ডী কবিরা গেয়েছেন—

তুমি শুনেছো কি আমাজনের কান্না ?
শুনেছো কি মিসিসিপির হাহাকার ?
প্রিটোরিয়া আজো কাঁদে,
সবনরেখা আজো কাঁদে,
গুমরি গুমরি হায়রে গুমরি গুমরি।
কালো মানুষের রকত লাল,
লাল লাল লালে লাল,
মেকং ভল্গা আজো কাঁদে,
ব্রহ্মপুত্র আজো কাঁদে,
গুমরি গুমরি হায়রে গুমরি গুমরি।
শহিদের বলিদান,
সেতো লৌতন সূর্যের জন্যে,
শহিদের আত্মত্যাগ

সেতো নৌতন পৃথিবীর জন্যে
বেঞ্জামিন মোলাইজ জিন্দাবাদ
বেঞ্জামিন মোলাইজ জোহার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শুধু নয়, সমগ্র দলিত মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক নেলসন ম্যান্ডেলা-কে কেন্দ্র করে একটি গান সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছে—

আজের সুরজ ডুবি গেলা
আঁধারতে। ঘেরি লেলাঁঞ
নৌতন সুরজ উঠবেকেই ভাই
নেলসন ম্যান্ডেলা তাকর নাম।
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
দলিতের মুক্তি চাই।
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
কালো মানুষের মুক্তি চাই।
সেই সুরুজ জেলে রহল
পঁচিশ বছর অরল-গরল
সি-য়া-বোথা বুঝি লেরে আজ
নেলসন ম্যান্ডেলা তাকর নাম।
জেলের আগুড় নড় বড়
মানুষের কিল বেড়ে ধড়
সিয়া-বোথা বুঝি লেরে আজ
নেলসন ম্যান্ডেলা তাকর নাম।
গোষ্ঠ দাদার ঘরে রে ভাই
পশুপতি ঝুমরী গাই
মানুষের মুক্তির নাম
নেলসন ম্যান্ডেলা তাকর নাম।

ঝাড়খণ্ডের সভ্যতা : 'হড়-মিতান'

ভারতীয়-জাতি-রাষ্ট্র (Nation-State) গঠনের আগে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও তাঁদের পদলেহনকারী নয়া জমিদার, মহাজন, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী, যাঁরা মূলত মুদ্রা-নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের শিকড় মজবুত করার আগে ভারতবর্ষ বহু জাতিসত্তার মানুষের বাসস্থান বলে চিহ্নিত। প্রতিটি জাতিসত্তার মানুষ তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরা নিয়ে অর্থনৈতিক লেনদেন ও গোষ্ঠীগত দক্ষতা অনুসারে পারস্পরিক আস্থা নিয়ে এক একটি জনপদে তথা পার্শ্ববর্তী বহু জনপদের মধ্যে একটি নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি করেছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্তহীন সময়ের অমলিন প্রলেপের উষ্ণতাতে চাষি, কারিগর তথা অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের মধ্যে লেনদেন করেছে। ভারতবর্ষের তথাকথিত হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের ছত্রছায়াতে উঁচু-নিচু ভেদাভেদের জাতি বর্ণের শিকলে আবদ্ধ হয়ে আসমুদ্রহিমালয়ের মানুষ একটি মূল্যবোধকে ধরে রেখে এগিয়ে গেছে। তথাকথিত এই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক ভেদাভেদপুষ্ট, জাতি-বর্ণ-ব্যবস্থায় দীর্ণ একটি সামাজিক মূল্যবোধের ধারাকেই পণ্ডিত, রাজনৈতিক প্রবক্তা ও অন্যান্য চিন্তাবিদ 'মূলধারা' বলে চালাতে চেয়েছেন খুবই সুপরিকল্পিতভাবে। এই Mainstream বা জাতীয় মূলধারা কথাটি এখনও উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিজো সহ অন্যান্য আদিবাসী মানুষ একেবারে মানতে রাজি নন। তাঁরা তাঁদের সামাজিক সভ্যতার ধারাটিকেই বেশি করে গুরুত্ব দিতে চান। ব্রহ্মপুত্রের বরাক উপত্যকাতে 'বরখ' অর্থাৎ মানুষ বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন সেই বড়ো-ভাষী মানুষরা, মেচ, রাভা, বডো সহ ত্রিপুরার ত্রিপুরী, জামাতিয়া, হালাম, কলই, বংচের গোষ্ঠীর মানুষরা এখনও নিজেদের 'বরখ' বা মানুষ বলেই পরিচয় দেন।

ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের বাংলা ভাষার উৎপত্তির আদি পর্বে তথাকথিত চর্যাপদের আগে যে অসাধারণ সামাজিক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, তাকে মূলত 'হড়-মিতান'

সামাজিক সভ্যতা বা 'খেরোয়ালি' সামাজিক সভ্যতা বলে আমরা মনে করি। এই সভ্যতার মূল আধার ছিল পারস্পরিক ভাইচারা, পারস্পরিক সহনশীলতা, পারস্পরিক দায়বদ্ধতা এবং পারস্পরিক আপনাপন বা আপন করার যাদুমন্ত্র। 'হড়-মিতান' মানুষরা সংঘবদ্ধ ও সৃষ্টিশীল সামগ্রিক সৃষ্টির যাদুকরী প্রয়াসের মাধ্যমে পরকে আপন করেছে, সমমর্যাদা দিয়েছে, ভেদাভেদের কাঁটা দিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখেনি। 'বরতনী' বা 'গাঁ-ঘর' বাৎসরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তারা একে অপরকে 'মিতা বা মিতান' বলেছেন।

সেদিনের বাঙালি জাতিসত্তার মানুষেরা (যা আজ মৈথিলি, ওড়িয়া জাতিসত্তার মানুষের পক্ষেও প্রযোজ্য) আজকের ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের মানুষদের সম্পর্কে যে ধারণা সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন চর্যাগানে, তাতে তাঁদের বলা হয়েছিল— শবর, শবরী, ডোম্বী, চণ্ডাল প্রমুখ।

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পীচেছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।

('উঁচু উঁচু পাহাড় (পর্বত), সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত, গলায় গুঞ্জাফুলের মালা'— চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার, নয়াপ্রকাশ, ১৯৬৪)

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ-জাতি ব্যবস্থার বাইরে যে সমস্ত কালো মানুষ নিজেদের তেজ ও বিক্রম নিয়ে অবস্থান করছিলেন, যাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে বর্ণ-জাতি ব্যবস্থার গোলামি করতে রাজি হননি, তাঁদের সম্বন্ধে ভারতীয় অভিলেখ (epigraphy) এবং অন্যান্য তথাকথিত ঐতিহাসিক দস্তাবেজ-এ যে চিত্রায়ন করা হয়েছিল তার একটি তালিকা দেওয়া দরকার।

সময়	স্থান	গোষ্ঠীর নাম	তাঁদের পেশা	সূত্র
১। ৪-৫ শতাব্দী পল্লভ অনুদান	বেরালী জেলা কর্ণাটক	আর্ধকাঅরাধিকা (দাস বা কোলি)	ব্রাহ্মণদের সেবক	এপিগ্রাফিক ইন্ডিকা খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ২০৯
২। দ্বাদশ শতাব্দী	ঝাঁসি	ভিল্ল, শবর পুলিন্দ	কায়িক পরিশ্রম	ওই, পৃষ্ঠা ২১৫-৩৩২ ওই, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ২৮৫
৩। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ	মণ্ডলেশ্বর	নিযাদ	—	ওই, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬
৪। ৫১০ খ্রিস্টাব্দ	বাঘেলখণ্ড	পুলিন্দ	—	ওই
৫। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী	বগুড়া বাংলাদেশ	দস্যু, পুণ্ড্র, পুরোজ	—	ওই, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৯০ (ছোটোনাগপুরের 'পুরান' গোষ্ঠীর কথাও ভাবা যেতে পারে)
৬। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আগে	মধ্যভারত ভাণ্ডারাজেলা	নাগ	গুপ্তবংশের আগে উত্তর ভারতের শাসক	এপিগ্রাপিক ইন্ডিকা, খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা ৭৩
৭। ৯৩৯-৯৭৬ খ্রি চতুর্থ কৃষ্ণের রাজত্বকাল	থানা জেলা	দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ	টোন্ডিয়া মণ্ডলমে বসবাসকারী পল্লভ রাজবংশের সময়	ওই, খণ্ড ৩২, পৃষ্ঠা ৫৮।

প্রাচীন যুগে আদিবাসীদের বিভিন্ন নামের (Nomenclature) যে তালিকা আমরা পাই সেগুলির মধ্যে আভির, পল্লভ, গান্ধার, যবন, শক, হূন, কেকেয়, দারাদাস, বর্বর, কিরাত, আহুক, ওরাঁও, পুষ্কল, কুলিক, পণ্ড পৌরব ইত্যাদি ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে, পুরাণ, বেদে তথা অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আদিবাসীদের যে নামে চিত্রিত করা হয়েছিল সেগুলি মূলত অমানবতর নাম। এক সময় ওই নামগুলি যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে। রামায়ণের রাক্ষস বানর, ভল্লুক, মহাভারতে অসুর, যাদব, নাগ প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষরা তথাকথিত বৈদিক গল্পগাথার নায়ক-নায়িকাদের মতো চিত্রিত তো হলেন না বরং এমন গল্প ও গাথা, কাব্য ও শ্রুতির সৃষ্টি করা হল যে, ওই সমস্ত ঐতিহ্যময় সুসংস্কৃত মানুষজনদের যাবতীয় সৃষ্টির ইঙ্গিত, প্রতীক, চিহ্ন ধ্বনি ও শব্দ, সংকেত সমস্ত কিছুই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা চাপা দিয়ে তাঁদের মহান সংস্কৃতিকে জোর করে নির্বাক করে দিলেন। বর্ণ ভেদাভেদ পুষ্ট, জাতি-বর্ণবাদী, ধূর্ত, শঠ ও ক্রুর হিন্দু বৈদিক সংস্কৃতির প্রবক্তারা সীমাহীন নৃশংসতা, হিংসাত্মক অভিযান ও প্রচার সর্বস্বতার মাধ্যমে দেশজ-আদিবাসী গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সভ্যতাকে কোনো রকম পাত্তা না দিয়ে পুরোপুরি লৌহমুষ্টির রোলার চালিয়ে আদিবাসীদের পদদলিত করে তথাকথিত পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতিকে অতি সূক্ষ্ম অথচ শক্ত মারাত্মক জাতি-বর্ণের শিকল পরিয়ে দাসানুদাস করে নিজেদের বিজয় রথকে অব্যাহত রাখলেন।

নিষাদ গোষ্ঠীর মানুষরা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিলেন (১৫০ খ্রিস্টাব্দের জুনাগড় অভিলেখ অনুসারে) তাঁদের মূল বাসভূমি মালবা (দ্বারকা-র কাছাকাছি) স্থান থেকে মহাকাব্যের যুগে গঙ্গার পূর্ব দিকে, কৌশলের সীমা ছাড়িয়ে বসবাস শুরু করেন। মূলত মধ্যদেশ এবং পশ্চিম বিন্ধ্যাচলের এলাকাতে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী স্থানে এদের বসবাস লক্ষ করা যায়। 'কিরাত' গোষ্ঠীর মানুষের কথা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে লক্ষ করা যায়। হিমালয় পর্বত শ্রেণি থেকে 'প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে' (আধুনিক অসম) এবং উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত তাঁদের বসবাস ক্ষেত্র। 'শবর' গোষ্ঠীর মানুষের আদি বাসস্থান সিন্ধু প্রদেশে। পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে তাঁদের অভিপ্রয়াণ ঘটে। মহাকাব্যের যুগে তাঁদের বাসভূমি ছিল দণ্ডক বনভূমিতে (বর্তমানে গঞ্জাম জেলা)। পুরাণ বর্ণিত অনুসারে বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণি অঞ্চলে তাঁদের বসবাস ছিল। 'রাক্ষস' মানুষজনদের বসবাসভূমি ছিল দণ্ডক বনভূমি থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত। কৈলাস পার্বত্য আবাস থেকে পরবর্তীকালে মালবা সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু পর্যন্ত এদের বসবাস ছিল, বৃহৎ-সংহিতা অনুসারে।

নিষাদ, শবর, কিরাত, রাক্ষস— শব্দগুলির অর্থ ভাষাতাত্ত্বিক ও মহেঞ্জোদারো হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধারকারী পণ্ডিত গুরুচরণ মুরমু, আই. পি. এসের মতে কালো

মানুষ। এই কালো মানুষরাই আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা জাতি-বর্ণ (গায়ের রং অনুসারে)-বাদের শিকার হয়েছিলেন। শ্রীমতী মমতা চৌধুরী মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে বলেছেন— This is believed to be the language spoken by the Munda Tribes who along with the Karusas dwelt in the region to the South of Kosi and Vatsa between Gedi and Magadha. (Partly Baghelkhand and Bundelkhand)। তিনি আরও বলেছেন— 'It is now fairly established that of the two branches Austro-Asiatic family of languages, the Munda (or the Kolarian) forms the one, while the other branch represented by the Man-Khemer as spoken by the people of the further India.'

উপরের প্রেক্ষাপটে খুবই গভীরভাবে অনুধাবন করার পর আজকের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-এ 'ঝারিখণ্ড' অঞ্চলের অধিবাসী মানুষজন সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড
ভিল্লপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড।
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।

ঝারিখণ্ডের প্রেক্ষাপটে আজ এই আহির (গণ্ড, গৌড়, ধরুয়া, সদগোপ, বাগাল, কিসান, গোয়ালা) অসুর, চাপুয়া, কামার, লোহার, মঘইয়া কুম্ভার, মুচি, তুরি, ডোম, ঘাসী, হাড়ি, সহিস প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা ও চাষবাসে নিযুক্ত মানুষের সঙ্গে যাঁরা নিজেদের 'হড়' বা মানুষ বলেন সেই সাঁওতাল, কুরমি, হো, মুণ্ডা, বীরহড়, শবর, লোধা, খেড়িয়া, বাউরী, পান, তাঁতি, দণ্ডমাঝি, দেশওয়ালি মাঝি, পুরাণ, রাজোয়াড়, ভঞ্জপুরাণ, ধরা, ঘুন্যা, বেদিয়া, ঠেঁটরি, মালহার, যাদুপেট্যা, করগা, বাগতি, বাগদি, কোড়া, মুদি, মহাকুড়, জোল্‌হা প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর মানুষের শত শত বছরে অতি অন্তঃরঙ্গ লেনদেন আজও অব্যাহত। শ্রীমতী রেবা রায় (১৯৮৭) নব্যপ্রস্তর যুগের সুবিশাল সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, সুবর্ণরেখা সঞ্জয়, খড়কাই নদীর অববাহিকা, পাতকুম, চাঁইবাসা, চাণ্ডিল, সিনি, ঘাঁটশিলা, জামুদা, গুয়াতে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। চাণ্ডিলের রঘুনাথপুর, নিমডি, হাকসারা, তিলাইয়া, জানডি, সিরকা, নোওয়াডি, পাথারডি, তিরুলডি, শালডি, গাঙ্গুডি, ভানঘার্দ, শমনপুর, চেলায়ামা, চিরগোড়া, আমঝোর, কাঁড়রাতে এবং সিনিকে কেন্দ্র করে উখরি, ডুংগী, বারুডি, কেঁন্দুয়া এবং চাঁদবাসার লুপুংঘুটু, তিলিমডি, ঘাটশিলাকে কেন্দ্র করে গালুডি, গঙ্গানাথপুর, ডাহিগোড়া, গোপালপুর, আমাইনগর, লোকজেরিয়া, খরসোতি, নরসিংহগড় এবং গুয়া-জামুদাকে কেন্দ্র করে কোয়েল কারো অববাহিকাতে নুলা, গুয়া, বকনো,

ঠাকুরা প্রভৃতি স্থানে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের জায়গা পাওয়া গেছে। তেমনি রাঁচি জেলার চেনপুর, বিষুনপুর, লোহারদাগা, গুমলা ও খুঁটি এলাকাতে এবং দামোদর অববাহিকার হাজারিবাগ উপত্যকাতে, পালামৌ জেলার শোন ও কোয়েল অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে, বিশেষত বানারি, নেতারহাট, রায়গড় অঞ্চলে, হাজারিবাগ জেলার দামোদর অববাহিকাতে, কোনার নদীর ধারে রামগড়, বেরমো, পরেশনাথের পাশে রাজরপ্পার পাশাপাশি সাঁওতাল পরগনা জেলার কর্নকালাজল, দেওঘাট, জাসিকির এবং ছোটো সুরজবেড়া পাহাড়ের পাদেশে এবং গোমাই নদীর পাদদেশে পাহাড়পুর, মাহাতোটাডা, বাঁন্দরকোলা, বরহেটে এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে। মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ি, বামুনডিহা, কাটাবন, অম্বাজুড়ি, ভেদুয়াবুই, হাতিবাড়ি, চন্দাবিলা থেকে শুরু করে পুরুলিয়া জেলার বরাভূম, অযোধ্যা, কেশরগড় থেকে বাঁকুড়া, শুশুনিয়া রায়পুর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

গার্ডেনার (১৯৭৮) লিখেছেন, 'Franz Boas' আজ থেকে ৭৫ বছর আগেই কিছু গূঢ়বিদ্যা বিশারদদের 'মানবজাতি-তত্ত্বঘটিত' জ্ঞান যা একান্তভাবে কিছু দীক্ষিত শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেই জ্ঞান-বিদ্যা এবং অন্যপক্ষে সাধারণ মানুষের উপলব্ধিজাত জনপ্রিয় বিশ্বাসের জ্ঞান সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছিলেন। গূঢ় বিদ্যা আমরা তাকেই বলি, যা মূলত সেই চিন্তাধারা যা একেবারে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মন থেকে সৃষ্টি। এই গূঢ়-বিদ্যার 'সম্মোহন' করার ক্ষমতার জন্যেই সাধারণ মানুষের উপলব্ধিজাত জ্ঞানকে উপেক্ষা করেছে। জনসাধারণের এই 'উষ্ণ ও গৃহী' জ্ঞানকে হিন্দু সভ্যতা অস্বীকার করেছে নানাভাবে। মজার কথা, জাতিতত্ত্ববিদ্যা এই গূঢ়-জ্ঞানীদের শিক্ষা ও চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে না। এই বিদ্যা মূলত জনমুখী ও সাধারণ মানুষের জ্ঞান, শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়ে আছে।

একদিকে গূঢ়-বিদ্যা যা দুর্বোধ্য, অন্যদিকে মানবিক মানদণ্ডে সমৃদ্ধ সুবোধ্য জ্ঞান-সভ্যতার উপরে গবেষণার জন্যে যাঁরা নূতন তত্ত্ব দিয়ে নৃ-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করলেন, তাঁদের মধ্যে র‍্যাডিন (১৯২৭), ক্রোয়েবার (১৯৪৮), শ্রীনিবাস (১৯৫২), রেডফিল্ড (১৯৫৩, ৫৫), রেডফিল্ড ও সিঙ্গার (১৯৫৪), মারিয়ট (১৯৫৫, ১৯৫৯), মার্টিন ওরান্স (১৯৫৯), বোস (১৯৫৯), সিনহা (১৯৫৯) সহ আরও অনেকেই।

সিনহা (১৯৫৯) মোটামুটি তিন ভাগে ভারতের দেশজ ও আদিবাসী মানুষজনের সভ্যতার ধারা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন—

(১) দেশজ ও আদিবাসী মানুষজনেদের সভ্যতা আপাতদৃষ্টিতে ভারতের মূল ঐতিহাসিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন— যা ভারতীয় সভ্যতার উন্নয়নের নিয়ামক।

(২) ক্রোয়েবার-এর 'The Ancient Oikumene' তত্ত্ব ধরে বলতে পারা যায় যে ভারতীয় সভ্যতার অনুন্নত শাখাপ্রশাখা হচ্ছে আদিবাসী সংস্কৃতি ও সভ্যতা।

(৩) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক অনগ্রসর বা আদিম স্তরের সংস্কৃতিক 'কাঁচামাল' সরবরাহকারী হচ্ছে আদিবাসী সংস্কৃতি। বর্তমান সময়ের আদিবাসী সংস্কৃতিগুলি এখনও অপরিবর্তিত থেকেছে অনেকাংশে এবং তার আদিম রূপ ধরে রাখতে পেরেছে পরিবেশগতভাবে 'দ্বীপতুল্য' বিচ্ছিন্নতার জন্যে এবং খুব সম্ভবত অজানা কিছু ঐতিহসিক দুর্ঘটনার জন্যে।

জনপ্রিয় হিন্দুধর্মবোধ ও আদিবাসী ধর্মবোধের পারস্পরিক মিল সম্পর্কে রিজলে, হাটন, শরৎচন্দ্র রায়, ও'ম্যলে, এলউইন প্রমুখ পণ্ডিত মতামত দিয়েছেন, কিন্তু হাটন বলেছেন আদিবাসী সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মবোধের বা মূলত Core Pattern of Classical Hinduism, যা তথাকথিত আর্য-বিজেতাদের দ্বারা আরোপিত, তার কোনো যোগসূত্র নেই। আদিবাসী ধর্মবোধ ও জীবনদর্শনের ধারা হিন্দু সভ্যতাতে প্রাপ্ত প্রাগ্-আর্য জীবনবোধের ধারাবাহিকতা। ভারতের আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রচণ্ড চাপে, অনেক গোষ্ঠীই তাঁদের নিজ নিজ ভাষা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, আগ্রাসী বর্ণ-হিন্দুবাদ ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের অসহিষ্ণুতার জন্যে।

উপরোক্ত তথ্য ও তত্ত্বের সূত্র ধরে এবারে আমরা বোঝার চেষ্টা করব ঝাড়খণ্ডের 'হড়-মিতান' সম্পর্কের সমতাকেন্দ্রিক ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতীক, ইঙ্গিত, চিহ্ন তথা অন্য সৃষ্টিশীল প্রয়াসগুলি কী কী ভাবে এসেছে।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, বীরহড় ভূমিজ, কোল প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজেদের হড়/হোরো বলেন। হড় বা হোরো শব্দের অর্থ মানুষ। ভূমিজ ও কুড়মি গোষ্ঠীর মানুষ আজ 'ভূমজালি'/বা কুর্মালি/ঝাড়খণ্ডী ভাষাতে কথা বলেন। কুড়মিদের যে সমস্ত বংশপ্রতীক বা টোটেম আছে তার মধ্যে 'হিন্দোয়ার' কথাটিকে ভাষাতাত্ত্বিকরা বলেন যে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল হেন্দে = হিন্দো এবং হড় = যার অর্থাৎ হেন্দে অর্থ কালো এবং 'হড়' শব্দের অর্থ মানুষ। অর্থাৎ কালো মানুষ। অন্যদিকে, এই 'হড়' মানুষরা নিজেদের গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে ঝাড়খণ্ডের গ্রামে বসবাসকারী কামার (অসুর, কোল-কামার, চাপুরা কামার, আগারিয়া লোহার, লোহার মাঝি) কুম্ভার (মঘইয়া কুম্ভার, কুমোর), মাহলি (বাঁশফোড় মাহলি), মাল, মালহার, ঠেঁঠরি, (যাঁরা মূলত তামা পিতল গলিয়ে বাসন তৈরি করেন) করগা, করঙ্গা, ছুতার (পাথরের থালাবাটি এবং কাঠের সরঞ্জাম তৈরি করেন যাঁরা), মুচি (মাদল, ভুমদা, টামাক, ধমসা, চেড়পেটি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন যাঁরা), ডোম (বাঁশের ঝুড়িসহ বাজনা বাজানোর কাজে লিপ্ত), ঘাসী (মৃত পশু পরিষ্কার এবং বাজনদার) ; তাঁতি, পান, বড়াইক, চিক-বড়াইক, জোলহা (কাপড় তৈরি), পাটরা (রেশনের কাপড় তৈরি)সহ অন্যান্য চাষি মানুষের যেমন রাউতিয়া, কিষান, পুরাণ, ভঞ্জপুরাণ, গৌড় রাজোয়াড়,

আহির, বাউরী, সহিস, হাড়ি, খাড়িয়া, লোধা, পাইক মরর্দনা (মঘয়া নাপিত), ধোপা, ধুরুআ, বাথুডি, বাগাল পাহিরা, খাণ্ডোয়াল, খেতুরি, ভূঁইয়া, ঘাটোয়ার, বেদিয়া, ব্যাদা, ধরা, কেওট, ঘুন্যা, যাদু-প্যাটা প্রমুখ মানুষজন পরস্পর পরস্পরকে 'মিতান' বা মিত্র বলেন। এই মিত্রতা লোকদেখানি তো নয়ই, বরং উষ্ণতা ও পারস্পরিক ত্যাগের মহিমাতে সমুজ্জ্বল। তাই আমরা লক্ষ করেছি, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এই 'হড়-মিতান' সংস্কৃতির 'খেরোয়াল' মানুষরা এক সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে। চূয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৫) (ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ ড. কুমার সুরেশ সিংহের মতে 'চূয়াড়' শব্দটি একটি 'জেনেরিক' শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ সাম্প্রদায়িক। 'চূয়াড়' সংস্কৃতির মানুষকে বিশেষত ভূমিজ, কুড়মি, বাউরি প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষকে তথাকথিত 'বাঙ্গালী' জাতিসত্তার মানুষেরা 'চূয়াড়' বলে চিহ্নিত করেছেন, বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলিতে, কোল বিদ্রোহ (১৮৩২), ভূমিজ হাঙ্গামা (১৮৩৩), তিলকাবাবার আন্দোলন (১৭৮২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) খারওয়ার বিদ্রোহ (১৮৫৮), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০), মেলি আন্দোলন (১৯১৭-১৯১৯) প্রভৃতি ঐতিহাসিক আন্দোলন সাধারণ 'হড়-মিতান' সামাজিক চেতনা ও একই ভাবাবেগে উদ্‌বুদ্ধ মানুষেরা যে প্রতিরোধ করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজ খুঁজে বের করতে হবে। আজ তার নবমূল্যায়ন প্রয়োজন ভারতের একটি অসাধারণ সংস্কৃতির ও সভ্যতার নব-ইতিহাসের জন্যে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, সাংস্কৃতিক নির্বাকায়ন (Cultural Silence) এবং স্মৃতিহরণ (Memocide)-এর একটি অসাধারণ নমুনা হল মেলি আন্দোলন, যার সম্বন্ধে ভারতের প্রগতিবাদী ঐতিহাসিকরা সম্পূর্ণ নীরব। অথচ ঐতিহাসিক ড. কুমার সুরেশ সিংহের মতে ভারতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বিচার হয়েছিল এই মেলি-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

মেলি আন্দোলনের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটি দ্বারা আয়োজিত ১৬-১৭ মে, ১৯৯২ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভাতে ('ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের অধিবাসীরা সেদিন কেমন ছিলেন— আজ কেমন আছেন' ; স্টুডেন্টস হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) বলা হয়েছিল, 'জমি, জীবিকা ও সম্মানের দাবিতে ১৯১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যার ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, ক্রমবর্ধমান খাজনার বোঝা, মহাজনী, জঙ্গল ও জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমিদারদের নানা রকম বিধিনিষেধ কৃষক সাধারণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এর বিরুদ্ধে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুড়মি (মাহাতো), ভূমিজ, ওরাঁওসহ বিভিন্ন জনজাতি ও অন্ত্যজ গোষ্ঠীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ওই এলাকার প্রবীণ মানুষের কাছে 'মেলি' বা 'মেড়ি' আন্দোলন রূপে স্মৃতিতে চিহ্নিত হয়ে আছে। আন্দোলনকারীরা

জমিদার, পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর প্রচণ্ড নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। শহিদ হন কঁকা মাঝি, কালিয়া মাহাতো, রামেশ্বর সিং মুণ্ডা ওরফে নয়ান সিং মুণ্ডা ও হৃদু কোল-কামার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ৩৭ জন এবং ৯৭৭ জনের ৫ বছর থেকে ৮ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝোর জামবনী, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ি, শিলদা, ধলভূম, বান্দোয়ান, কুইলাপাল, রাইপুর খাতড়া, ছাতনাসহ প্রাক্তন মানভূম জেলার চাষ, চন্দনকিয়ারী ও বালিয়াপুর, টুণ্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত এই আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজও অপ্রকাশিত। ময়ূরভঞ্জের চিতোড়া, বেতনটি, মাকুন্দ, যশীপুরের মানুষ আজও স্মরণ করেন এই আন্দোলন।

'হড়-মিতান' সামাজিক সভ্যতার মানুষরা যাঁরা সর্বপ্রাণীবাদ বা Animism-এ বিশ্বাসী, যাঁদের মূল ধর্মসাধনা প্রকৃতিগত ভারসাম্যের সত্যতা, তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে অভিনব পন্থা ও কাল্পনিক অসত্য কাহিনী প্রচার করতে লাগলেন 'দিকু' বা 'অ্যালিয়েন' (মূলত যাঁরা 'হড়-মিতান' সংস্কৃতিতে ও ভৌগোলিক অবস্থানে অনুপ্রবেশকারী) সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষজন।

মাহাতো (১৯৮৩), মুণ্ডা (১৯৮৮), মিনজ (১৯৮৮), বসু (১৯৯২), বাস্কে (১৯৯২) গবেষকরা 'হড় মিতান' বা খেরোয়াল সংস্কৃতি ও সভ্যতার এবং 'দিকু' সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল তফাতটুকু বুঝতে গিয়ে মাহাতো (১৯৮৩) ও মুণ্ডা (১৯৮৮) বলেছেন, মোট আটটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকের উপর নির্ভরশীল আদিবাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপলব্ধি ও সংকট।

অস্মিতা বা স্ব-পরিচয়ের আধার	জীবনদর্শনের মূল্যবোধ	সংকটের কারণ
ভূগোল (বাসভূমি)	প্রকৃতি ও মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণতা।	প্রকৃতি ও মানুষের সামঞ্জস্যহীনতা (মানুষের নির্মম লোভ-এর বাতাবরণ)।
সমাজ	সমানতা— বন্ধুত্বে ও সখ্য উষ্ণতা।	স্তর ভেদাভেদদীর্ণ ভণ্ড বন্ধুত্ব ও সখ্যতার নামাবলি গায়ে দিয়ে শোষণ, বঞ্চনা ও অমানবিক গুণাগুণের প্রকাশ।
অর্থব্যবস্থা	যৌথ/সামূহিক এবং পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা। ওজন ও মাপে এবং মুদ্রা-ব্যবস্থার বিরোধী প্রতিযোগিতার অর্থব্যবস্থা।	ব্যক্তিবাদী এবং মুদ্রা বিনিময় ও কেনাবেচার সম্পর্ক এবং ওজন ও মাপের বঞ্চনাকারী তীব্র প্রতিযোগিতা পূর্ণ অর্থনীতি।

অস্মিতা বা স্ব-পরিচয়ের আধার	জীবনদর্শনের মূল্যবোধ	সংকটের কারণ
ইতিহাস	মৌখিক-শ্রুতিতে সম-সমাজের সকলকে বাঁচাতে সাহায্য করা।	শোষণ, বঞ্চনা, ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য।
রাজনীতি	জনবাদী/সামাজিক চেতনা।	ব্যক্তিবাদী, আদর্শহীনতা, সর্বহারার নামে কুটিলতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টিকারী।
ধর্ম	সর্বপ্রাণবাদী সারনা বা নৈসর্গিকতা।	মূর্তিপূজা— ব্রাহ্মণ পুরোহিত আচারের নামে নানা কর্মকাণ্ড ও মানুষের ব্যক্তিত্ব হ্রাসকারী কাল্পনিক কাহিনি প্রচারের মাধ্যমে মেধা ও বুদ্ধিকে হরণকারী।
দর্শন	নৈতিক জীবন। সত্যকথা, সৎ-আচরণ, মিথ্যা পরিত্যাগ প্রভৃতি, জীবজন্তুর প্রতি সহানুভূতি এবং সামগ্রিক চেতনা দ্বারা পুষ্ট নীতিবোধকে সমর্থন।	কলুষিত ও ভ্রষ্টাচার জীবন। জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় (পৈতা পরিধান-করা) যে শ্রম বিমুখতা উপাদান ও সমাজ বিমুখতা সৃষ্টি হয় যার মূল নীতি 'আপনে বাঁচলে বাপের নাম' এর ফলে ভিক্ষাকে আইন ও নীতিসম্মত করার জন্যে কীর্তন, টহল দেওয়া। পঞ্জিকা ও গণনা করা ও হাত দেখার নামে কলুষিত নীতিবোধকে সমর্থন করে।
সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি (সংগীত, নৃত্য, থুতি)	লোক মানুষের সামগ্রিক সৃষ্টি, মূলত মৌখিক বিনতি ও শ্রুতি কেন্দ্রিক পারস্পরিক উষ্ণতা দেওয়া-নেওয়া, অপন গপন এবং সমবেত অংশগ্রহণকারী।	নগরীকরণ ব্যক্তিকুশলের প্রতিভা, বেদ (লিখিত জ্ঞানের উৎস) থেকে শুরু করে যাবতীয় পুরাণে ব্রাহ্মণ্য-বাদী জয়গান। অসুর, রাক্ষস, নাগ-সংস্কৃতি সহ খেরওয়াল মানুষের অবমূল্যায়ন। দর্শক ও শ্রোতার সঙ্গে নাচিয়ে বাজিয়ে বা অভিনয়কারীদের দূরত্ব।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে খেরোয়াল সংস্কৃতির মানুষজনদের মধ্যে 'দিকু' সংস্কৃতির প্রতীকগুলি আজ দুর্বার স্রোতের মতো ঢুকছে। এখন প্রশ্ন, কে বা কারা দিকু ? দিগম্বর চক্রবর্তীর 'হিস্ট্রি অভ দ্য সান্থাল হুল অভ ১৯৫৫' গ্রন্থটির সম্পাদনা করতে গিয়ে শ্রীঅরুণ চৌধুরী (১৯৮৯ মার্চ) মন্তব্য করেছেন— It is altogether a motivated as well as fiendish distortion of facts to delineate the upsurge as a commotion against the Bengalees and the Biharies'। অরুণবাবুর মতে শ্রেণি সংগ্রামই হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল 'motive force'। বাঙালি ও বিহারী জাতিসত্তার মানুষদের 'দিকু' বলা অরুণবাবুর মতে এক ভয়ানক শয়তানী চক্রান্ত। কিন্তু রণজিৎ সমাদ্দারের 'বাংলার গণসংগ্রামের পটভূমিকা' (১৯৯২) গ্রন্থে শ্রীলোকনাথ দত্তের সাঁওতাল কাহিনি (বনবীর গাথা) কাব্যগ্রন্থটি থেকে জানা যায়—

সাঁওতালে দুর্বল হেরি বাঙালি, বেহারী
ঢুকেছে সাঁওতাল গ্রামে খেলিছে চাতুরি,
কোথাও বসেছে তারা ব্যাপারীর বেশে
সাঁওতাল ক্রেতারে ডাকে সমাদরে হেসে।
বাঙ্গালির প্রবঞ্চনা বেহারীর কুমন্ত্রণা
ক্রমে বন্ধ সাঁওতালের বাণিজ্য ব্যভার,
মহাজন চাষি খনে বাড়ি বাঁটা লেনদেনে
শতগুণে বারায়েছে কুসীদের হার।

'দিকু' শব্দটিকে বিশেষ অর্থবহ বলে মনে করেন শ্রীধীরেন বাস্কে (১৯৯২)। তাঁর মতে প্রাগ্‌বৈদিক খেরোয়াল সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানুষরা আগ্রাসী একদল মানুষকে আখ্যা দিয়েছিলেন অনুপ্রবেশকারী বা Intruder হিসেবে। যাঁরা আদিবাসী মন, মনস্তত্ত্ব, আদর্শ, নীতি ধর্ম, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি অথবা জীবন জীবিকা, ভাইচারা, তথা আপনাপন, সামগ্রিক উষ্ণতা, যৌথ নৃত্যগীত, চারুকলা ও জীবনবোধ, রস এবং ভাষাতত্ত্বের সংকেত, চিহ্ন, ইঙ্গিত ইত্যাদি নিয়ে গঠিত যে সামাজিক সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছিল, তাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী সভ্যতার আরোপন যারা করেছিল, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর ও চিন্তার মানুষজনেরই 'দিকু' বলা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, আদিবাসী মানুষজনেরা যাঁদের 'দিকু' আখ্যা দেন তার সমার্থক শব্দ অথবা এই 'দিকু' শব্দের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী ? এবং বিশেষজ্ঞরা কী বলেন ? আমরা আগেই বলেছি যে যাঁরা নিজেদের 'হড়'

বা মানুষ হিসেবে পরিচয় দেন তাঁদের কথা— তবুও বলি মূলত সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুড়মি, (সাঁওতালী উচ্চারণে 'কুড়বি') হো, বীরহড় মাহলি, বেদিয়া গোষ্ঠীর মানুষরা যাঁরা মূলত লাঙল চাষ নির্ভর করে, অসুর সভ্যতা (অসুর, কামার, কোলকামার, চাপুয়া কামার, কামার মাঝি, লোহার কারমালি গোষ্ঠীর মানুষরা যাঁরা লোহা গলানোর কাজে দক্ষ ছিলেন) এবং পরবর্তীকালে নাগ সভ্যতা (ঝাড়খণ্ড এলাকাতে খেরোয়াল গোষ্ঠীর তথা তাঁদের মিত্র গোষ্ঠীদের অন্যতম প্রধান গোত্রের নাম নাগ। মুণ্ডাদের, কুড়মিদের, চাপুয়া কামার, গোন্ড, বাগাল, ধুরুয়া কিসান, সহ অন্যদের গোত্র নাগ। কুড়মিদের নাগটোয়ার, 'বড়ানাগ' ইত্যাদি গোত্র বা বংশপ্রতীক আছে।) মহাভারতের কল্পিত গল্পে 'খাণ্ডবদাহন' পর্বে এই শক্তিশালী নাগ গোষ্ঠীর মানুষজনদের অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন তথাকথিত মহাবীর অর্জুন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় লাক্ষার তৈরি যে 'জতুগৃহ' তৈরি করেছিলেন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সেই 'জতুগৃহ'-এ এক আদিবাসী মা ও তাঁর পঞ্চ সন্তানকে পুড়িয়ে মেরে পাণ্ডবদের ও তাঁদের মাতা কুন্তীর শব বলে চালাবার যে চেষ্টা করেছিল— সে কিরাত জননী ও তার সন্তানেরা নাগ-বংশ জাত। আজও ছোটোনাগপুরের 'লাক্ষা' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন। সুতরাং ঝাড়খণ্ডের দুর্গম অরণ্যে রাজমহল পাহাড় থেকে শিমলীপাল নীলগিরি পাহাড় পর্যন্ত, সুবর্ণরেখার রাজঘাট থেকে কনহর পর্যন্ত এক সুবিশাল বনভূমিতে খেরোয়াল সংস্কৃতির মানুষরা সুখেই ছিলেন। মুঘল বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান মাঝে মাঝে সৈন্যবাহিনী পাঠালেও ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সামন্ত, রাজা, মানকি, মুণ্ডা, মাঝি, মাহাতোরা মূলত স্বাধীন ছিলেন। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক দলিল আমাদের সেই সূত্রেরই সন্ধান দেয়। অধ্যাপক ডি. ডি. কোশাম্বী লক্ষ করেছেন যে, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় মানুষরা যে গরুর পিছনে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করতেন আজও তা ঝাড়খণ্ডের 'হড়-মিতান' সংস্কৃতির মানুষরা অব্যাহত রেখেছেন। যাঁরা নিজেদের 'খেরোয়াল' বলে পরিচয় দেন বা যাঁরা খেরোয়াল জাতি সত্তার মানুষ, তাঁদের কাছে 'দিকু' শব্দটি মানবতর এবং অমানবিক গুণসম্পন্ন একদল মানুষকে বোঝায়।

সিনহা, সেন, পাঁচভাই (১৯৬৯) বলেছেন, 'বহিরাগত অ-আদিবাসী মানুষজনেদের চিহ্নিত করার জন্যে সমগ্র ছোটোনাগপুর সহ তৎসংলগ্ন এলাকাতে আদিবাসীরা 'দিকু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নিজেদের গোষ্ঠীকে হড়, হোরো, বা হো বলে (যার অর্থ মানুষ) তাঁরা পরিচয় দেন। 'দিকু' শব্দটিকে তাঁরা সকল হিন্দু-জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের জন্যেই ব্যবহার করেন না, মূলত যাঁরা শোষক তাঁদেরই ওই পরিচয় বা বিশেষণে ভূষিত করা হয়। শ্রীমতী জ্যোতি সেন (১৯৭২) বলেছেন ঝাড়খণ্ড

আন্দোলন শুরু হবার পর "গঙ্গার অপর পার থেকে আসা, উত্তর বিহারীদেরই মূলত দিকু বলা হতে থাকে।" যাঁরা ঝাড়খণ্ডের মাটিতে রোজগার করে অথচ তাঁদের অর্জিত অর্থ বিহারের নিজ নিজ গ্রামের ঠিকানাতে পাঠিয়ে দেন, তিনি বলেছেন— "These People were described as 'Cheats', 'tyrants', 'looters', 'dacoits' and so on. পাঁচভাই (১৯৮৩) বলেছেন মূলত সাঁওতাল-দেকো সম্পর্ক ভয়ানক ভাবে সাঁওতাল মনকে আন্দোলিত করেছে, বিশেষত বহিরাগতদের ক্রমাগত আগমনের ফলে তারা অ-সুরক্ষিত, নিরাপত্তাহীন বলে মনে করেছেন।

'হড়-মিতান' বা খেরোয়াল মানুষজনদের বাসভূমিকে ইংরেজরা যখন যেমন খুশি তথাকথিত 'জেলা', 'মহকুমা' বা 'থানা'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন ১৭৬৫ সালের পর ক্রমাগত চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহের এবং মেড়ি আন্দোলনের ফলে। চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ইংরেজ-বাহিনীর জন্যে কোল-সৈন্য সংগ্রহ। মেদিনীপুরের রেসিড্যান্ট সেদিন এক হুকুমনামাতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সৈন্য সিংভূম, মানভূম, মেদিনীপুর থেকে সংগ্রহ করে ১৭৭০ সাল থেকে ওই সমস্ত সেনা বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন মহীশূরের টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই এ। মেলি (১৯১৭) আন্দোলনও ছিল জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ঢোকানোর বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী যে— বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী নিজ নিজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অস্মিতা রক্ষার জন্যে আজও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 'খেরোয়াল' বা 'হড়-মিতান' সামাজিক সভ্যতার মানুষরা নিজেদের লড়াই চালাচ্ছেন নিজেদের শক্তি অনুসারে।

তাই সংখ্যাতত্ত্বের আর সেন্সাস নামক বৈজ্ঞানিক কারচুপি দিয়ে নয়, আম্বেদকর দ্বারা নির্মিত সুমহান ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে দিয়ে নূতন ভারত গড়তে হবে। 'হড়-মিতান' সংস্কৃতির মানুষজনদের, যাঁরা প্রাক্ বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক বা বাহক, এবং তা আজও বহতা রেখেছেন, তাদের 'বিদ্রোহী বা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা 'পৃথকতাবাদী' বলে দূরে ঠেলে দিলে প্রকৃত ভারত গঠন হবে না। এই সুমহান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকলের।

ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি সম্পর্ক

আঠারমুড়া বাই খালাই খালাই
কলই জুকরাওনী পাড়া

(আঠারমুড়া পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঘনজঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে পৌঁছোতে হয় কলই সুন্দরীদের দেশে।) আর ত্রিপুরার হালামগোষ্ঠীর কলই উপশাখার যুবতীদের সম্পর্কে আরও একটি প্রবাদ—

আসম্‌তা নাইনানি মুচুখ্‌ল্যাই
কলই জুকনান নাইদি

(দুর্গা প্রতিমার চাইতেও কলই যুবতীরা অনেক বেশি সুন্দরী)।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি রূপকথা, ছড়া, পুরাকথা ও প্রবাদে ত্রিপুরার আরেক নাম 'মায়ানি দেশ'। 'মায়া' শব্দের অর্থ যাদু এবং 'নি' শব্দের অর্থ সূর্য। অর্থাৎ যাদু সূর্যের দেশ। অর্থাৎ যে দেশের মেয়েরা ঘর-গৃহস্থালির কাজ, পোশাক-পরিচ্ছদে, রান্না, সংগীত, নৃত্যে, কেশচর্চা ও যৌন আবেদনে সুদক্ষ ও নিপুণ, যার ফলে তাঁরা পুরুষদের একেবারে মুঠোর মধ্যে রাখতে পারে। এই 'মায়ানি দেশের' সীমানা 'থানাংচী-বানাংচী' এলাকার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান মণিপুর ও মিজোরামের সীমানা ছাড়িয়ে মেঘনা নদীর অববাহিকা পর্যন্ত 'মায়ানি দেশের' বিস্তৃতি। এখানেই মহাভারতের যোদ্ধা অর্জুন ইন্দো-মঙ্গোলয়েড কোনো এক চিত্রাঙ্গদার কাছে হারিয়ে গিয়েছিলেন। বহিরাগতকে আপন করে নেওয়ার এক যাদুকরী কৌশল এখানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। এখানকার মেয়েরা পুরুষদের উপর সীমাহীন আধিপত্য করতে পারেন। এখনও বর্তমান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি সুবৃহৎ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নাম 'মায়ানি রিজার্ভ'।

পলাশির যুদ্ধের বিজয়ের তিন বছরের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাবের কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। ১৭৬১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার নবাবের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে। ত্রিপুরার রাজার অধীনস্থ সমতল ক্ষেত্রের প্রায় সবটুকু জমিদারি হিসেবে নিয়ে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল ও কিছু সমতলক্ষেত্র স্বাধীন ত্রিপুরার বা পার্বত্য ত্রিপুরার অধীনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ত্রিপুরা ভারতের মানচিত্রে সবচেয়ে ছোটো পূর্ণরাজ্য। লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার চাইতেও কম। কিন্তু আন্তর্জাতিক সীমানা এবং এই ছোট্ট প্রদেশটির অবস্থিতি ধরলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার ভৌগোলিক মর্যাদা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণে বাংলাদেশের সীমানা, পূর্বে অসম অবং মিজোরাম। চার হাজার বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে এর সীমানাই ৮৩৭.২০ কিলো মিটার। সমগ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, পাহাড়, ঘনজঙ্গল, বাঁশের সঙ্গে যুক্ত যা এখনও শাল সেগুন বন। চাষযোগ্য জমির শ্রেণিবিভাগ তিন প্রকার—টিলা (লুঙ্গা), উঁচু সমতল ভূমি (চারা), সমতল ভূমি (নাল) ; সব মিলিয়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ এর পরিমাণ। রাজ্যের মধ্যভাগ দিয়ে দণ্ডায়মান পাঁচটি সুবিশাল পর্বতশ্রেণি যার মধ্যে আঠারমুড়া আর বড়মুড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকেরই। চা-বাগান, রাবার বাগান, বাঁশের আর আনারসের বাগানের পাশাপাশি চাঁপা, খুমতৈয়া প্রভৃতি অসংখ্য পাহাড়ি ফুল ত্রিপুরার বাতাসকে করে সুবাসিত।

ত্রিপুরাতে মোট উনিশটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাস। ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং, হালাম গোষ্ঠীর মানুষরাই আদি-বাসিন্দা। পরবর্তীকালে চাকমা, লুসাই, কুকি, মগ গোষ্ঠীর মানুষরা এখানে আসেন। ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সামাজিক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল তাতে একই ধরনের জীবনধারাতে অভ্যস্ত হয় উপরোক্ত গোষ্ঠীর মানুষ। ত্রিপুরী গোষ্ঠীর মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এরাই রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ত্রিপুরার ইতিহাসের গতিপথ একসময় নির্ধারণ করেছিলেন। কৈলাশচন্দ্র সিংহ (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) মনে করেন যে, ত্রিপুরাতে যে অতি জটিল রাজতন্ত্রের শাসন শত শত বছর ধরে অব্যাহত ছিল তার ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে ত্রিপুরার শাসক রাজবংশের যোগাযোগ ও লেনদেন পনেরো শতাব্দী কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকেই ঘটেছিল। ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজমালা বা রাজার বংশপঞ্জী দেখলেই এটা পরিষ্কার হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই জঙ্গল পরিষ্কার করে হিন্দু ও মুসলমান চাষিরা ত্রিপুরাতে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন তাম্র-পাট্টা, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, মন্দিরের মূর্তি শৈলী, মুদ্রা, তথা ত্রিপুরার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং রাজ পরিবারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার গভীরতা লক্ষ

করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গে ত্রিপুরার অধিবাসীদের মিলে মিশে যাবার প্রবণতা খুবই ধীরে হলেও গভীর ছিল।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর দিনে ত্রিপুরার রাজবাড়িতে 'হসম ভোজনের' ব্যবস্থা হত তাতে মহারাজা অন্যান্য সামন্ত প্রধান ও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সর্দারের সম্মানার্থে যে বিশাল ভোজ সভার আয়োজন করতেন, তাতে এক সংযুক্ত উপজাতি (আদিবাসী) মহাসভা তৈরি হত। মহারাজা সেই সভার সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান হিসেবে নিজেকে প্রতিফলিত করতে পারতেন। অন্যান্য গোষ্ঠীর সর্দাররা এই উপলক্ষে নিয়ে আসতেন 'নজরানা', এতে থাকত নিজেদের হস্তচালিত তাঁতের রিসা (বক্ষবন্ধনী) আর পাছড়া (মেয়েদের পরিধেয় লুঙ্গি), হরিণের শিং, মধু, লঙ্কা, হাতির দাঁত, বাঘের চামড়াও অনেক সর্দার দিতেন। এই 'হসা ভোজন' বা 'হসম ভোজন'-এর দিনে হালাম উপজাতি গোষ্ঠীর 'মলশম' উপশাখার প্রধানকে বড়ভাই হিসেবে সম্মানিত করা হত এবং রাজ-পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত ভোজে তিনিই প্রথম সেদিন আহার্য গ্রহণ করতেন। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 'মায়ুং কুফুর' বা শাদা হাতি বশ করার যে গল্প প্রচলিত আছে তাতে 'মলশম' ও 'কলই' শাখার হালামদের বিশেষ ভূমিকা আছে বলেই, রাজত্ব প্রতিষ্ঠাতা ত্রিপুরী মায়ের সন্তানেরা মলশমদের বড়ভাই ও কলইদের মেজো ভাই বলে মনে করেন। এই হালাম, রিয়াং, জমাতিয়া, ত্রিপুরী নোয়াতিয়া গোষ্ঠীর মানুষরা ঝুম চাষকে কেন্দ্র করেই ছিলেন যাযাবর। যাযাবর জীবন বলেই মাটি দিয়ে পাকাপোক্ত ঘর বা ভিটামাটির জন্যে লালায়িত মানসিকতা লাঙল চাষিদের মতো এদের ছিলই না। তাই দৈনন্দিন জীবন ধারা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বাঁশের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য, যা আজও এতটুকুও ম্লান হয়নি। প্রত্যেক পরিবার বা গোষ্ঠীগুলিই ছিল স্বনির্ভর, ঝুম-চাষের উৎপাদন থেকেই তাঁরা সারা বছরের জীবনধারণের খাদ্যশস্য, পানীয়, কার্পাস, তৈলবীজ জোগাড় করতেন। তেল, নুন, শুঁটকি মাছ (সিদল) সহ অন্যান্য কিছু তরিতরকারির জন্যে তাঁরা বাঙালি ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত বাজারে, হাটে নামতেন মাসে, দু-মাসে একবার। আসতেন চার পাঁচদিন ধরে পায়ে হেঁটে, বিশ্রাম নিতেন মহাজনের গোদামের বাড়িতে, তারপর কেনাকাটা হলে বাঁকভর্তি বা 'খাড়া' ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে উঠতেন পাহাড়ে। লোহার কারবার ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের দক্ষতা না থাকার জন্যে সমতলের বাংলা কর্মকারদের কাছ থেকে 'দাউলি', 'তাক্কল', 'চেমলু' কিনতে তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতেন উপজাতিরা। বাঙালি ও নিম্নবর্ণের দলিত হিন্দু ও মুসলমান চাষিদের কাছ থেকে ত্রিপুরী ও জমাতিয়া গোষ্ঠী এবং পরে হালাম গোষ্ঠীর কলই ও রোপিনী উপশাখার মানুষরা হাল-কর্ষণ সহকারে চাষ শেখেন। ঝুম চাষ ও ঝুমের দেবী-দেবতারা ত্রিপুরার উপজাতিদের মন ও

মানসিকতাকে হাজার হাজার বছর আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এর ফলে যে সামাজিক সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল তা আজও ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান্তরালভাবে অব্যাহত আছে।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনে একমাত্র স্বাধীন ত্রিপুরাতেই রাজভাষা ছিল বাংলা। কয়েক শত বছর ধরে মহারাজদের আনুকূল্যে বাংলা ভাষা রাজভাষা হিসেবে মর্যাদা পাবার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। বিশেষত রাজ পরিবারকে ঘিরে যে সমস্ত রাজঅমাত্যরা ছিলেন, যাঁরা রাজা ও তাঁর আত্মীয়স্বজন, ('কর্তা' ও 'ঠাকুর' উপাধিপ্রাপ্ত) ও রাজকোষের জন্যে উদ্‌বৃত্ত অর্থ, শস্য যোগান দেওয়ার একমাত্র হাতিয়ার ছিলেন তাঁদের ভাষাকে অস্বীকার করার মতো মানসিক প্রস্তুতি মহারাজাদের ছিল না। যদিও রাজ পরিবারে ত্রিপুরীদের কথ্যভাষা 'কক-বরখ'-এর প্রচলন ছিল। তাই দেখা যায়, মহারাজা ও মহারানিদের প্রদত্ত শীলমোহরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ। রাজদরবারে বাংলা ভাষার প্রচলনের জন্যে বহু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান রাজকর্মচারী হিসেবে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, আইন, কারা, রাজস্ব, অর্থ ও পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে তথা পারিবারিক ও মহারাজার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে বাঙালি উচ্চবর্ণ ও উচ্চজাতির স্থান স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরাতে ছিল অগ্রগণ্য ও অপ্রতিহত। মন্ত্রী, দেওয়ান, সচিব, শিক্ষক, ডাক্তার, দারোগা, পুলিশসহ ছোটোবড়ো কর্মচারী হিসেবে বাঙালিরা ছিলেন সাধারণ উপজাতিদের ভাগ্যনিয়ন্তা। উপজাতিদের মধ্যে যাঁরা বাংলা শিখতেন, বা লিখতে ও পড়তে পারতেন, তাঁরা উপজাতি সমাজে উচ্চ-সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন। ফলে গৃহশিক্ষক হিসেবে বাঙালি শিক্ষকরা উপজাতিদের কাছ থেকে শুধুমাত্র অর্থ বা পণ্য রোজগারই করতেন না, তাঁরা উপজাতিদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক উপদেষ্টাতেও পরিণত হতেন। 'কক্‌বরখ' ভাষাকে পরিমার্জিত করে উন্নতস্তরে তুলে সমান্তরাল রাজভাষা করার মানসিক দৃঢ়তা মহারাজা ও তাঁদের পারিবারিক স্বজনেরা দেখালেন না। মণিপুরের মহারাজা তাঁর নিজ রাজ্যে মণিপুরী 'মেইতে' ভাষাকে তা করতে পেরেছিলেন।

বিদ্রোহ

শমসের গাজীর নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৫-৬৮), পরীক্ষিৎ ত্রিপুরা ও কীর্তি ত্রিপুরার নেতৃত্বে টিপ্রা বিদ্রোহ (১৮৫০) এবং পরীক্ষিৎ জমাতিয়ার নেতৃত্বে জমাতিয়া বিদ্রোহ (১৮৬৩), মহারাজা কর্তৃক নিয়োজিত কুকিদের দ্বারা নৃশংস

ভাবে দমন, কুকি বিদ্রোহ (১৮৪৪-৬০), রিয়াং বিদ্রোহ (১৮৬০) এবং সর্বশেষে রতনমণি নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে (১৯৩৭) কৃষক বিদ্রোহগুলির গতিপ্রকৃতি ও দমন পীড়নের ভয়াবহতা সাধারণ উপজাতি সমাজকে মহারাজা ও তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। রতনমণি (রত্নমণি) নোয়াতিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত একটি শক্তিশালী সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনকে যে ভাবে দমন করা হয়েছিল, তাতে সাধারণ উপজাতি মানুষরা রাজার প্রতি তাঁদের শেষ আস্থাটুকুও হারিয়ে ফেলেন। সাধারণ খেটেখাওয়া উপজাতি সমাজ নিজেদের বাঁচার তাগিদেই গ্রাম্য মোড়ল, চৌধুরী, রায় ও বিন্দিয়া ও আলাংদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ও অনাহারে জর্জরিত প্রজারা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর দিতে অস্বীকার করেন তখন শাসক পারিষদরা মহারাজা বীরবিক্রমে বুঝিয়েছিলেন রত্নমণির আদেশেই প্রজারা এটা করেছে ; তা ছাড়া রত্নমণি নিজেকে 'মহারাজা' ঘোষণা করেছিলেন বলে অভিযোগ। এরপর আগরতলার মানুষ দিনের পর দিন লক্ষ করেছিলেন উপজাতিদের উপর নির্মম, নারকীয় ও বর্বর অত্যাচার। দূর দূরান্তের পাহাড়ি মানুষদের গ্রাম জ্বালিয়ে ক্ষুধার্ত, অস্থিচর্মসার উপজাতি শিশু-নারী-পুরুষদের পায়ে হাঁটিয়ে, দড়িতে বেঁধে আগরতলার রাস্তাতে ঘোরানো হয়েছিল ; "ক্ষুধার্ত, অস্থিচর্মসার যেন কতকগুলি শবদেহের মিছিল।" অন্যদিকে, রত্নমণিকে গ্রেপ্তার করে "উজ্জয়িনী প্রাসাদের সদর দরজার সিঁড়িতে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃতদেহ দড়িতে বেঁধে রাস্তা দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারে। পরদিন সকালে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়, কেন্দ্রীয় কারাগারে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে রত্নমণি মারা গেছেন।"

জাতিভেদ বিভাজন-নীতি

ত্রিপুরার রাজপরিবার, মহারাজা ও তাঁর নিকট আত্মীয় এবং রাজপারিষদ রূপে যে সব উপজাতি পরিবার আগরতলাতে বসবাস করতেন তাঁদের মূলত 'ঠাকুর' ও 'কর্তা' আখ্যা দেওয়া হত। এই পরিবারগুলি ত্রিপুরার অভিজাত পরিবার হিসেবে সামাজিক মর্যাদা পেতেন। এক একটি উপজাতি গোষ্ঠীর 'মিসিব' ছিলেন এই 'ঠাকুর' ও 'কর্তা' পরিবার থেকে।

এই মিসিবদের মাধ্যমেই সাধারণ একজন উপজাতি রাজদরবারে নিজেদের আর্জি পেশ করতেন। আগরতলাবাসী এই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত উপজাতিরা বাঙালি নৃত্য, সংগীত ও সাহিত্যচর্চাকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে দেখতেন। এইভাবে "তারা গ্রামবাসী উপজাতিদের থেকে একটা পৃথক এবং উন্নত জাতিসত্তার অধিকারী,

এই গর্ববোধ তাদের মধ্যে দানা বাঁধে। এককথায় ঠাকুর পরিবারগুলিকে বাঙালি সংস্কৃতি গ্রাস করে নেয় এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, পাহাড়িদের থেকে তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে শুরু করে।" তা ছাড়া মহারাজা ও বাঙালি মন্ত্রী/দেওয়ান তথা অন্যান্য রাজকর্মচারীর দৌলতে এঁরা বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং এর ফলে সাধারণ উপজাতিদের এঁদের রান্নাঘরে ঢোকারও অনুমতি ছিল না। রাজআদেশে সমগ্র উপজাতিদের 'ক্ষত্রিয়' উপাধি দেওয়া হল এবং প্রতি বৎসর রাজকীয় খেতাব বিতরণের সময় উপজাতি গ্রামীণ সর্দারদের চৌধুরি, রায় উপাধি দেওয়া হত। 'হালাম' উপজাতির কলই শাখার মানুষজনদের 'সিংহ' পদবি দেওয়া হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ও দুর্গম বনাঞ্চলে বসবাসকারী পুরাণ ত্রিপুরী গোষ্ঠীর মানুষদের নূতন করে ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সংস্কার প্রবণতাও অব্যাহত থাকে। এরাই 'নোয়াতিয়া' নামে পরিচিত।

ত্রিপুরার সাধারণ উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'জাতি-বর্ণ' ব্যবস্থার কোনো প্রভাব আজও লক্ষ করা যায় না। উচ্চ বা নীচ ভেদাভেদের সীমারেখা এখনও সেখানে ধোঁয়াটে। কিন্তু আগরতলার অভিজাত উপজাতি শ্রেণি ও সম্পন্ন জমাতিয়া ও ত্রিপুরী দেব-বর্মাদের মধ্যে জাত-বর্ণ ব্যবস্থার সম্মোহনী ছোঁয়াচের প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর ফলে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাত। সমতাকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ও সমাজমুখী মানুষজনের স্বাভাবিক জীবনছন্দ ও উৎপাদনমুখী মানসিকতার উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল হিন্দু জাতি-বর্ণের আস্তরণ। রাজ আনুগত্য ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রশংসা ও সমবেদনা পাবার জন্যে ওইসব সম্পন্ন চাষি হিন্দু-জাতি বর্ণের 'উচ্চ-নীচ', 'শুচি-অশুচি' এবং 'সুখাদ্য-কুখাদ্য' ইত্যাদির প্রভাবে এত বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, অতি মৌল ব্রাহ্মণ্যবাদীরাও লজ্জা পেতেন তাঁদের ব্যবহারে। ফলে খুবই সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াতে বিভাজন নীতি অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল।

মহারাজা চট্টগ্রাম থেকে ব্রাহ্মণদের চিরস্থায়ী সনদ ও প্রচুর জমিজমা উপঢৌকন দিয়ে উনিশ শতকের শেষদিকে উপজাতিদের কুল পুরোহিত বা যজমানী ব্রাহ্মণ হিসেবে নিয়োগ করলেন। সাতদিনের শ্রাদ্ধের (সান্দাই-হরছিনী) বদলে ব্রাহ্মণ অনুশাসন মতে হল তের-দিনে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সূর্য দর্শন ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানে রাজআদেশে উপজাতিরা ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হন। যা পরম্পরাগত ভাবে কোনোদিন ছিল না। অপমৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া মারফত, সত্যনারায়ণ পূজা ও বৈষ্ণব কীর্তনাদির মাধ্যমে যজমান উপজাতিদের গ্রামে স্থায়ী বসবাস করতে লাগলেন বহু ব্রাহ্মণ পরিবার। আগরতলা থেকে বহু ব্রাহ্মণ কুলগুরু ও পুরোহিত

নিজ নিজ শিষ্য-যজমানদের গ্রামে বৎসরান্তে একবার এসে প্রাপ্য দক্ষিণা আদায় করে নিয়ে যেতেন। মৃত পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ করুন বা না করুন, ছেলেমেয়েদের বিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে দেন বা না দেন, প্রতি যজমান ঘরে ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা আদায় করতেন এই কুল-পুরোহিতরা। এই টাকার জোরে অনেকেই তাঁদের পুত্রকন্যাদের কলকাতাতে ডাক্তারি, ওকালতি পড়াতেন। অন্যদিকে, কোনো কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত আদিবাসীদের গ্রামে থেকেই যজমানি করতেন। উপজাতিদের মধ্যে সত্যনারায়ণ পূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা, রামায়ণী কথা, ভাগবত পাঠ এমনকী দোল ও রাসপূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলাগানের আয়োজন করতেন। বৈশ্যমুনি পাড়া গ্রামে (অম্পিনগর) এমনই এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম যিনি তাঁর নিজের মেয়েকে একজন উপজাতি তরুণের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। দম্পতি এখন সুখে এবং সন্তান সন্ততিসহ ওই গ্রামেই আছেন। বৃদ্ধ কলই সর্দার সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বন্ধুত্ব ও পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

দলিত, নিম্নবর্ণ কাঠের মিস্ত্রি, কামার কুমোর, মুসলমানচাষি ও গরু ব্যবসায়ী, জেলে এবং ঘর তৈরির মিস্ত্রির কাজে দক্ষ বহু বাঙালি পরিবার এবং সিদল বেরমান (শুঁটকি মাছ) বিক্রেতাসহ নুন ও তেলের ব্যবসায়ী বহু বাঙালি পরিবার উপজাতিদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিলেন গত একশ বছরে। এই ব্যবসায়ী বা বেপারি গোষ্ঠী তাঁদের মহাজনী ও ময়্যালী আদায় এবং বন্ধকী (রেন) কারবার করে ফুলে ফেঁপে উঠলেও উপজাতিরা তাঁদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। বৈশ্যমুনি গাঁওসভার প্রধান ও অন্যান্য সদস্যর কাছে জানতে পারা গেছে যে, সানগাঙ্গ নদীর সমতল অববাহিকার উর্বর জমির মালিক ছিলেন কলই ও জমাতিয়ারা। জনৈক শুঁটকি মাছ ব্যবসায়ী মহাজনী করেই সমস্ত 'নাল' জমির মালিক হন। ৬০-৭০ বছর আগে মহাজনরা ছিলেন উপজাতিদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

ত্রিপুরার 'ত্রিপুরী' উপজাতির মধ্যে দুটো গোষ্ঠী সমান্তরালভাবে লক্ষ করা যায় ; একটি দল নিজেদের এবং দেব-বর্মা পদবি ভূষিত রাজবংশ জাত বলে দাবি করেন। অন্য দলটি দুর্গম পাহাড়ে ও জঙ্গলে এখনও নিজেদের পরম্পরাগত জীবন অব্যাহত রেখেছেন, তাঁরা হলেন 'ত্রিপুরী'। এই ত্রিপুরী গোষ্ঠীর একদল শিক্ষিত মানুষ (কাতাল) যখন নূতন করে হিন্দু জাতি-বর্ণের আওতায় আসার চেষ্টা করতে লাগলেন, সামাজিক শুদ্ধির মাধ্যমে, রাজ আদেশে তাঁদের বলা হত 'নোয়াতিয়া'। আসলে ত্রিপুরী গোষ্ঠীই 'নোয়াতিয়া' নামে পরিচিত হয়েছে। সরকারি কাগজপত্র ও জনগণনার প্রতিবেদনগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, ত্রিপুরী গোষ্ঠীকে বিভাজিত

করার জন্যেই এটা করা হয়েছে। ঠিক যেমন মেচ, রাভা উপজাতি, রাজবংশী, পোলিয়াদের তপশিলি জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কুরমি মাহাতো গোষ্ঠীর বেদিয়া কুড়মি, কুড়মালি গোষ্ঠীগুলি উপজাতি, কিন্তু কুড়মি-মাহাতো গোষ্ঠী বর্ণহিন্দু দেখানো হয়েছে ১৯৩১ সালের পর থেকে। 'জমাতিয়া' গোষ্ঠীর মানুষরা একই স্থানে জমা বা 'বুথুপ' হয়ে থাকতে ভালোবাসেন বলেই 'জামাতিয়া' উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রায়ই ঘটে থাকে এবং তা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত।

'হালাম' গোষ্ঠীর মানুষরা 'ত্রিপুরী' গোষ্ঠীর মানুষদের বলতেন—

টিপরা শালাই বরখ গিয়া
লাই ফাং লাই লাই লাইয়া
গুৎপাই, ভাদর মাসে নাই পাই।

(ভাবার্থ : ত্রিপুরীরা অমানুষ, তাঁরা মানুষের মর্যাদা দিতে জানে না, ভদ্রতা জানে না। কলকাতা যেমন পাতা নয় ওই পাতা সহজেই ছিঁড়ে যায়, তেমনি ত্রিপুরীদের কথারও কোনো দাম নেই। ভাদ্র মাসে ঝুমের পাকা ধান থাকে সকলের বাড়িতে, কিন্তু তখন ওদের বাড়িতে ধান দেখতে পাওয়া যায় না।)

ত্রিপুরী দেববর্মাদের সম্পর্কে আরও একটি প্রবাদ—

রান্দী জুক্‌মা বু ম্যয়গনং
মুসাই যা পাইবু তুই গনং
টিপরাশা গুৎপাইনি আরলা হাইফানসি
টিপরা গুৎপাইনি নগাস মাইকোরোই।

(ভাবার্থ : ভাদ্র মাসে, একজন বিধবার বাড়িতে যান বা খাদ্যশস্য থাকে, হরিণের পায়ের দাগেও জল থাকে। কিন্তু ওই সময় ত্রিপুরীদের বাড়িতে ধান থাকে না। তারা কীভাবে বেঁচে থাকে? নিশ্চয় পরান্নভোজী। তারা বুদ্ধিমান, ওই ভাবেই তারা বাঁচে।)

হালাম, জমাতিয়া, রিয়াং গোষ্ঠীর লোকেরা ত্রিপুরীদের সম্বন্ধে বলে—

বারঘরিয়া টিপরাও রাজবংশ হনুই
বান্দে ওই চাও। আবনী বাগই বরাওনঅ চু
বরক হুনিয়া।

(ভাবার্থ : ত্রিপুরীদের বারো ঘর বা বংশ নিজেদের রাজবংশের লোক বলে পরিচয় দেয়। টিপরা গুৎপাইরা এইভাবে লোক ঠকিয়ে খায়। এই জন্যেই হালামরা

তাঁদের মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না।) হালাম উপজাতি গোষ্ঠির বংচের, কাইপেঙ্গ এবং মলশম গোষ্ঠীর মানুষ ত্রিপুরীদের 'ওয়াই' বলেন নিজ নিজ গোষ্ঠীর ভাষাতে। কারণ ত্রিপুরীরা 'ওয়াই ছাঙ্গ' বা কক্ বরখ ভাষা বলেন। জমাতিয়া, রিয়াংদেরও 'ওয়াই ছাঙ্গ' বলা হয় আবার হালামদের ত্রিপুরী, রিয়াং জমাতিয়া গোষ্ঠীর মানুষরা বলেন 'খুই দুখ, যারা পাখি শিকার করে খায়। ত্রিপুরীদের কলই গোষ্ঠীর লোকরা বলেন গুৎপাই ছ্যালারখে (কুড়ের বাদশা ত্রিপুরী), রিয়াংদের তারা বলেন 'ছ্যালা--রখে' বা 'অচাই (পুরোহিত) গিরি করে খায়। পরান্নভোজী বা কায়িক পরিশ্রম বিমুখ ব্যক্তিদের 'আদোওউ' বলে ঘৃণা করা হত।

উপজাতি মেয়েরা পিঠে ঝোলানো ঝাঁকা বোঝাই করে সবজি নিয়ে বাঙালি অধ্যুষিত শহরে আসত। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই লেনদেন। কিন্তু পদ্ধতিটা কী ? তারা ঘুরে ঘুরে বাঙালি গৃহিণীদের সঙ্গে 'বৈনারী' পাতাতো অর্থাৎ বোনের সম্পর্ক স্থাপন করত। উজাড় করা আন্তরিকতার সঙ্গে বোনকে সে এগিয়ে দিল তাঁর প্রতি উপহার (পণ্য নয়) বাঁশের কুড়ুল, কাঁকুড়, বকফুল অথবা কলার মোচা। বিনিময়ে সে আশা করত ভালোবাসার ছোয়া মেশানো একটা মুড়ি একটুখানি চা, কখনো একটা পুরোনো কাপড়, বৎসরান্তে পুজোর সময় একটা নূতন শাড়ি অথবা ব্লাউজ (পয়সা নয়)।

'বাপ, ছেলে, ছেলের বৌ তিনজনে মিলে যতটা সম্ভব পাটের বোঝা নিয়ে হাটবারে হাটে নিয়ে এল। ওরা অবাক, বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে ব্যাপারীর পাল্লায় কিছুতেই এক মন হয় না। বাঙালিদের মধ্যে কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ না করলে তাঁরা নীরবে মেনে নিত ব্যাপারটা। তার মানসিক গঠন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সে পর্যায়ে পৌছোয়নি— সভ্যতা (?) বিকাশের যে পর্যায়ে এ রকম শঠতা সম্ভব।'

এইভাবে নানা ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাঙালিদের তাঁরা বলেন 'ওয়ানশা'। 'সমতল ক্ষেত্রের চালাক লোক' বা কোনো সময় 'বহিরাগত' ও 'বিদেশির' সমার্থক শব্দ রূপে 'ওয়ানশা'র ব্যবহার। এই ওয়ানশারা এক সময় উপজাতিদের কাছে ভীতিপ্রদ ছিল না। বরং তাঁরা ভাবতেন যে, দেখা যাক না কতদূরের জল কতদূর গড়ায়। কিন্তু ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর ঘটনার গতিপ্রকৃতি এমন দ্রুত পরিবর্তন হল যে, তাঁদের মনোজগতে, জীবনধারাতে 'ওয়ানশা'রূপী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র ক্ষতিকারকই নয়, তাঁদের 'পৃথিবী'তে বাঙালিরা অমানব কোনো বিশেষ গোষ্ঠী। সংঘাতের প্রেক্ষাপট বহুদিন আগেই বপন হয়েছিল ক্ষমতা, অধীনতা, বশ্যতার প্রশ্নে, বাঙালিরা কোনো সময়ই উপজাতিদের সমপর্যায়ের ভাবতেন না।

ত্রিপুরার 'পাহাড়ি' মানুষেরা নিজেদের 'বরক' বা মানুষ বলেন। যেমন 'হড়'

শব্দের অর্থ মানুষ। 'ওয়ানশা' শব্দটি 'দিকু' বা 'গোলের' শব্দের সমার্থক। বংচের, কাইপেঙ্গ, মলশম উপশাখার মানুষরা মুসলমান চাষিদের বলতেন করথুক। কলই, ত্রিপুরী, জমাতিয়ারা ছোটো বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্যে বলেন, 'ওয়ানশা ফাইকা' বা কাইপেঙ্গরা বলেন 'কর আহঙ্গ' যার অর্থ 'বাঙালি আসছে'। মুখ্য সূচনাজ্ঞাপক ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় আলোচনা করে জানতে পেরেছিলাম যে, মুখ্যত মুসলমান চাষিরাই প্রথমে এই পার্বত্য এলাকাতে উপজাতিদের লাঙল দিয়ে চাষবাস করার কৃৎকৌশল শিক্ষা দেন। তাঁদের দেখাদেখি কলই, রোপিণী ও ত্রিপুরী গোষ্ঠীর মানুষ এবং জমাতিয়ারা কৃষিকার্যে লাঙল ও বলদ ব্যবহার করেন। মুসলমানরাই আবার ছিলেন গরুর ব্যবসায়ী (সরাৎ ব্যাপারী)। তেলিয়ামুড়া, জামজুড়ি, সোনামুড়ার হাটে এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁরা গরু-মোষের ব্যাবসা করতেন। এ ছাড়া দামড়া গরু থেকে বলদ করার জন্যে গরুর অণ্ডকোষ ছেঁচা বা কেটে বাদ দেওয়ার ব্যবসাও মুসলমান ব্যাপারীরাই করতেন। স্থানীয় ভাষাতে এর নাম 'সরাৎ জাং তিল পাই'।

'ওয়ানশা' ও 'কর থুক'দের মহাজনী কারবার পাহাড়ি অঞ্চলের ছোটো ছোটো বাজার ও হাটগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। তাঁরা যে 'দাদন' দিতেন, বছরে তার সুদ ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। তা ছাড়া 'দরকাটা' বা বাধ্যতামূলক পণ্য বিক্রি করার ব্যবস্থা থাকার জন্যে উপজাতিরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়তেন। উপজাতিদের খামারে ফসল ওঠার আগেই ঝুম খেত থেকেই পাকা ফসল মহাজনের গোলাতে উঠতে থাকত। মহাজন গ্রামের চৌধুরীর বাড়িতে 'ময়্যালী' করার নামে একেবারে জামাই আদরে থেকে সমস্ত গ্রামের কৃষিজাত ফসল সুদ বা 'দরকাটা' হিসেবে নিয়ে আসতেন উপজাতিদের বেগার (বেকার) খাটিয়ে। ত্রিপুরার উপজাতিদের ঘরে ঘরে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে। এই সময় কম টাকা দাদন দিয়ে মহাজন ফসলের বিনিময়ে 'দরকাটা' চুক্তি করতেন। 'রেন' বা বন্ধকী কারবারের জন্যে উপজাতিরা নিজের হালচাষ যোগ্য জমিতে মহাজনের 'বগাদার' বা বর্গাদারে পরিণত হতেন। ফসল উঠতো গিয়ে মহাজনের ঘরে। কেউ প্রতিবাদ করলে মহাজনদের নির্দেশে, বিপদের সময় তাঁর হয়ে কেউ 'জাবীন' বা জামিন দাঁড়াতেন না। এ ছাড়া মহাজনদের নিজস্ব লোক হাটবারে কিংবা বাজারে 'ফারিয়া' বা 'মালদার' বা মিডিলম্যানদের ভূমিকা পালন করতেন। মাল কিনে তাঁরা মহাজনের গোদামেই বা আড়তেই জমা করতেন। সব মিলিয়ে বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে ত্রিপুরা ছিল মহাজনী কারবারের স্বর্গরাজ্য। উপজাতিরা জমি গ্রাম ছেড়ে দুর্গম এলাকাতে চলে গেলেও রেহাই ছিল না। মহাজনেরা 'দরকাটা' ও সুদ উশুলের

আশাতে বৎসরান্তে 'ময়্যালী' করতে অবশ্যই যেতেন। জীবন চক্রবর্তী (১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৭৯) লিখেছেন, '৪১ থেকে ৫২ সালের মধ্যেই পরিষ্কার বোঝা গেল ত্রিপুরার উপজাতিদের পক্ষে জমি ধরে রাখা অসম্ভব। বিশেষ করে বাঙালি মহাজন শ্রেণির লোকজন যে সমস্ত ধূর্ত কায়দায় জমি কেড়ে নিচ্ছিল তার মোকাবেলা করা আইনকানুন-এ অনভিজ্ঞ সরল উপজাতিদের পক্ষে অসাধ্য। প্রয়োজনের সময় চার আনা মূল্যের এক সের লবণ আর দু-টাকা দামের আধ সের সিদল শুঁটকি সুদে আসলে বেড়ে তিন বছরের মাথায় জমি ব্যবসায়ীর হাতে চলে গেছে, এমন উদাহরণ অজস্র। গরিব একজন উপজাতি মানুষ আইনের সাহায্য নিয়ে জমি রক্ষা করবে এ চিন্তা অবাস্তব। আইন আদালতের গোলক ধাঁধা, এর উকিল, মুহুরি আর দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন একজন উপজাতির অবশিষ্টাংশও নিংড়ে তাকে পথের ভিখিরি করে দিত।

বরং জমির আশা ছেড়ে দিয়ে, যা কিছু সম্বল আছে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের কোনো গভীরে চলে যাওয়া ভালো। এবং ঘটেও ছিল তাই। সমতলভূমি ক্রমশ বাঙালিদের দখলে চলে আসছিল। উপজাতিরা ক্রমশ পাহাড়ের উঁচুতে সরে যাচ্ছিল। যে সমস্ত উপজাতির কিছুটা আর্থিক সামর্থ্য আছে; যাকে অভাবের তাড়নায় ধারের জন্যে হাত পাততে হয় না তাঁদের জন্যে ভিন্ন কৌশল। একটার পর একটা মিথ্যা মামলা করা হোত। মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলতো সেসব মামলা। প্রয়োজনে একই ব্যক্তির নামে ব্যবসায়ীদের এজেন্টরা মামলা করতো বিভিন্ন মহকুমার বিভিন্ন আদালতে। আগরতলার একজন উপজাতি আদালতের শমন পেত ধর্মনগর আদালত থেকে, বিলোনিয়া থেকে, সেই সঙ্গে খোয়াই থেকে। মামলা সত্যি কি মিথ্যা সে তো অনেক পরের কথা। মামলাতো লড়তে হবে মাসের পর মাস, ছুটতে হবে প্রতিদিন এ মহকুমা থেকে সে মহকুমা। শ্রাদ্ধ হবে অজস্র অর্থের। এগুলো চলবে যতদিন না লোকটা জমিটা ছেড়ে দিচ্ছে। বিনামূল্যে অথবা পনেরো টাকা কানি দরে। এ জমিই তাঁর ঠিকানা পৌছে দেয় তথাকথিত সভ্য মানুষগুলোর কাছে। ওদের হাত থেকে সে মুক্তি চায়। ঠিকানার ওই যোগসূত্রটা ছেড়ে দিয়ে সে হারিয়ে গেল গহন অরণ্যে— সেখানে সভ্য মানুষগুলো তাকে আর খুঁজে পাবে না।

এ ছাড়া আছে বিভিন্ন পুলিশী মামলা। পরিকল্পিতভাবে অজস্র মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে রাখা হোল বহু উপজাতিদের। প্রশাসনের সম্মতিতে বটতলার বিরাট উপজাতি সমাধিক্ষেত্র উদ্‌বাস্তুরা দখল করে নিল। অনেক মুসলমান সমাধিস্থল বেদখল হল। তেলিয়ামুড়ার গোটা বাজার এলাকা এবং আশপাশ পুরোটা ছিল

উপজাতিদের জোত জমি। সমগ্র এলাকা জোর করে দখল করে নিল উদ্‌বাস্তু ব্যবসায়ীরা।

বাঙালি পাহাড়ি সংঘাত

সুদীর্ঘ কয়েকশ বছর ধরে সমগ্র পাহাড়ি জাতিসত্তা ও বাঙালি জাতিসত্তার যে সমস্ত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতীক পরস্পরের কাছে উদ্‌ভাসিত হবার ফলে যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল তাতে সমঝোতার বাতাবরণ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছিল এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস এতদিনকার সংহত জীবনবোধকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল করে তুলেছিল। পাহাড়িরা বলত 'ওয়াইজোইখে ঝালারখে বামুন' অর্থাৎ কোনো বাঙালি যখন কর্মবিমুখ হয় বা অত্যন্ত কুঁড়ে, তখন সে পৈতা নিয়ে ত্রিপুরাতে 'বামুন' হয়ে পড়ে। আর বামুনদের যা কাজ তাই সে করে— এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় আর 'ওঁ, 'চং', 'স্বাহা' ইত্যাদি বলে পেট চালায় যা পাহাড়িরা বোঝে না। 'ওয়ানশা' ও পাহাড়িদের সম্পর্ক ও লেনদেন বুঝতে হলে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতীকগুলো বুঝতে হবে। এগুলি হল—

(ক) ওয়ানশারা সাধারণত 'কান ওয়ানজোই' বা যাঁদের মেয়েরা শাড়ি পরেন। অন্যদিকে পাহাড়িরা 'রিগনাই' (নিজেদের তাঁতে বোনা লুঙ্গির মতো) ও 'রিসা' (বক্ষবন্ধনী, যা তাঁতে বোনা) পরেন। ওই পরিধেয়গুলিতে নানা 'বুমুল' বা নকসা করা থাকে।

(খ) বাঙালিরা 'ওয়ানছুক' বা বুদ্ধিমান বা চালাক। পাহাড়িরা সরল ও সহজ।

(গ) বাঙালিরা 'ভাবুক' বা যাঁরা চিন্তাভাবনা করে কাজ করেন। পাহাড়িরা চিন্তাভাবনার ধার ধারে না। একেবারে সহজ ও ভাবনাবিহীন জীবন যাত্রাতে তাঁরা অভ্যস্ত।

(ঘ) বাঙালিরা খুব বেশি মিষ্টি খায়। পাহাড়িরা মিষ্টি খেলেও খুব কম খায়। পাহাড়িরা গুদক রান্না করেন বাঁশের চোঙে। শুঁটকি সিদল রান্না বাঙালিরা অন্যভাবে করেন।

(ঙ) বাঙালিরা বাংলা ভাষাতে কথা বলেন। ধনসম্পদে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে তাঁরা পাহাড়িদের থেকে নিজেদের অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেন। পাহাড়িরা সাধারণত 'কক বরখ' ভাষাতে কথা বলেন এবং ধনসম্পদ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা বাঙালিদের থেকে বহু পিছনে। সংস্কৃতিগতভাবে একসময় বাঙালিদের থেকে হীন ভাবলেও পুরাতন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাহাড়িরা গর্ববোধ করেন।

(চ) বাঙালিরা সুদখোর এবং 'ময়্যালী' করেন। পাহাড়িরা কোনোমতে সারাবছর খেয়ে পরে থাকাটাকেই স্বস্তি বোধ করেন, তাই সুদখোর ও ময়্যালী করা বাঙালিদের সম্বন্ধে একটা ঘৃণার বাতাবরণ তাঁদের মধ্যে আছে।

(ছ) বাঙালিরা 'আউলী' দেশ বা 'ইঁয়াংলা' দেশ থেকে এসেছেন অর্থাৎ যাঁরা আগরতলা বা সমতল বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। অন্যদিকে পাহাড়িরা ত্রিপুরার স্থানীয়, যাঁরা এক সময় উত্তর-পূর্ব ভারত ভূখণ্ডের এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন বহু শতাব্দী আগে।

(জ) বাঙালিরা অসত্য কথা বলতে একটুকু দ্বিধাবোধ করেন না! অন্যদিকে পাহাড়িরা সৎ, মিথ্যার আশ্রয় নেন না।

(ঝ) বাঙালিরা প্রয়োজনের তুলনাতে অতিরিক্ত কথা বলেন, পাহাড়িরা সংযমী ও মৃদুভাষী।

(ঞ) বাঙালিদের পা সরু ও লম্বা। পাহাড়িদের গোড়ালি মোটা ও পা বেঁটে।

(ট) বাঙালিদের পদবি ঘোষ, বসু, মুখার্জি, ব্যানার্জী, চক্রবর্তী, গাঙ্গুলি, ভট্টাচার্য, নন্দী, সেন, রায়, দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত, দেব, বিশ্বাস, সাহা, পাল, কর্মকার, দাস ইত্যাদি। পাহাড়িরা গোষ্ঠী পদবি ব্যবহার করেন যেমন ত্রিপুরা, দেববর্মা, জমাতিয়া, রংখল, কলই, বংচের, রোপিনী, কাইপেঙ্গ ইত্যাদি।

(ঠ) 'বাঙালি' জাতির মধ্যে ঢোকা খুবই মুশকিল ও কঠিন। কিন্তু পাহাড়িদের মধ্যে ঢোকা খুবই সোজা এবং সেটা গোষ্ঠীগুলি মেনে নেন। যেমন কাইপেঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকতে হলে সমাজপতিদের ও কাইপেঙ্গ সাধারণ মানুষদের মদ, বুতুক, ও শূকর মাংস দিয়ে ভোজ দিলেই কোনো 'আনাম'-এ (বংশে) ঢোকার অনুমতি মেলে।

(ড) বাঙালি সমাজে ঘর-জামাই হয়ে তাকে, হবু পত্নীর ও শ্বশুর শাশুড়ির হয়ে চীন চার বছর ধরে কাজ করাটা খুব লজ্জাকর ও অশোভন ব্যাপার। কিন্তু পাহাড়ি সমাজে 'চামরুই' বা ঘরজামাই থাকা ও শ্বশুরবাড়ির জন্যে কাজ করা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত।

(ঢ) পাহাড়িদের গড়িয়া উৎসব জাতীয় উৎসব। বাঙালিদের দুর্গাপূজা। ঝুমক্ষেত্রের বিভিন্ন দেব-দেবী পাহাড়িদের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। বাঙালি চাষি ও ব্যবসায়ীদের দেব-দেবী সম্পূর্ণ আলাদা।

(ন) বাঁশের ব্যবহার পাহাড়িদের জীবনে সর্বত্র। কের উৎসব থেকে শুরু করে

মাইনাংমানি (ঝুমের ভোজ) ভোজের জন্যে ‘ওয়াখলং’ (বাঁশের আগা) মারফত নিমন্ত্রণ করা সহ মৃতের জন্যে ভোজ ‘আথি-বুপেক’ সহ সমস্তক্ষেত্রে বাঁশ অতি প্রয়োজনীয়। বাঙালিরা বাঁশের থেকে বিভিন্ন উপকার নিলেও মূলত বাঁশ তাদের কাছে বাণিজ্যিক বস্তু।

সুতরাং বাঙালি ও পাহাড়ি জাতিসত্তার মানুষদের সহাবস্থান, স্থিতি পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যের অভাবে জটিল হতে জটিলতর হতে থাকে। পারস্পরিক খাপ খাওয়ানো দূরে থাক, তাঁদের সহাবস্থান দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পথকে প্রশস্ত করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকে এই দ্বন্দ্বের প্রতীকগুলি আবছা চোখে পড়তে শুরু করে আর স্বাধীনতাউত্তরকালে জনসংখ্যার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সংঘাতের আবর্ত বাড়তে থাকে যা আজ এক জটিল সমস্যা ধারণ করেছে। মানব সমাজের এই পারস্পরিক গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও তার চাপা উত্তেজনাকে কাঠামোগতভাবে নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, এর ফলে দ্রুত সমাজ বিবর্তনের সংকেতগুলি ও গোষ্ঠিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সমাজবির্বতনের ধারা বুঝতে হলে দীর্ঘ সময়ের স্রোত বা ইতিহাসের গতিপথও বোঝা দরকার। এটা বোঝা দরকার এই জন্যে যে, আমাদের এই দেশটির নাম ভারত। যেখানে বৈচিত্র্যের বিভিন্ন ও বহুমুখী স্রোত আজও সমান ভাবে বহতা বা বহমান। বিংশ শতাব্দীতে রষ্ট্রীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কেন্দ্রীয় ভাবনা চিন্তার মানুষজনরা, যারা মূলত শহরবাসী তাঁরা নিজেদের ‘মূলধারা’ বলে ভেবে যতই শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখুন না কেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার সুরটির জন্যে ভারত আত্মা চিরকাল দরজা খুলে রেখেছিল নানা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণে। তাই ত্রিপুরাতেও আমরা এই মহামিলন প্রত্যক্ষ করি।

কুকীচিন

প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৪৮) বলেছেন যে, অসম উপত্যকার ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মধ্যে ‘কুকী-চিন’ ভাষাভাষী মানুষের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের স্ব-গোষ্ঠীর লোকরা এখনও ব্রহ্মদেশে বসবাস করেন এবং ইতিহাসের আদিকাল থেকে তাঁরা মণিপুর, লুসাই পাহাড় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন। ত্রিপুরার ইন্ডো-মঙ্গোলয়েড মানব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী এবং এরা লুসাই পাহাড় ও মণিপুর হয়ে ত্রিপুরাতে

প্রবেশ করেন। এরা অসমিয়া বা বাঙালিদের কাছে 'কুকী' বলে পরিচিত। ব্রহ্মদেশের জনগণের কাছে তাঁরা 'চিন' বা কুকী-চিন নামে পরিচিত। ১৯৬১ সালের জনগণনাতে কুকি-চিন ভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ১০,৪৩,৪১৪ জন— তার মধ্যে ৬.৫ লক্ষ মণিপুরবাসী এবং ২,২১,২০২ জন লুসাই বা মিজো নামে পরিচিত। 'বড়ো' ভাষাগোষ্ঠীর উপজাতিরা মূলত 'নাগা' উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত, যদিও দীর্ঘদিন নাগারা একেবারে আদিম ও বিচ্ছিন্ন ছিল।

এই 'বড়ো' ভাষী মানুষরা উত্তরবঙ্গের মেচ, রাভা, পোলিয়া, রাজবংশী গোষ্ঠীর মানুষ এবং এরা ত্রিপুরাতে ত্রিপুরী, জমাতিয়া গোষ্ঠীর মানুষ। ত্রিপুরা বিধানসভার ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতা শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় (১৮।০৫।৮৪) জানান যে, সমগ্র ত্রিপুরার উপজাতি মানুষ অধ্যাপক চ্যাটার্জীর কাছে ঋণী। বিশেষত উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে। শ্রী ত্রিপুরা বলেন যে "আমাদের আদি জন্মভূমি বা উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের আগে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। উপজাতি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর 'বড়ো' ভাষী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬২৮ বছর আগে, অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ বছর আগে এই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ প্রাচীন চীন মহাদেশ থেকে নয়াবসতির সন্ধানে আসামের উপত্যকাতে এসে পৌঁছান। পরবর্তীকাল প্রাচীন থাইল্যান্ড থেকে আগত শক্তিশালী 'আহোম' গোষ্ঠীর মানুষ 'বড়ো' ভাষীদের আরেকবার হটিয়ে দেয়। মেচ/রাভা/রাজবংশী/পোলিয়া গোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত 'হাচু-কুচু' অর্থাৎ পার্বত্যবাসী। হা-কুচুক অর্থাৎ উঁচু পাহাড়ে হাচুক বা ঝুম চাষ করে তাঁরা বাঁচতেন। 'বড়ো'দের একটা অংশ ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার সঙ্গম স্থলে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে) বসবাস শুরু করে। এরাই তুই-প্রা বা দু-নদীর মোহনাতে বসবাসকারী। 'তুই-প্রা' থেকেই 'টিপরা' শব্দটি এসেছে। বড়োদের মধ্যে যারা আহোমদের কৃৎ-কৌশল ও দক্ষতার কাছে নতি স্বীকার করে নেন তাঁরা 'কচার' বা 'কাছাড়ীশা' বা 'কাছাড়ী' নামে পরিচিত।" মেচ সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ হীরাচরণ নারজিনারীর মতে পার্বত্য মালভূমি থেকে সমতল বাংলার সৌন্দর্য দেখে 'বড়ো'ভাষী মানুষ চেঁচিয়ে উঠেছিল 'ইয়াংলা' (বা বৃহত্তম সমতল ক্ষেত্র) বলে। শ্রী ত্রিপুরার দাবিও তাই যে 'ইয়াংলা' থেকেই 'বাঙ্গলা' শব্দের উৎপত্তি। হালাম গোষ্ঠীর নয়াবসতি সম্পর্কে শ্রী ত্রিপুরা বলেন যে, তাঁরাও আদিতে চীনের শান প্রদেশের লোক। তারা নয়াবসতির সন্ধানে 'সিম্‌লুম' গুহা পার হয়ে বর্মা হয়ে মিজোরামে আসেন আনুমানিক ১৫৫৫-১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে তাঁরা লুসাই নামে পরিচিত হন। এবং পরে ত্রিপুরা ও অসমে এরা কুকি নামে পরিচিত হন।

গোষ্ঠী রূপান্তর

উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তর ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি ও সামাজিক সভ্যতার ক্রমাগত লেনদেনের পরিধি ও ব্যাপকতা আলোচনা করতে গেলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতির কথা আমাদের ভাবতে হবে। পাহাড়ি মালভূমি ও উপত্যকা প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। উপজাতি গোষ্ঠীগুলির বসবাস এই পাহাড়ি এলাকার আন্তর্জাতিক সীমান্তে। ভারত-ব্রহ্মদেশ, ব্রহ্মদেশ-চীন, ব্রহ্মদেশ-থাইল্যান্ড এবং থাইল্যান্ড-লাওস সীমান্তে এই সব নানা উপজাতির বসবাস। এবড়ো-খেবড়ো, অস্থির পাহাড়ি উপত্যকা ও মালভূমি, ঘন জঙ্গলে আবৃত। উত্তরে চীনের য়ূনান প্রদেশ এবং ভারতের অরুণাচল প্রদেশের নামিকো পর্বতশ্রেণি, দক্ষিণে নিচে মণিপুরের হোমালিন ও মিজোরামের চিন পর্বতশ্রেণি এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি গোষ্ঠী সত্তা ও তাঁদের আত্মীয়তার বন্ধন আন্তর্জাতিক সীমারেখার বন্ধনকে অস্বীকার করে। অধ্যাপক বি. কে. রায়বর্মন আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে বৃহত্তর শক্তির রাজনৈতিক শাসন ও সংস্কৃতির মধ্যবর্তী ও যোগাযোগ রক্ষাকারী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বভাবতই যোগাযোগ রক্ষাকারী গোষ্ঠী ও বৃহৎ শাসনের সীমান্ত মধ্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন খণ্ডখণ্ড গোষ্ঠীর জন্ম হয়, আচার অনুষ্ঠান ও ভাষা সংস্কৃতির পার্থক্য স্পষ্ট রূপে দেখা দিতে থাকে। ফলে নিকটবর্তী শাসক সমাজ ও প্রতিপত্তিশালী অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে তাদের নামও পাল্টে যেতে থাকে। তাঁদের রাজনৈতিক চরিত্রও পাল্টে যেতে থাকে। দূরত্ব এমন স্থানে এসে পড়ে যে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেয়। স্ব-পরিচয়, গোষ্ঠী সংঘাত ও সংকটের তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা বৃহৎ ক্ষমতাশালী ও সামরিক শক্তিকেই দায়ি করেন এই সংকটের জন্যে।

যোগাযোগ রক্ষাকারী গোষ্ঠী ও সীমান্ত মধ্যগোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে তাঁরা মূলত ছিলেন 'মক্কেল' সমাজ। তাঁদের আর্থ-সামাজিক গতিপথ নির্ভর করত প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকদের হাতে। তাঁরা নূতন কোনো যান্ত্রিক প্রয়োগ, কোনো নূতন উৎপাদন পদ্ধতি কিংবা কোনো সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন (সীমান্তের ওপারে) করতে পারতেন না। পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠীর মাতব্বরী এর ফলে অব্যাহত থাকত। নানা বিধিনিষেধের ফলে তাঁরা নিজেদের সমাজে সামাজিক গতিশীলতা ও সম্পদের সমানুপাতিক বৃদ্ধির হেরফের করতে পারতেন না। কিন্তু যোগাযোগ রক্ষাকারী ও সীমান্ত মধ্যগোষ্ঠীগুলির সামাজিক ক্রিয়াবাদের ভূমিকা আবার অনেক সময় প্রচণ্ড সংকটের মুখে পড়ে

সংহত গোষ্ঠী চেতনারও জন্ম দেয়। মিজোরামের 'মিজো' জাতিসত্তার মানুষরা একসময় এতই খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছিলেন যে, পারস্পরিক সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বিবাহ ছিল পরস্পরের মধ্যে নিষিদ্ধ। আসলে ভূমি যখনই পণ্যবস্তু হয়ে দেখা দিল তখনই উত্তর-পূর্ব ভারতে দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে 'বোড়ো' ভাষা গোষ্ঠীর মানুষরা এখনও মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বজায় রেখেছেন। যদিও হিন্দুত্বের প্রভাবে তাঁরা দারুণভাবে প্রভাবিত। এখনও আনুমানিক ৩০৩,০৩০ জন বোড়োভাষী মানুষ টিপরা বা মুরুং নামে ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচিত। ত্রিপুরার শাসক রাজবংশ ও তাঁদের নিকট আত্মীয়রা কীভাবে উপজাতি সত্তা থেকে সংস্কৃতকরণের ফলে পরিবর্তিত এক বহিরাগত আর্যভাষী ভারতীয় হিসেবে পরিচিত হন, তার এক অতি উজ্জ্বল নমুনা। পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা নিজেদের উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রিয় এবং পাণ্ডবদের আত্মীয় বা বংশধর এবং চন্দ্রবংশীয় বলে নিজেদের পরিচয়কে ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকেই প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছিলেন বিভিন্ন 'রাজমালা' মারফত। যদিও 'রাজমালা'কে ঐতিহাসিক সর্বজনমান্যতা পণ্ডিতেরা সহজে দিতে চান না। কিন্তু সুনীতি বাবু অসমিয়া পণ্ডিত রতন কানডালি ও অর্জুন দাস লিখিত 'ত্রিপুরা বুরুঞ্জি' (১৭২৫) পুস্তকটিকে প্রামাণ্য মনে করেন এবং ত্রিপুরার রাজপরিবার যে বোড়ো-ভাষীদের থেকে উদ্‌ভূত তা স্বীকার করেন। এই পুস্তকের সর্বজনগ্রাহ্যতা সকলেই স্বীকার করেন এবং ওই লেখকদ্বয়ের গ্রন্থটি ১৯৩৮ সালে গৌহাটি থেকে প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরার হালাম উপজাতি গোষ্ঠীর কলই উপশাখা যদিও আজ কক-বরখ ভাষী, তবুও তাঁরা আসলে 'কুকী'দেরই একটি অংশ। অত্যন্ত সহজ, সরল ও অতিথিবৎসল এই গোষ্ঠীর মানুষরা বাঁশের বর্শা ও হাতি ধরার ফাঁদ তৈরি করতে এক সময় খুবই দক্ষ ছিল, যা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম রাজস্ব ও অর্থ উপার্জনের সহজতম পথ ছিল। এক সময় বৈরী কুকিদের আক্রমণ ত্রিপুরা সীমান্তে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল (সিকাম-চবা)। কলই উপশাখার মানুষরা নিরাপত্তার জন্যে নিজ নিজ গ্রামের সীমানা বা চৌমাথাতে কলই মহিলাদের ব্যবহৃত 'রিগনাই' এবং 'রিসা' (তাঁত নির্মিত পরিধেয় ও বক্ষাবরণী) দেখে দিতেন। কুকিরা আক্রমণ করতে এলে ওই সব বস্তু দেখে নিজেদের আপনজনেদের 'কৈলাম-কলই' গ্রাম আক্রমণ ও লুটপাট করা থেকে বিরত থাকতেন। মহারাজা এই জন্যই 'মিলা-কুকী' ও 'কলই' নামটি গ্রহণ করেন। তাঁদের নিষ্কর জমিও প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরার

অভ্যন্তরীণ শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজপরিবারে অন্তর্কলহ, বহিঃশত্রু আক্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রজা অসন্তোষ প্রভৃতির গতিপ্রকৃতি দেখলেই বোঝা যায় যে, প্রাচীন ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে জাতি-উপজাতি লেনদেন ও জাতিসত্তা বিকাশের বিভিন্ন সূত্র মধ্যযুগ থেকেই আবর্তিত হয়েছে। মহারাজা রত্নফা কর্তৃক মালিক তুগ্রলকে 'ভেকমনি' প্রদান ও 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ ও প্রাচীন 'ফা' উপাধি পরিত্যাগের ফলে রাজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বৃহৎ সামরিক শক্তির সঙ্গে সমঝোতার সূত্র যেমন মেলে, তেমনি সীমান্ত মধ্যগোষ্ঠী (bridge) ও যোগাযোগ রক্ষাকারী (buffer) খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বতন্ত্রসত্তা ও স্বপরিচয়ের প্রশ্নটিকেও টিকিয়ে রেখেছিল।

গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী

মুখ্য সূচনাজ্ঞাপক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় জানতে পারা গেছে যে, বারোখিল বা 'বারখি' হালামেরা বারোটি উপশাখাতে বিভক্ত— যেমন মলশম, কাইপেঙ্গ, রাঙ্গখল, কলই, রূপিণী (পুরাণ রাজটিক), বংচের, করবং, রূপিণী (নূতন রাজটিক), রূপিণী (থাইথাক), রূপিণী (পাইথাক), লাংকাই, মর্মফাং। ত্রিপুরী, জমাতিয়াসহ হালাম উপজাতি গোষ্ঠীর কলই উপশাখার মানুষরা নিজেদের সামাজিক কাঠামোকে দু-ভাবে দেখেন— (১) বসতিগত (২) গোষ্ঠীগত। বসতিগত সামাজিক কাঠামোকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি। সামাজিক আইনসম্মতভাবে বৈধ কোনো কলই শিশুর জন্মগ্রহণের পর গ্রামের অচাই বা পুরোহিত 'সূর্যদরশন' অনুষ্ঠান করেন শিশুর জন্মের পাঁচদিন পর। নিকট আত্মীয়রা ভোজ ও 'বুতুক' পানীয় গ্রহণে যোগ দেন। ওই নবজাত শিশুকে (আবিনা কুলুই) এরপর তার পিতার 'হদা' বা বংশের সদস্য হিসেবে ধরা হয়। এই 'হদা'গুলি হল যথাক্রমে ওয়াগ্রম, ওয়াকবুর, বুকাং, রুজগেই, আবেল, চেরাই, কুছু অথবা কুসু। বিবাহিত যুবক-যুবতী, তাঁদের সন্তানসহ তাঁদের বাবা-মা ও ভাই-বোনরা একটি পরিবারের (নখুং) সদস্য। একই বংশের কিছু পরিবার বা অন্য বংশের কিছু পরিবার মিলে একটি নির্দিষ্ট এলাকাতে বসবাস করেন যার নাম নথথাই বা বুথুপ (পাড়া)। এক বা দুইয়ের অধিক নখথাই মিলে তৈরি হয় একমি 'কামি' (গ্রাম)। 'নখথাই'গুলো এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে গড়ে ওঠে। দশ থেকে বারোটি গ্রাম বা কামি নিয়ে তৈরি হয় একটি 'আমচই' বা ময়্যাল। চার থেকে দশটি আমচই-এর সমষ্টিকে বলে তপ্পল। অনেকগুলি তপ্পল মিলে তৈরি হয় 'হা' বা দেশ।

গোষ্ঠীগতভাবে কলইদের সামাজিক কাঠামো নিম্নরূপ। সদ্যোজাত 'কুলুই' সূর্য দরশনের অনুষ্ঠানের পর 'হদা' বা বংশের সদস্য হন। হদার বিভিন্ন নাম। এরপর একদিকে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ও অন্যদিকে বৈবাহিক কুটুম্ব-বন্ধুদের নিয়ে গঠিত হয় কলই ('লুকু-বেতরা') বা কলই মানব গোষ্ঠী। মলশম, কাইপেং ও বংচের গোষ্ঠীর মানুষ যাঁরা কুকি বা বর্তমানে মিজো গোষ্ঠীর একটি অংশ তাঁদের সামাজিক কাঠামো শুরু হয় বসতিগতভাবে দাংসুং (পরিবার), মুনকা/বুং (পাড়া), খো/খু অ (গ্রাম), ময়্যাল, তপ্পল এবং সবশেষে কাঁরিমি (দেশ)। অন্যদিকে তাঁদের গোষ্ঠীগত পরিচিতি হচ্ছে নেইতি থা (নবজাত শিশু), আনাম/পাঞ্জি (বংশ), কনপুই/ইনদং/দেংসুং (পরিবার), চাকপুই/থিমানিয়া (জ্ঞাতি গোষ্ঠি) এবং অন্যদিকে নাইকিতে/কিচিং (বৈবাহিক আত্মীয়) মিলে তৈরি হয় মানিয়া/মরিয়ম বা গোষ্ঠী।

সামাজিক রীতিনীতি ও অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে প্রত্যেক গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীগুলির নিজস্ব প্রথানুগ শাসন ও বিচারের জন্যে ছিল সর্বোচ্চ পদাধিকারী 'রায়' এবং তাঁর অধীনস্থ পদগুলি ছিল যথাক্রমে গালিম, কাঞ্চন, গাবুর, জাকসুং, খুকসিং ও সেংগা।

কিন্তু গ্রামের 'চৌধুরী' হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি, গ্রামটিতে মিশ্র-গোষ্ঠীর লোকদের বসবাস থাকে। আবার প্রত্যেকটি গোষ্ঠী-পঞ্চায়েতকে সাহায্য করার জন্যে 'ময়ল্যা' ও 'মুদি' (দুজন), বীরসিং-খারসিং (দুজন) ও কাইথার (বারোজনের বাহিনী)। যদিও ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'গাঁওসভা' আঞ্চলিক সভাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরাই প্রচণ্ড শক্তিশালী। সরকারি অফিস, তহশীলদার, থানা, ব্লক ও এস. ডি. ও. অফিসে এদের প্রভাব খুব স্পষ্ট, বিশেষত কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদিতে পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকা ত্রিপুরাতে আজ আর অস্বীকার করা যায় না।

কৃষি ব্যবস্থা

ত্রিপুরার পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে লাঙল দিয়ে চাষ করার প্রবণতা এসেছিল মূলত বাঙালি মুসলমান ও নিম্নবর্ণের দলিত বাঙালি হিন্দু জাতিদের প্রভাবে। যদিও ঝুমচাষে অভ্যস্ত পাহাড়ি মূল্যবোধের মানদণ্ডে লাঙল চাষ একেবারে স্ব-বিরোধী। ঝুম চাষ ত্রিপুরার পাহাড়ি গোষ্ঠীগুলির কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ তার হদিশ আমরা পাই, ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক অনুদানে এগ্রিকালচার ফিনান্স করপোরেশন (১৯৮৩) যে গবেষণা কার্য চালিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় যে, শতকরা ৭৭ জন ঝুমচাষিদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন মনে করেন যে, ঝুম চাষ হচ্ছে তাঁদের

স্বাভাবিক জীবনধারা, ঝুম চাষিদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন ভূমিহীন এবং তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই ঝুম চাষ করে বেঁচে আছেন। প্রতি ঝুমিয়া পরিবারের গড় রোজগার বাৎসরিক ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। শতকরা ৫০টি ঝুমিয়া পরিবার মনে করেন যে, ঝুমচাষ ছেড়ে দিলে তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঝুমিয়া সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলি দ্রুত গতিতে নষ্ট হয়ে যায়। ধনলেখা কাইপেং পাড়াতে বসে প্রায় ৭দিন ধরে বহু পাহাড়ি মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিলাম যে, সমগ্র পাহাড়ি সমাজ ঝুমচাষের অসারতা আজ হাড়ে হাড়ে বোঝেন কিন্তু অন্য কোনো বিকল্প না থাকার জন্যে তাঁরা অসহায়।

কাইপেংরা আউশ/আমন চাষের সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও তাঁরা জানেন যে, একজন বাঙালি নিম্নবর্ণের চাষি বা একজন মুসলমান চাষি সম পরিমাণ জমিতে লাভ করে। কঠোর পরিশ্রম ও সাবধানতা বজায় রেখে, কুশলতা দক্ষতার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার পাহাড়ি সমাজ ভীষণ আমুদে, পরিহাসপ্রিয় ও আড্ডাবাজ। সম পরিমাণ কুশলতা ও দক্ষতা লাভের জন্যে কেউ কেউ চেষ্টা করলেও দরাজ গোষ্ঠী প্রবণতা ও কৃপণতা না থাকার জন্যে তাঁরা লাভের মুখ দেখতে পারে না। ত্রিপুরার নিচু জমিতে প্রতি বছর বন্যার তোড়ে বালি পড়ে। বালি সরানোর জন্যে বাঙালি চাষিরা যত তৎপর কাইপেংরা তত নন। ফলে উৎকৃষ্ট চাষযোগ্য জমি তাঁরা ধরে রাখতে পারে না। ঋণের দায়ে, মিথ্যা মোকদ্দমার দায়ে, তাঁরা লাঙল চাষী থেকে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় ঝুম চাষে আবার ফিরে যান। কলুই বা রোপনী বা ত্রিপুরী মানুষদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে— 'হাল চুয়াইনানী কুরুঙ্গ, সামু তাং নামী কুরুঙ্গ'— ভালো চাষি হতে গেলে পরিশ্রম, সাবধানতা সহ ঠিক কখন কী করতে হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়। আর কলই, রোপিনী জামাতিয়া, ত্রিপুরী অনেক মানুষই হাল চাষে দক্ষ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা মাটি কামড়ে জমিতে পড়ে থাকতে চান। আর এই জমির লড়াইটা আজ ত্রিপুরার পাহাড়িদের অস্তিত্বের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বংচের, মলশম গোষ্ঠীর মানুষরা বেশির ভাগই ঝুমচাষি। তাঁরা এখনও ভালো ঝুম খেতের সন্ধানে সরকারি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকছেন— আর সরকার আইনানুগতভাবে বাধা দিচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁরা দুর্গম বনাঞ্চলে ঝুম খেতের সন্ধানে বড়মুড়া, গরমছড়া, উত্তর বহমুড়া, দক্ষিণ বড়মুড়া, নেলসীছাড়া ইত্যাদি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছেন। বংচের গোষ্ঠীর মানুষরা হালচাষ করতে জানা দূরে থাক, হাল ধরতে পর্যন্ত তাঁরা জানেন না। বংচের পাড়াতে একটি বলদ বা গাভী নেই। তেমনি মলশমদের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গেছে।

রাজনীতি

মহারাজা বীরমাণিক্য ১৯৩১ ও ১৯৪৩ সালে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির জন্যে যে জমি সংরক্ষণ করে গিয়েছিলেন শ্রীঅঘোর দেববর্মার মতে তা ছিল মূলত "এ রাজ্যের উপজাতিদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যই"। প্রথমে মহারাজা ১১০ বর্গ মাইল এবং পরে ২০৬৫ বর্গ মাইল জমি উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত রিফিউজিদের জন্যে দেওয়ান এ. বি. চ্যাটার্জির চাপে 'রিজেন্ট' মহারানি ৩০০ বর্গ মাইল এলাকা মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু এমনভাবে ম্যাপ তৈরি হল যে আরও বহু বর্গ মাইল এলাকা মুক্ত এলাকাতে পরিণত হল। এই গর্হিত কার্যের প্রতিবাদ করলেন ত্রিপুরার মানুষ। পঞ্চাশ হাজার মানুষ সেদিন অঘোর দেববর্মার নেতৃত্বে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর থেকে উপজাতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস হতে থাকে দ্রুতগতিতে। তৎকালীন জেলা শাসক রঞ্জিত ঘোষের ভূমিকা ছিল এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে উপজাতিদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চলে। ১৯৫২ সালে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হল-এ এক সেমিনারে, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীদশরথ দেব বলেছিলেন, "ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এ রাজ্যের জনসংখ্যার চরিত্র বদলে যাচ্ছে, ভূমিতে অসম প্রতিযোগিতা বাড়ছে, দুর্বল ঝুম অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল অনগ্রসর উপজাতিরা এই অসম প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হচ্ছেন। তাঁদের জন্য প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকতে হবে।... একটি মানবগোষ্ঠী যার জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি তাকে যদি পূর্ণ বিকশিত একটি জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে হয়, সে হয় অসম প্রতিযোগিতা, এতে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ব্যাপারটা জটিল। আরো জটিল তাঁদের কাছে যাঁরা উন্নত জাতির লোক হয়েও পেট ভরে খেতে পায় না। অনাহারে অর্ধাহারে জর্জরিত একজন বাঙালি দিন মজুরের কাছে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ একটা 'হেঁয়ালির' মতো। জাতিসত্তা বিকাশের জন্য উপজাতিদের সংরক্ষণ-এর ব্যবস্থা দরকার— এ শ্লোগান লক্ষ লক্ষ বাঙালিও উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু এই শ্লোগানের সহজ সরল বিশ্লেষণ যাদের কাছে দরকার ছিল তাঁদের কাছে হয়নি।"

শঙ্কর বসু মল্লিক তার এক সমীক্ষাতে দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সুখময় সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন উপজাতিদের নির্দিষ্ট জমির সংরক্ষণ আইন করে উঠিয়ে দেওয়া হল এবং সুবিশাল উপজাতি বসতি ক্ষেত্রগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিণত হল, তখন উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত ভূমি পূর্ণ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা

তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী না করার জন্যে, শ্রীদশরথ দেব ও শ্রীঅঘোর দেববর্মনের আশীর্বাদ নিয়ে টি. ইউ. জে. এস গঠিত হল। ত্রিপুরার কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ও ছাত্ররা বিশেষত শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, দ্রাউকুমার রিয়াং, বাজুবান রিয়াং, মনোমোহন দেববর্মা, শচীন্দ্র দেববর্মা, অলিন্দ্র ত্রিপুরা ও তরুণ ছাত্রনেতা নগেন্দ্র জামাতিয়া, নরেন দেববর্মারা এগিয়ে এলেন একটি 'সম্মিলিত উপজাতি সমাজ' গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে। প্রতিবাদী সংগঠন হিসেবে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একটি অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে জমি ফেরতের আন্দোলনও চলতে লাগল।

জগতজ্যোতি রায়ের মতে— "উন্নাসিক বাঙালিরা আদিবাসীদের সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তাতে আদিবাসীদের উপর একটা অবজ্ঞা চিরকালই প্রচ্ছন্ন ছিল।" ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার উপজাতি সমাজগুলির ঐতিহ্যবাহী সকলকেই আপন করে নেওয়ার মানসিকতাকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পারল যে, উপজাতিদের কাছে যা আপন করা ও অপরকে সহ্য করা তা বাঙালি প্রতিবেশীদের কাছে সম্পূর্ণ এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। তাঁরা মনে করেন তাঁরা 'জয়ী' এবং উপজাতিরা 'পরাজিত' সভ্যতা সংস্কৃতির মানুষ। তাই দেওয়ালে পিঠ ঠুকে দাঁড়িয়ে তাঁরা একবার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। 'উচ্চ' সংস্কৃতির মানুষজনের কাছে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাজিত একদল ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাংস্কৃতিক এককগুলি খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাতে তাঁরা সফলও হলেন। কিন্তু উদারপন্থী ও সমঝোতা-প্রবণ নেতৃবৃন্দকে প্রচণ্ড চাপের কলে ফেললেন চরমপন্থীরা। বৈচিত্র্যময় ভারতে চরমপন্থীদের চাপে উদারপন্থীরা সহজে কোনোদিন মাথা নোয়াননি বলেই রাজনৈতিক টানাপোড়েন বহু নিরীহ মানুষের রক্তপাত ঘটে। ত্রিপুরার ভয়ংকর দাঙ্গা, যা ১৯৮০ সালের জুন মাসে ঘটেছিল তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে খুবই সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালি ও পাহাড়ি গোষ্ঠিগুলির মধ্যে সংঘাত ও উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছিল। ত্রিপুরার সংবাদপত্র, প্রশাসন, দলীয় কর্মী ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেন একযোগে ত্রিপুরার শত শত বছরের জাতি-উপজাতি সম্পর্কের সমানুপাতিক বন্ধুত্ব, ভালোবাসার ইতিহাসকে অস্বীকার করার জন্যেই উত্তেজনার আবহাওয়া সৃষ্টি করল। আদিবাসীদের হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা হল না, উপজাতি এলাকাতে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ থাকল, ক্ষুধা ও খাদ্যের অভাব— সব মিলিয়ে এক বিশাল দুর্যোগের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হল, তৈরি হল

অবিশ্বাসের বাতারণ। বাঙালি ও পাহাড়ি মানুষদের এতদিনের তিল তিল করে গড়ে ওঠা সংগ্রামী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। সমস্ত ত্রিপুরা জতুগৃহের মতো জ্বলতে লাগল। রাজনৈতিক নেতারা কত বড়ো অভিনেতা তা আরও একবার প্রমাণিত হল। রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবল প্রতাপান্বিত সংগ্রামী নেতারা দাঙ্গার ব্যাখ্যা করতে দিল্লি গেলেন আর কেউবা নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিলেন কারাগারে। ত্রিপুরার ৮০ সালের জুন দাঙ্গা সম্পর্কে অঘোর দেববর্মা (১৯৮১), জীবন চক্রবর্তী (১৯৮৩), হরিনাথ দেববর্মা এম. এল. এ. (১৯৮০ অক্টোবর) যা বক্তব্য রেখেছেন তাতে প্রশাসনের মেরুদণ্ড পুলিশবাহিনীকে ঘাতকবাহিনী বলা যেতে পারে। ত্রিপুরার দরিদ্র উপজাতি মানুষদের উচ্চফলনশীল জমি ও তাঁদের বসবাসযোগ্য সুন্দর গ্রামগুলি থেকে সুপরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ করাই এই দাঙ্গার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আর ছিল গণতন্ত্রের ভোটঅঙ্কের সংখ্যাতত্ত্বের নব উদ্‌ভাবন, যাকে বলে সন্ত্রাস। অগ্নিসংযোগ, খুন, সংঘর্ষ ও সর্বোপরি শান্তি বাহিনীর শান্তি প্রচেষ্টার নামে পুলিশ অফিসারদের অমানবিক আচরণ, বিবেকহীন মানসিকতা। জুন দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভাতে হইচই হতেই ভারত সরকার গঠন করলেন দীনেশ সিং তদন্ত কমিশন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, পুনর্বাসন, বাঙালি ও উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্যে কমিশন সুপারিশ করল অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ঝোল যাঁরা টানবার তাঁরা খুবই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে 'ত্রাণকর্তা'র প্রশংসাপত্র পেয়ে গেলেন। ত্রিপুরা বিধানসভাতে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৪।০২।৮৩ এক প্রশ্নের উত্তরে ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী জানিয়ে দিলেন মোট ৫৪৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৭৩ জন উপজাতি ও ১১৪ জন অন-উপজাতি। মোট ৫৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন আছে, তন্মধ্যে ৪৬৯৪ জন উপজাতি। ৮০২ জন আসামীকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পুলিশ পারেনি, তন্মধ্যে ৩৫০ জন অন-উপজাতি।

'অল ত্রিপুরা পিপল্‌স্ লিবারেশন অর্গানাইজেশন্' নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম হয়েছিল প্রয়াত বিনন্দ জামাতিয়ার নেতৃত্বে। ২৫।০৮।৮২ তারিখে প্রধান কার্যালয় থাংনাং-এ 'স্বাধীন ত্রিপুরা সরকার' গঠন করেন। পরে সি. পি. এম.-এর প্রাক্তন এম. এল. এ. শ্রীশ্যামল সাহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করেন সরকারের কাছে। ১৬-১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ অমরপুরের বামপুর কলোনিতে এ. টি. পি. এল. ও ৪র্থ বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে তিনি সংগঠন ভেঙে দিলেন এবং দুই নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণা করলেন যে, এ. টি. পি. এল. ও-র সমস্ত সদস্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদে যোগদান

করবেন। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ করেছি বর্তমানে নিষিদ্ধ টি. এন. ভি. উগ্রপন্থীদের তৎপরতা। ভারত সরকার, কংগ্রেস ও টি. ইউ. জি. এস.-এর সুপারিশক্রমে ত্রিপুরাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণাসহ টি. এন. ভি.-কেও নিষিদ্ধ করেছেন। পরে অবশ্য বিজয় রাঙ্গখল মহাশয়ের সঙ্গে ভারত সরকারের এক সমঝোতা হয়।

উন্নয়ন প্রশ্ন

ত্রিপুরার উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপজাতিদের অভিমত খুবই সংশয়সূচক। ডম্বুর নামে পরিচিত উপজাতিদের তীর্থক্ষেত্র, রাইমা ও শরমা নদীর মিলনক্ষেত্র গোমতী নদী অববাহিকা চিরবসন্তের সৌন্দর্যে ভরপুর। মোট ১৭ বর্গমাইল সমতল ক্ষেত্রজুড়ে এই উপত্যকা।

এই উপত্যকা ত্রিপুরার সবচেয়ে উর্বর শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডম্বুর জলাধারের ফলে বাস্তুচ্যুত হলেন মোট ১২০০ পরিবার। তার মধ্যে বাঙালি পরিবারের সংখ্যা ৩০০। বাকি সকলেই উপজাতি। জলাধার নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল জলবিদ্যুৎ তৈরি করা, যার পরিমাণ হবে ১০.৫ মেগাওয়াট। এখন তৈরি হয় ৮.৫ মেগাওয়াট যা ত্রিপুরার শহর আগরতলার পক্ষেই যথেষ্ট নয়। শতকরা ৯৯ জন উপজাতি কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি। কারণ ভূমি জরিপের সময় বেশিরভাগ জমিই সরকারি 'খাস' হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল। ফলে সমস্ত উপজাতি মানুষ ছিলেন 'বেআইনি দখলদার'। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন দেওয়া হল এমন অনাবাদী পার্বত্য এলাকায় যা ঝুমচাষ বা লাঙল চাষের অনুপযুক্ত। পরে তাঁরা পরিণত হলেন 'উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক'-এ।

১৯৭৮, ১৯৮৪ সালের ভয়ংকর বন্যার কারণও এই ডম্বুর বাঁধ ও মহারানি ব্যারেজ। এই জলাধারগুলি পূর্ণ হয়ে গেলে জল উপরে উঠতে থাকে। এর ফলে সানগাঙ্গসহ বিভিন্ন নদীর সমতল অববাহিকাতে ক্রমাগত পলি পড়ছে। দু-একদিনের বৃষ্টিতেই বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। ত্রিপুরার জঙ্গলের মূল ভিত্তি আসলে বাঁশ। বাঁশ ত্রিপুরার জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ত্রিপুরার উপজাতি মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু, ঝুম থেকে কের উৎসব, গড়িয়া পুজো থেকে টংঘর সবকিছু বিভিন্ন ধরনের বাঁশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই বাঁশ দ্রুত শেষ হচ্ছে। এতে ভূমিক্ষয় বাড়ছে। ত্রিপুরার সংরক্ষিত বনে শাল, সেগুন লাগানো হচ্ছে যা ত্রিপুরীদের কোনো কাজেই লাগে না।

ত্রিপুরার উপজাতি ও বাঙালি মানুষের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থল আগরতলা। কিন্তু অম্পি, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, সাবরুম, উদয়পুর, অমরপুরে কলেজ খোলা দরকার, সম্ভব হলে ত্রিপুরাতে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আজ অনেকেই অনুভব করেন। ১৯৮৭-তে ত্রিপুরাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরার উপজাতিরা যেমন বাংলা বলতে পারেন, তেমনি বাঙালিরাও যদি 'ককবরখ'কে আরও উন্নত করেন তবে নৈকট্য বাড়বে। 'রিগনাই, রিসা'কে পূর্ণ মর্যাদাতে প্রতিষ্ঠার জন্যে উপজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন। ত্রিপুরার বৈচিত্র্য ভারতের সম্পদ। পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমেই গড়ে উঠুক নূতন ত্রিপুরা।

নির্বাচিত গ্রন্থসূচি

Sharma, T. R.	1979	Tribal Customary Law in India. A Preliminary Statement. Journal of Social Research, vol XXII. No. 11 September.
Mukherji, Shekhar	1981	Mechanism of Underdevelopement, Labour migration and planning strategies in India. PRAJNA, Calcutta.
বড়ুয়া, নীহার	১৯৭৭	হস্তীকন্যার কাহিনি ও মাহুতের গান। Ethnic Songs of India, On stage. 2/4 Ekdalia Road, Cal-19.
Bradley-Birt, F. B.	1910	Chotanagpore: A little known, province of India. John Murray, London.
Ganguli, Dwarakanath	1972	Slavery in British Dominion. Jijnasa, Calcutta.
Singh, Kumar Suresh	1977	Colonial transformation of the Tribal Society in Middle India. Indian History Cong.
মাহাত, পশুপতি প্রসাদ	১৯৭৮	পুরুলিয়ার মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস। পুরুলিয়া মেলা— ১৯৭৮ জেলা শাসক, পুরুলিয়া।
	১৯৮০	দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ, বাস্তুত্যাগ ও আদিবাসী সমাজের অর্থনীতি। দিগ্‌দর্শন, ৬ষ্ঠ সংকলন।
	১৯৮২	ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, সুজন পাবলিকেশনস্, কলি-২৯।
	১৯৮৩	আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থা, বি. বি. প্রকাশন, কলি-৪১।
	১৯৮৩	সেদিন ঝাড়খণ্ডের রাজ্য হল কেন ? শালমহাল প্রকাহন, ভাগাবাঁদ, শিলদা, মেদিনীপুর।

	১৯৮৪	শহরে বুদ্ধিজীবি ও ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীতের বিপ্লবী প্রতিরোধ। মধ্যাহ্ন, বিশেষ উপজাতি সংখ্যা, কলিকাতা।
	১৯৮৬	ঝুমুর দেশের ঝুমুর গান, সূর্য্যাক্ষ, বিশেষ সংখ্যা, কলিকাতা।
	১৯৮৮	আদিবাসী বিবাহ, বৈচিত্র্য ও জীবন দর্শন, দেশ, ৬ আগস্ট, কলিকাতা।
	১৯৮৯	ভারতের পশ্চাৎপদ শ্রেণি, দেশ, ৭ জানুয়ারি।
দে, অমলেন্দু	১৯৭৬	বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা-২৭।
গুপ্ত, পবিত্র কুমার	১৩৮৪ (বং)	উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, মধুপর্ণী উত্তরবঙ্গ সংখ্যা
করণ, সুধীর কুমার	১৩৮৪ (বং)	ঐ
Ghurye, G. S.	1943	The aborigines– 'So called' and their future. Gokhale institute of politics and Economics, Publication No. 11.
Ahmad, A. F. Salahuddin.		Social ideas and social change in Bengal 1818-1885, RDd-1, India 1976.

ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রনারায়ণ, ১৩৩৮ হিন্দুর নবজাগরণ, আর্যসমাজ।

Lacey W. G. 1931 Census of India vol. vii, Bihar and Orissa Part I report.

রায়, শরৎচন্দ্র ১৩৪২ মানভূম জেলায় সাহিত্য সেবা ও গবেষণার উপাদান, প্রবাসী, শ্রাবণ।

আন্তলোভা, কোকা, গ্রিগোরী বোনর্গাদ, লেভিন গ্রিগোরী কতোভ্স্কি— ১৯৮৬ : ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

থাপার, রোমিলা— ১৯৮০ : ভারতবর্ষের ইতিহাস ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ— ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ৭২।

বাগচী, যতীন— ১৯৮৬ : জাতি-ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন, ২/১৮৫, নেলী নগর, কলিকাতা-৭৮।

মজুমদার, অতীন্দ্র— ১৩৮৮ : চর্যাপদ, নয়াপ্রকাশ, কলিকাতা-৬।

ঘোষ, সুবোধ— ১৩৫৫ : ভারতের আদিবাসী, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা।

রায়, নীহাররঞ্জন— ১৯৮০ : বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব), পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

সেনগুপ্ত, শংকর— ১৯৭৪ : বাঙালি জীবনে বিবাহ, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, কলিকাতা।
সেন, ক্ষিতিমোহন— ১৯৫৮ : চিন্ময় বঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯।
মাহাতো, রাধা গোবিন্দ— ১৯৮৫ : ঝাড়খণ্ডের কুড়মি, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলিকাতা-৬৯।
Sengupta, Nirmal– 1982 : Fourth World Dynamics Jharkhand. Authors Guild Publications, 275-A, Lawrence Road, Delhi-110035.
বসু, সজল— ১৯৮৫ : গরীবি, আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ও বিদ্রোহ। সুজন পাবলিকেশনস্, কলিকাতা-২৯।
বসু, সজল— ১৯৯৫ : আঞ্চলিক আন্দোলন, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলি-৯।
Basu Sajal– 1994, Jharkhand Movement. Indian Institute of Advanced Study, Simla.
Nag. Ramendra Narayan– 1969 : Statistical Elucidations for District Administration in (West) Bengal. Classic Press, 3/1A, Shyama Dey St. Cal-12.
Sharma Ram Sharan– 1965 : Indian Feudalism : B. C. 300-1200 University of Calcutta. Calcutta.
ভট্টাচার্য, গৌরী— ১৯৮৮ : প্রসঙ্গ— শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯।
মিত্র, অমলেন্দু— ১৯৭২ : রাঢ়ের সংস্কৃতি, ফার্মা, কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলি-১২।
চন্দ্র, বিপান— ১৯৮৭ : আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। পার্ল পাবলিকেশনস্, কলিকাতা-৬।
মজুমদার, রমেশচন্দ্র— ১৩৭৭ : বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১৩।
Jhosi, Barbara R– 1982 : Democracy in Search of Equality. Untouchable Politics and Indian Social Change, Hindusthan Publishing Corporation, New Delhi-110020.
চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার, ১৯৭৪, কিরাত জন কৃতী, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।
সিংহ কৈলাশচন্দ্র, ১৩৯০ (বঙ্গাব্দ), রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, বর্ণমালা প্রকাশনী, আগরতলা।
ভট্টাচার্য প্রদীপনাথ, ১৯৮০, লোকবৃত্তের আলোকে কলই সম্প্রদায়, তফশিলী জাতি-উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
দত্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬, রাজন্যী ত্রিপুরার সরকারি বাংলা। শিক্ষা অধিকার, আগরতলা, ত্রিপুরা।
বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন, ১৯৭১, ত্রিপুরা স্টেট গেজেট।

রায় জগৎজ্যোতি, ১৯৮৫, বিদ্রোহ, বিবর্তন ও ত্রিপুরা— ত্রিপুরা দর্পণ প্রকাশনী, আগরতলা।
চক্রবর্তী জীবন, ১৯৮৩, ত্রিপুরা ত্রিশ থেকে আশি, বর্ণমালা প্রকাশনী, আগরতলা।
দেববর্মা অঘোর, ১৯৮১, ত্রিপুরার দাঙ্গা ; একটি পর্যালোচনা। বনমালী পাড়া, আগরতলা।
দেববর্মা হরিনাথ, ১৯৮০ অক্টোবর, ত্রিপুরার সাম্প্রতিক দাঙ্গায় নির্যাতিত উপজাতি সমাজ। দরং, আসাম।
১৯৮০ সেপ্টেমবর— ত্রিপুরার গণহত্যার জন্য মান্দাই কি একমাত্র সাক্ষী ? আগরতলা।
বসু মল্লিক, শঙ্কর, ১৯৭৯, দি ত্রিপুরা সিচুয়েশন. সমতা/১৯৭৯/২ বাঙ্গালোর।
মুখার্জী, ভবানন্দ ও কে. এস. সিংহ, ১৯৮২, ট্রাইবেল মুভমেন্ট ইন ত্রিপুরা, ট্রাইবেল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, খণ্ড-১, ডাঃ কে. এস. সিং সম্পাদিত। মনোহর, নূতন দিল্লি।
রায় বর্মন, বি. কে. ১৯৭২, সেন্সাস রিপোর্ট। উত্তর পূর্ব ভারত, দিল্লি।
আচার্য পরমেশ, ২০১১ বাঙালির শিক্ষাচিন্তা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।



লেখক পরিচিতি

ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানববিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ। ১৯৪৩ সালে ২৯ অক্টোবর পুরুলিয়ার ডাবর গ্রামে জন্ম। মা অঞ্জনা মাহাতো তৎকালীন কুর্মি মাহাতো সমাজে প্রথম শিক্ষিত মহিলা। মাতামহ রাজ কিশোর মাহাতো ও পিতামহ মদনমোহন মাহাতো জঙ্গলমহল ও আজকের ঝাড়খণ্ড-এ ১৯১৯ সালে প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। পিতা প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ মাহাতো ছিলেন সরকারি কর্মচারী এবং বিখ্যাত ঝুমুর শিল্পী।

ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো ১৯৬৬ সালে নৃতত্ত্বে এম.এ. পাশ করেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণা "Sanskritization Vs Nirbakization" থিসিসের জন্য রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন।

অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অভ্ ইণ্ডিয়া থেকে তিনি ২০০৩ সালে অবসরপ্রাপ্ত হন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে। অবসরপ্রাপ্তির পর ড. মাহাতো অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স ইউনিভার্সিটি ও কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি এবং পিকিং ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত হন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে তিনি নৃতত্ত্বের ওপরে বক্তৃতা দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী-সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যানথ্রোপলজি সাব কমিটির সদস্য। Earth Equity Institute; কলকাতার চেয়ারম্যান ও Research on Indegenous People of India, কলকাতার পরিচালক।

ISBN 978-81-923545-3-8